শিল্পতত্ত্বের কথা

সাধনকুমার ভট্টাচার্য



সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ছয়

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ। অগ্রহায়ণ ১৮৮২ শকাব্দ

বর্ণলিপি : খালেদ চৌধুরী

•

প্রকাশক : কৃষ্ণলাল ঘোষ
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড। ৯ রায়বাগান স্ট্রীট। কলকাতা ৬

মুদ্রক : কালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওআর্কস। ৬ চালতাবাগান লেন। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : মোহন প্রেস

বাঁধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স

ছয় টাকা

৺কুমুদবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

গ্রন্থকারের অন্য বই ঃ

নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—(১ম-৫ম খণ্ড)

নাটক ও নাটকীয়ত্ব

রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা

নাটক লেখার মূল সূত্র

এরিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব

হোরেসের "আর্স পোয়েটিকা"

ক্রোচের ঈস্থেটিক পরিচয় (যন্ত্রস্থ)

নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা ”

শিল্পতত্ত্ব-আলোচনার দার্শনিক পটভূমিকা

নিবেদন

শিল্পতত্ত্বের বিভিন্ন দিক বা সমস্যা নিয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে অনেক কাল আগে থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে আজ পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ লেখা হয়েছে তাদের সংখ্যা এবং উৎকর্ষ কোনমতেই নগণ্য নয়। এই সকল প্রবন্ধকে যুগানুসারে অথবা সমস্যার বা বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে খণ্ডে খণ্ডে সংকলিত করতে পারলে, বাংলার শিল্পতত্ত্ব-সাহিত্য যে নতুন রচনাবলীর সংযোজনায় সমৃদ্ধ হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। কিন্তু এই সমস্ত প্রবন্ধ এবং প্রবন্ধ-সংকলনের জন্য গর্ব বোধ করেও এই কথা চিন্তা করে মন দমে যায় যে 'শিল্পতত্ত্ব-শাস্ত্র' ব'লতে যে ধরনের সমগ্র গ্রন্থ বুঝায় সেই ধরনের গ্রন্থের সংখ্যা বাংলা ভাষায় খুবই নগণ্য। সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে যে দু' একখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে তাদের আলোচনার উচ্চমান অবশ্যই প্রশংসনীয়, বিশেষ করে ৺আচার্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের সৌন্দর্যতত্ত্ব গ্রন্থখানির ধ্রুপদী আলোচনা উচ্চাঙ্গ মননের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে আচার্য দাশগুপ্ত পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অবকাশ পাননি। ভূমিকায় তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন—"বইখানি এখন যেভাবে প্রকাশিত হইতে যাইতেছে তাহাতে ইহার বহু অপূর্ণতা রহিয়া গেল, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন ইহাকে পূর্ণ করিবার সম্ভাবনা দেখিতেছি না তখন এইভাবেই ইহাকে লোকসমক্ষে ছাড়িয়া দিলাম।" আশা করি, কেউ আমাকে ভুল বুঝবেন না—একথা মনে করবেন না যে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলির উচ্চমানকে বা কবি মোহিতলাল মজুমদার, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুহ, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ সমালোচকের প্রবন্ধাবলীর আলোচনার মানকে ছোট বলছি। আমার বক্তব্য এই যে শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে বহুলোকে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তাঁদের ঐ সকল প্রবন্ধের মানও খুব উচ্চ কিন্তু তাঁদের মধ্যে খুব কম লোকেই

ঐ বিষয়ে 'গ্রন্থ' রচনা করেছেন। কেউ কেউ শিল্পের বিশেষ বিশেষ শাখা বিষয়ে গ্রন্থরচনা করেছেন এবং সুখ্যাতিও পেয়েছেন। এঁদের উদ্যম সত্যই প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য। কিন্তু 'শিল্পতত্ত্ব শাস্ত্র' বা 'শিল্পদর্শন' বলতে যে ধরনের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বুঝায় তা কেউই রচনা করেন নি। ৺ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় সেই অভাব পূরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর ইচ্ছা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি। "শিল্পতত্ত্বের কথা"—সেই অভাব পূরণ করারই অতি প্রাথমিক প্রচেষ্টা—শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যাকে নানা আলোকে রেখে পর্যবেক্ষণের স্বল্প প্রয়াস—শিল্পতত্ত্ব পরিচয়ের প্রথম পাঠ।

'শিল্পতত্ত্বের কথা' যেহেতু 'শিল্পতত্ত্ব-পরিচয়—প্রথম পাঠ', এবং বিশেষ শ্রেণীর পাঠকের জন্য লেখা, সেই হেতু এখানে সব কথা যেমন বলা সম্ভব হয়নি, তেমনি বিস্তারিত আলোচনাও করা যায়নি।

সব কথা সবিশেষ বলতে গেলে যে বিরাট একখানি গ্রন্থের পরিসর আবশ্যক সহৃদয় পাঠককে সে কথা বুঝাতে হবে না। তাই বলে এমন বলছি না যে কোন আসল কথা বাদ পড়েছে বা নানা মুনির নানা মতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করা হয়েছে। এ বিশ্বাস আমার আছে যে, এই গ্রন্থখানি পাঠ করার পরে পাঠক আর যাই হোক অন্তত শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে সমস্যার রহস্য-কেন্দ্রটি লক্ষ্য করতে সমর্থ হবেন এবং গোঁড়ামি ত্যাগ করে সত্যসন্ধিৎসু হওয়ার চেষ্টা করবেন। আর এ বিশ্বাসও আমি রাখি যে বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন—মৌলিক চিন্তার দাবি আমি করি নি এবং তা করি নি বলেই আমি যাঁর কথা তাঁর মুখ দিয়েই বলাতে চেয়েছি এবং তার ফলেই অনেক উদ্ধৃতি গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। উদ্ধৃতি না দিয়ে অপরের কথাকেই বাংলায় তর্জমা করে মৌলিকতা প্রদর্শনের হাস্যজনক চেষ্টা আমি করি নি এবং এক বিশেষ উদ্দেশ্যেই আমি বেশী পরিমাণে উদ্ধৃতি দিয়েছি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়—বক্তার মূল রচনার সঙ্গে পাঠকের চাক্ষুস পরিচয় ঘটানো। আমার এই

অভিপ্রায়ের সঙ্গে যাঁর রুচি মিলবে না, অবশ্যই তিনি অসন্তুষ্ট হবেন। তাঁর কাছে আমার দিক থেকে যে কথা বলার তা আগেই বলেছি —এখানেও বলছি—বি-এ, এম-এ পরীক্ষার্থীদের এবং সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিদ্যামানের দিকে নজর রেখেই আমি গ্রন্থখানি রচনা করেছি। বিশেষজ্ঞদের পরিতৃপ্ত করার সাধ্য আমার নেই। তাঁদের কাছে আমার একটি মাত্র অনুরোধ যাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁদের পথ দেখিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে যেতে পেরেছি কি না— এইটুকুই তাঁরা যেন বিচার করে দেখেন। তার অধিক কিছু আশা করে যেন ক্ষুব্ধ না হন। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই পাঠক দেখতে পাবেন—উপযুক্ত পথ প্রদর্শকের মতো আমি পথের বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়ে কোন পথ কোথায় যেয়ে শেষ হয়েছে কোন মতের কি তাৎপর্য তা দেখাতে চেষ্টা করেছি এবং পাঠককে খাঁটি পথ বেঁছে নিতে সতর্ক হতে বলেছি। পথপ্রদর্শনের এবং সতর্কীকরণের যদি কোন মূল্য থাকে—সে মূল্য আমি অবশ্যই দাবি করতে পারি।

গ্রন্থের অপূর্ণতা বিষয়ে আমি খুবই সচেতন। সুতরাং দোষগুণের বিবরণ দেওয়া নিরর্থক। মুদ্রাকর-প্রমাদ নিয়েও কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ বাংলা-মুদ্রণে ওটা প্রায় প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। "সুপ্রকাশে"র শত চেষ্টাতেও প্রমাদ মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় নি। পাঠকের অসহিষ্ণুতাও মৃতপ্রায় এই যা ভরসা।

এই গ্রন্থখানি রচনার বাহ্যিক প্রেরণা এসেছে মুখ্যত 'সুপ্রকাশ'-এর শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কাছ থেকে—গৌণত সোদর-প্রতিম ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এবং ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায়ের কাছ থেকে। এঁদের প্রত্যেককেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশ বিদেশের বহু বিশেষজ্ঞ লেখকের লেখা থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। ঋণ স্বীকার করে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাঁদের ছোট করতে চাইনে। পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁদের নামের এবং ঋণের উল্লেখ রয়েছে। নিবেদন—ইতি

সাধনকুমার ভট্টাচার্য

শিল্পতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

ভগবান নামক কোনো সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান বিধাতাপুরুষ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কিনা, অথবা জড় প্রকৃতির বিবর্তনের একটি বিশেষ অবস্থায় বা পর্যায়ে প্রাক্-মনুষ্য কোনো প্রাণীর স্তর থেকে মনুষ্য-প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে কিনা—এ প্রশ্নের উত্তরে দার্শনিকদের মধ্যে যত মত-পার্থক্যই থাক, একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত; এবং সেই বিষয়টি এই যে, বিশেষ ধর্ম আছে বলেই মানুষ 'মানুষ' হয়েছে—প্রাণিজগৎ থেকে মানুষ স্বতন্ত্র হয়েছে। স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা উঠলে সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়তো পাওয়া যাবে না; কিন্তু সকলেই এ স্বীকার করবেন যে মানুষের মধ্যে চৈতন্যশক্তি নতুন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে—মানুষের পর্যায়ে চেতনার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। মানুষের সঙ্গে পশুর স্বভাবগত ঐক্য আছে এ কথা প্রমাণ করতে পারলে যাঁরা আনন্দিত হন তাঁরা যেমন মানুষকে মনোজীবক (Psycho-zoic) বলে বিশেষিত করেছেন, তেমনি যাঁরা জীবকে 'ব্রহ্মৈব নাপরঃ' বলে মনে করেন, জড়জগৎ ও জীবজগৎকে ব্রহ্মেরই অনন্তস্বভাবের লীলাবিলাস বলে মনে করেন, অথবা ঈশ্বরেরই সৃজন-লীলা বলে তৃপ্তি পান, তাঁরাও মানুষকে ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের বিশিষ্ট এবং সর্বোত্তম অভিব্যক্তি সৃষ্টি বলে থাকেন—স্বীকার করেন, মানুষের মধ্যে ব্রহ্মের চিৎস্বভাবের স্ফুটতর বিকাশ ঘটেছে, মানুষকে ঈশ্বর উন্নত চেতনাশক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যক্ষবাধের দায় এড়াতে সকলেই স্বীকার করেছেন—লোষ্ট্রব্রহ্ম, জীবব্রহ্ম ও মানুষব্রহ্ম স্বরূপে এক হলেও, স্বধর্মে ভিন্ন। মনুষ্যেতর প্রাণীর যত বুদ্ধিই থাক, বিবেক বা মননশীলতা বলতে যে ধরনের উন্নত অর্থাৎ পরিস্ফুট

মানসিক ব্যাপার বুঝায়, তা আছে একমাত্র মানুষেরই। নর-প্রায় বানর প্রজাতির মানসিক শক্তির অনেক প্রমাণ বৈজ্ঞানিকেরা সংগ্রহ করেছেন এবং কোনো কোনো প্রাণীর আচরণে উন্নত মানসিক ক্রিয়ার নিদর্শন বা আভাস পাওয়া যায় এ কথাও সত্য; কিন্তু এ কথা আরো সত্য যে আজ পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক শিম্পাঞ্জী সভ্যতার কোনো নিদর্শন আবিষ্কার করেন নি, শিম্পাঞ্জী গোষ্ঠীর-গড়া কোনো গ্রাম, নগর প্রভৃতি অথবা শিম্পাঞ্জী কৃত চিত্র, মূর্তি, গান, গল্প প্রভৃতি শিল্প আবিষ্কার করতে পারেন নি। পারেন নি তার কারণ এ নয় যে বৈজ্ঞানিকদের চেষ্টার ত্রুটি ছিল বা আছে; পারেন নি এই কারণেই যে শিম্পাঞ্জীদের পক্ষে ঐরূপ কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি এবং এখনও সম্ভব নয়। ব্রহ্ম নিজেই নিজের মায়ায় আবদ্ধ হয়ে ঐ দশায় আছেন বলেই অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছার ফলেই হোক অথবা ঊর্ধ্বতর মস্তিষ্কের শক্তিদৈন্যের জন্যই হোক, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মধ্যে চেতনা এমন একটি স্তরে এসে থেমে আছে যে স্তরের সঙ্গে মনুষ্যচেতনার স্তরের একটি গুণগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। যার অভাবে প্রাণীরা বাক্‌শক্তিহীন, তথা বিচারশক্তিহীন, তারই সদ্ভাবে মানুষ বাক্‌ভাষার (articulate speech) অধিকারী হয়েছে—মননের অধিকার লাভ করেছে।

এই বাক্‌ভাষার অধিকারই মনুষ্যত্বের বিশেষ লক্ষণ। এই অধিকারের বিশেষত্ব নিয়েই মানুষ প্রাণিজগৎ থেকে পৃথক্ হয়েছে—স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করেছে। প্রাণীরা যেখানে প্রাণের দায় মিটিয়েই ক্ষান্ত, মানুষকে সেখানে প্রাণের দায় ও মনের দায়—দুই দায়ই মেটাতে হয়েছে। প্রাণীরা যেখানে নিছক প্রাণের দায়েই যৌথ জীবন যাপন করে আসছে, মানুষ সেখানে মনের দায়ে 'সামাজিক' জীবন গড়ে তুলেছে। প্রাণীর যেখানে একমাত্র পরিবেশ—প্রাকৃতিক, সেখানে মানুষের পরিবেশ দুটি—প্রাকৃতিক ও সামাজিক বা নৈতিক। প্রাণীর কর্মপ্রেরণার মূলে থাকে জৈবিক প্রবৃত্তি, মানুষের প্রেরণার মূলে থাকে প্রবৃত্তি ও সমাজের গড়া নানা বিধিনিষেধ, নানা আদর্শ

বা চিন্তা। তাই প্রাণীর আত্মরক্ষা শুধু প্রাণরক্ষার চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ আর মানুষের আত্মরক্ষার বৃত্তের পরিধি প্রসারিত হয়েছে—প্রাণরক্ষার গণ্ডী ছাড়িয়ে মনরক্ষার দিগন্ত পর্যন্ত। প্রাণের দাবি এবং মনের দাবি মিটিয়েই মানুষ আত্মরক্ষার অভিমান চরিতার্থ করে।

মনের দাবি মেটানো মানেই—মনের নানা বৃত্তির চাহিদা মেটানো—জ্ঞানবৃত্তি, কল্পনাবৃত্তি প্রভৃতি প্রকাশবৃত্তিরই বিভিন্ন প্রবৃত্তির চাহিদা পরিপূরণ করা। যদিও প্রাণধর্মের বনিয়াদের উপরে অন্যান্য ধর্মের নানা প্রকোষ্ঠ গড়ে উঠেছে—আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রজননের তাগিদ থেকেই সৃষ্ঠ, অভিযোজনের উপায় হিসাবেই বিভিন্ন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব ঘটেছে—এবং জ্ঞান-অনুভব ও ইচ্ছাবৃত্তির অনেকখানি শক্তি ব্যয়িত হয়ে থাকে জীবনযাপনের স্থূল প্রয়োজন মেটাতেই, তবু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না যে প্রত্যেক বৃত্তিরই খানিকটা স্বাধীন অনুশীলনের অবকাশ আছে, অর্থাৎ জীবনযাপনের বা অভিযোজনের দায় মিটিয়েও বৃত্তিগুলি স্বাধীনভাবে নিজেদের শক্তিসামর্থ্যের যাচাই করে দেখতে পারে। অভিযোজনাত্মক ব্যাপারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়ক না হয়ে, জ্ঞানবৃত্তি যখন নিজের তাগিদেই বিষয়ের তত্ত্ব বা স্বরূপ জানতে ব্যগ্র হয় সেই ক্ষণটিকে আমরা জ্ঞানবৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের মুহূর্ত বলে মনে করতে পারি ; তেমনি যে মুহূর্তে অনুভববৃত্তি বা কল্পনাবৃত্তি অভিযোজন ব্যাপার থেকে বিযুক্ত হয়ে অনুভবের শক্তিবৈচিত্র্য বা কল্পনার বিচিত্র লীলা দেখাতে প্রযুক্ত হয়, সেই মুহূর্তটি ঐ বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের মুহূর্ত বলে গণ্য করা যেতে পারে। সে যাই হোক, জ্ঞানবৃত্তিরই হোক আর অনুভব বা কল্পনাবৃত্তির হোক, মূলত এসব প্রকাশবৃত্তিরই স্বাধীন অনুশীলনের ক্ষেত্র। তবে একটা কথা থেকেই যাবে এবং সেই কথাটা এই যে, আপাতদৃষ্টিতে যাকে স্বাধীন অনুশীলন বলে মনে হয়, তা যে সর্বতোভাবে স্বাধীন অর্থাৎ সামগ্রিক অভিযোজনের বাইরে, সে কথা কি জোর করে বলা যায়? বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের সঙ্গে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনার নিগূঢ় যোগ

নেই কি? এ কথাও যদি বলা যায় যে বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের মূলে বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করার বাসনা ছাড়া আর কোনো বাসনা নেই—অথবা বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের মধ্যে মানুষের দেশকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাই ব্যক্ত হয়—মানুষ আপনার নতুন শক্তির মহিমা বা সামর্থ্য যাচাই করতে চায়,—তবু বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনকে সম্পূর্ণ অভিযোজন-নিরপেক্ষ করে তোলা সম্ভব হয় না। কারণ বৃত্তির পরিপোষণ অথবা নতুন প্রকাশক্ষমতাকে আশ্রয় করে দেশকালের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনারই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিক থেকেও স্বাধীন অনুশীলনের প্রেরণাকে বিচার করে দেখা যেতে পারে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান বা কল্পনার জন্যই কল্পনা সম্ভব হতে পেরেছে এই কারণেই যে, মানুষের সমাজে বাক্‌ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তথা জ্ঞানের ও কল্পনার চাহিদা দেখা দেওয়ার পর থেকেই, জ্ঞানের শক্তি বা কল্পনাশক্তি মানুষের অন্যতম গুণ বা মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; —জ্ঞানী জ্ঞানের জন্য, কল্পনাকুশলী কল্পনাসুষমার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা-কল্পে জটিল গণিতের গ্রন্থিমোচনে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আপাত-দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়েছে, তিনি গণনাশক্তির স্বাধীন অনুশীলনেই ব্যাপৃত রয়েছেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা বসু মহাশয়ের গবেষণার মূলে মানুষের জ্ঞানের বাধাকে জয় করবার যে প্রবৃত্তি কাজ করেছে—সমাজকে নতুন জ্ঞান দেওয়ার গৌরব অর্জন করার তথা প্রতিষ্ঠা লাভ করার যে কামনা কাজ করেছে,—তা মূলত অভিযোজনপ্রচেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে। তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনাশক্তির বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়ে রূপের পর রূপ সৃষ্টি করেছেন তখন মনে হয়েছে কল্পনার স্বাধীন অনুশীলনেই কবি ব্যাপৃত। কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সমাজকে নতুন নতুন কল্পনার সামগ্রী দিতে—অভূতপূর্ব রূপরচনা

সৃষ্টি করে বিখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে। অতএব এক দিক থেকে দেখলে যাকে স্বাধীন অনুশীলন বলা যায়, অন্যদিক থেকে দেখলে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনো আলোচনা না করে আমরা 'মনের দাবি'র কথায় ফিরে যাই।

মনের দাবি—ভাব ও ভাবনাকে সামাজিকের কাছে প্রকাশ করার দাবি, কল্পনাকে ও তত্ত্বচিন্তাকে সমগ্র সমাজের রসবোধের ও মননের সামগ্রীতে পরিণত করার দাবি। একদিকে মানুষ যেমন তার রূপানুভূতির আনন্দকে, ভাবাবেগের বিচিত্র অনুভবকে নানা উপায়ে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে—রেখার ও রঙের সংযোগে চিত্র এঁকেছে, মাটি বা পাথর দিয়ে মূর্তি গড়েছে, ভাবকে ভাষায়, সুরে, দেহভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্য, গীত ও নৃত্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞতাকে সরস করে বলতে গিয়ে গল্প বা কাহিনী তৈরি করেছে এবং দৃশ্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্য রচনা করেছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগতের নানা বিষয় গ্রহণ করেছে, স্মৃতিতে ধারণ করেছে, গৃহীত প্রত্যয়রাজির মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছে, বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সূত্র বা সিদ্ধান্ত তৈরি করেছে, পুরাতন সিদ্ধান্তের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার বিরোধ ঘটলে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে পুরাতনকে খণ্ডন অথবা সমর্থন করতে চেষ্টা করেছে। এমনি করে সামাজিক মানুষ তার মননবৃত্তি চরিতার্থ করে চলেছে—তার চিন্তাকে 'সূত্র-সিদ্ধান্তে'র আকারে দশের কাছে প্রকাশ করে চলেছে।

এই মননপ্রবৃত্তি থেকেই মানুষের যত দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। মনে তার অবিরাম জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসাপূরণের অর্থাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অবিরাম প্রয়াস। মননজীবী মানুষের এ এক মহা দায়। এ দায় থেকে তার যেমন মুক্তি নেই তেমনি সহস্রাক্ষ এই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি এড়ানোর শক্তিও কারো নেই। বহির্লোক অন্তর্লোক, বিধাতার সৃষ্টি বা প্রকৃতির সৃষ্টি অথবা তার নিজেরই সৃষ্টি

নেই কি? এ কথাও যদি বলা যায় যে বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের মূলে বৃত্তিকে পরিপুষ্ট করার বাসনা ছাড়া আর কোনো বাসনা নেই—অথবা বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের মধ্যে মানুষের দেশকালের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাই ব্যক্ত হয়—মানুষ আপনার নতুন শক্তির মহিমা বা সামর্থ্য যাচাই করতে চায়,—তবু বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনকে সম্পূর্ণ অভিযোজন-নিরপেক্ষ করে তোলা সম্ভব হয় না। কারণ বৃত্তির পরিপোষণ অথবা নতুন প্রকাশক্ষমতাকে আশ্রয় করে দেশকালের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামনারই ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যদিক থেকেও স্বাধীন অনুশীলনের প্রেরণাকে বিচার করে দেখা যেতে পারে। জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান বা কল্পনার জন্যই কল্পনা সম্ভব হতে পেরেছে এই কারণেই যে, মানুষের সমাজে বাক্‌ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তথা জ্ঞানের ও কল্পনার চাহিদা দেখা দেওয়ার পর থেকেই, জ্ঞানের শক্তি বা কল্পনাশক্তি মানুষের অন্যতম গুণ বা মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; —জ্ঞানী জ্ঞানের জন্য, কল্পনাকুশলী কল্পনাসুষমার জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হয়েছে। বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যখন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা-কল্পে জটিল গণিতের গ্রন্থিমোচনে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আপাত-দৃষ্টিতে দেখে মনে হয়েছে, তিনি গণনাশক্তির স্বাধীন অনুশীলনেই ব্যাপৃত রয়েছেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন বা বসু মহাশয়ের গবেষণার মূলে মানুষের জ্ঞানের বাধাকে জয় করবার যে প্রবৃত্তি কাজ করেছে—সমাজকে নতুন জ্ঞান দেওয়ার গৌরব অর্জন করার তথা প্রতিষ্ঠা লাভ করার যে কামনা কাজ করেছে,—তা মূলত অভিযোজনপ্রচেষ্টার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে আছে। তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যখন কল্পনাশক্তির বিস্ময়কর বিকাশ দেখিয়ে রূপের পর রূপ সৃষ্টি করেছেন তখন মনে হয়েছে কল্পনার স্বাধীন অনুশীলনেই কবি ব্যাপৃত। কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন সমাজকে নতুন নতুন কল্পনার সামগ্রী দিতে—অভূতপূর্ব রূপরচনা

সৃষ্টি করে বিখ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতে। অতএব এক দিক থেকে দেখলে যাকে স্বাধীন অনুশীলন বলা যায়, অন্যদিক থেকে দেখলে তাকে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভেরই পরোক্ষ প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গ নিয়ে আর কোনো আলোচনা না করে আমরা 'মনের দাবি'র কথায় ফিরে যাই।

মনের দাবি—ভাব ও ভাবনাকে সামাজিকের কাছে প্রকাশ করার দাবি, কল্পনাকে ও তত্ত্বচিন্তাকে সমগ্র সমাজের রসবোধের ও মননের সামগ্রীতে পরিণত করার দাবি। একদিকে মানুষ যেমন তার রূপানুভূতির আনন্দকে, ভাবাবেগের বিচিত্র অনুভবকে নানা উপায়ে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছে—রেখার ও রঙের সংযোগে চিত্র এঁকেছে, মাটি বা পাথর দিয়ে মূর্তি গড়েছে, ভাবকে ভাষায়, সুরে, দেহভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে গিয়ে কাব্য, গীত ও নৃত্য প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে, অভিজ্ঞতাকে সরস করে বলতে গিয়ে গল্প বা কাহিনী তৈরি করেছে এবং দৃশ্যরূপ দিতে গিয়ে নাট্য রচনা করেছে, অন্যদিকে তেমনি মানুষ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়ে জগতের নানা বিষয় গ্রহণ করেছে, স্মৃতিতে ধারণ করেছে, গৃহীত প্রত্যয়রাজির মধ্যে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেষ্টা করেছে, বিষয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে সূত্র বা সিদ্ধান্ত তৈরি করেছে, পুরাতন সিদ্ধান্তের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার বিরোধ ঘটলে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে পুরাতনকে খণ্ডন অথবা সমর্থন করতে চেষ্টা করেছে। এমনি করে সামাজিক মানুষ তার মননবৃত্তি চরিতার্থ করে চলেছে—তার চিন্তাকে 'সূত্র-সিদ্ধান্তে'র আকারে দশের কাছে প্রকাশ করে চলেছে।

এই মননপ্রবৃত্তি থেকেই মানুষের যত দর্শন বিজ্ঞান শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। মনে তার অবিরাম জিজ্ঞাসা—জিজ্ঞাসাপূরণের অর্থাৎ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর অবিরাম প্রয়াস। মননজীবী মানুষের এ এক মহা দায়। এ দায় থেকে তার যেমন মুক্তি নেই তেমনি সহস্রাক্ষ এই জিজ্ঞাসার দৃষ্টি এড়ানোর শক্তিও কারো নেই। বহির্লোক অন্তর্লোক, বিধাতার সৃষ্টি বা প্রকৃতির সৃষ্টি অথবা তার নিজেরই সৃষ্টি

—'কিম্‌িদম্‌' প্রশ্নের হাত কেউই এড়াতে পারে না। এমন কি, যে জ্ঞানশক্তি দিয়ে মানুষ সব কিছুই জানতে চায়, জানার আবেগে সে সেই জ্ঞানের 'কি ও কেন'কেও জানতে চেষ্টা করে—নিজের কাঁধেই চড়তে চেষ্টা করে। শুনতে যত স্বতোবিরুদ্ধ বলেই মনে হোক, মানুষেরই মন পারে নিজের ঘাড়ে চড়তে—আত্মসমীক্ষণ করতে—জ্ঞানক্রিয়াকে জ্ঞানের বিষয় করতে। সুতরাং অন্য প্রাণীকে যদি বলা যায়—'সচেতন' (conscious), মানুষকে বলতে হবে—'আত্ম-সচেতন' (self-conscious)। চৈতন্যের এই বিশিষ্টতা আছে বলেই মানুষ শুধু আচরণ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, আচরণের 'কি-কেন' জানতেও চেষ্টা করেছে। দর্শন-বিজ্ঞানাদির মধ্যে মানুষের এই জানার ইতিহাসই লিখিত রয়েছে। সব শাস্ত্রই মানুষের চিন্তার প্রকাশ, যেমন সব শিল্পই মানুষের রসবোধের এবং রূপচেতনার প্রকাশ। প্রথমটিতে রয়েছে যে-মানুষ চিন্তা করেছে সেই মানুষের পরিচয়, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে, যে-মানুষ রূপ-রসের প্রকাশ করেছে তথা আনন্দিত হয়েছে সেই প্রকাশশীল মানুষের পরিচয়। প্রথমটি মিটিয়ে আসছে মানুষের জানার আবেগকে বা কৌতূহলকে, অন্যটি মানুষের অনুভববৃত্তিকে—কল্পনার আবেগকে—প্রকাশের আকৃতিকে। প্রথমটির কাজ বোধক্রিয়াকে জাগিয়ে বিষয়ের তত্ত্বে বা তথ্যে নিবদ্ধ রাখা, মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে পরিব্রাজক করে তোলা; দ্বিতীয়টির কাজ বোধক্রিয়া আশ্রয় করে অনুভববন্ধকে সক্রিয় করে তোলা—বেদনার বিচিত্র রূপ রচনা করা—মানুষকে ভাবের ক্ষেত্রে মুক্তি দেওয়া।

প্রথমটির নাম 'শাস্ত্র', দ্বিতীয়টির নাম শিল্প—লৌকিক জগতের মধ্যে অলৌকিক এক সৃষ্টি। সৃষ্টির হাতে গড়া উপসৃষ্টি। বিশ্বপ্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি ও সমাজ বা মানবপ্রকৃতি—এই নিয়ে লৌকিক জগতের বৃত্ত সম্পূর্ণ। এই বৃত্তের মধ্যেই মানবপ্রকৃতির উপবৃত্তের মধ্যে শিল্পের জন্ম—মানুষের হাতে-গড়া নতুন এক রূপের জগৎ। এই অলৌকিক রূপের জগৎ দেখে মানুষ একদিকে মুগ্ধ হয়েছে—আনন্দিত হয়েছে; অন্যদিকে জ্ঞানবৃত্তির প্রেরণাতেই শিল্পের তত্ত্ব

বা স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছে—শিল্পদর্শন গড়ে তুলেছে। শিল্প সম্বন্ধে যত রকম প্রশ্ন মানুষের মনে জাগতে পারে—প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত যত রকম প্রশ্ন বা সমস্যা জেগেছে—এই দর্শনে সেই সমস্ত প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। বলা বাহুল্য, একদিনে বা একার মনেই সব প্রশ্ন জাগে নি এবং সব উত্তর পাওয়া যায় নি। সবক্ষেত্রেই যেমনটি হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে—বীজের স্বল্প আরম্ভ থেকে ধীরে ধীরে বহুশাখায়িত বহুপত্রপল্লবিত বৃক্ষ জন্মলাভ করেছে—একটি দুটি প্রশ্ন ও উত্তর জমতে জমতে—বিরাট এক প্রশ্নোত্তরের ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, শিল্পের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য, শৈল্পিক দৃষ্টি, শিল্পের সামগ্রী বা উপাদান, শিল্পের শ্রেণীবিভাগ, কারুশিল্প ও চারুশিল্পের পার্থক্য—বিভিন্ন চারুশিল্প—স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি চারুশিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, উপস্থাপনার নানা রীতি, শিল্পের বাস্তবতা, শিল্পের সঙ্গে শিল্পিমনের ও বাস্তব জগতের সম্পর্ক, শিল্পসমালোচনার সমস্যা, আলোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি—শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ—এই সব বিষয়কে কেন্দ্র করে কত প্রশ্ন, কত মতবাদ দেখা দিয়েছে। শিল্পতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে এরা যে স্থান পাবে, এ কথা বিশেষ করে বলে বুঝাতে হবে না। যে-কোনো শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থ খুললেই দেখা যাবে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে—শিল্পের স্বরূপটি বুঝাতে শিল্পদার্শনিক দর্শন-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত টেনে এনেছেন, ফলে নানা মুনির নানা মতে শিল্পদর্শন এক দার্শনিক কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। যত 'এহ বাহ্য আগে কহ আর' প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছে তত দর্শন-বিজ্ঞান বা পরাদর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করতে হয়েছে—বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের স্বরূপ বা তত্ত্ব পর্যালোচনা করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। যেমন, ছোট একটি প্রশ্ন—কেন অর্থাৎ কিসের প্রেরণায় মানুষ শিল্প সৃষ্টি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে কত কথাই না কতজনে বলেছেন—বলতে বাধ্যই হয়েছেন। যেহেতু

ধর্ম থেকেই কর্মের উৎপত্তি, কর্মের প্রকৃতি জানতে গেলে ধর্মের স্বরূপ জানতেই হবে অর্থাৎ "মানুষের-ধর্মে"র বিশেষত্ব বুঝতে হবে। 'ধর্ম' সম্বন্ধে কথা উঠলে কথা আর সাধারণ কথার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকে না—দর্শনের কথায় পরিণত হয়, এক কথায় সমালোচককে দার্শনিক হতে হয়—বিশেষ বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণকে আশ্রয় করতে হয়। সুতরাং দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ শিল্পতত্ত্বকে কতকগুলি প্রচলিত সিদ্ধান্তের ঠেকনা দিয়ে নিরাশ্রয় অবস্থায় রেখে দেওয়া—বিনা ভিত্তিতে ইমারত তৈরি করার চেষ্টা করা। দর্শন-বন্দনা না করে কোনো শিল্পদার্শনিকই শিল্পতত্ত্ব রচনা করেন নি, রচনা করতে পারেন না বলেই করেন নি। 'ঈস্থেটিক' গ্রন্থের মুখবন্ধে সুবিখ্যাত বেনিডেট্টো ক্রোচে মহাশয় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য; তিনি লিখেছেন—

> The author has dwelt especially on the theoretical part upon general questions which are side-issues in respect to the theme that he has treated. But this will not seem a digression to those who remember that strictly speaking there are no philosophical sciences standing by themselves. Philosophy is unity and when we treat of Aesthetics or of Logic or of Ethics, we treat always of the whole philosophy, although illustrating for didactic purposes only one side of that inseparable unity.

অর্থাৎ দর্শন মূলত একক বলেই শিল্পতত্ত্ব, ন্যায়তত্ত্ব বা নীতিতত্ত্ব, যে তত্ত্বেরই আলোচনা করা হোক, তাতে সমগ্র দর্শনের আলোচনা আসবেই—যদিও বিশেষ ক্ষেত্রে দর্শনের বিশেষ একটি দিককেই আলোকিত করবার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এমন কি যাঁরা শিল্পতত্ত্বের আলোচনার ক্ষেত্রে দর্শন-বিজ্ঞানের মাতব্বরি সহ্য করতে চান না, তাঁরাও যখন কোনো সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন তখন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে দর্শনের কথাই বলে থাকেন। অতএব, পরাদর্শন বাদ দিয়ে যেহেতু শিল্পদর্শন রচনা করা সম্ভব

নয়, শিল্পদর্শনের ভিত্তি হিসাবে নানা দার্শনিক সিদ্ধান্তও শিল্প-তত্ত্বের আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। এই আলোচনা অপরিহার্য—কারণ, আমরা দেখতে পাই, শিল্পতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধেও যেখানে ঐক্য—পারিভাষিক ঐক্য—আছে সেখানেও বিষয়ের স্বরূপবিচারে আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা দেখা দিয়েছে এবং দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য থেকেই সেই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পতত্ত্বের সংজ্ঞাগুলির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আমি দেখাতে চেষ্টা করছি, কি করে, নামের ঐক্য থাকা সত্ত্বেও দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে।

সামান্যভাবে আমরা যাকে বলছি শিল্পতত্ত্ব, অনেকেই তাকে বলেন—সৌন্দর্য-বিজ্ঞান (Science of Beauty) বা সৌন্দর্য-দর্শন (Philosoply of Beauty)। "বিজ্ঞান" বলা হবে, কি "দর্শন" বলা হবে, এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সুতরাং বিজ্ঞান বা দর্শন যে শব্দটিই প্রয়োগ করা হোক—শিল্পতত্ত্ব এক কথায়—সৌন্দর্যতত্ত্ব। এঁরা বলতে চান বিভিন্ন শিল্পে সৌন্দর্যেরই বিচিত্র প্রকাশ, সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় শিল্পের জন্ম, সৌন্দর্যকে মূর্ত বা ব্যক্ত করাই শিল্পের এবং শিল্পীর একমাত্র উদ্দেশ্য—সৌন্দর্যই শিল্পের আত্মা। এই সম্প্রদায়ের সকলেই যে-এক বিষয়ে একমত সে এই যে "সৌন্দর্য" কথাটি সকলেই ব্যবহার করেন কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপের প্রশ্ন উঠলেই মতপার্থক্যের বা দার্শনিক দৃষ্টিকোণজনিত ফাটল বেরিয়ে পড়ে। অধ্যাত্মবাদীর ধারণা, ভাববাদীর ধারণা এবং বস্তুবাদীর ধারণা সৌন্দর্যবাদের ক্ষেত্রে তিনটি স্বতন্ত্র শিবির সৃষ্টি করে। এই কারণেই শিল্পতত্ত্ব-আলোচনা-গ্রন্থে, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার অনেকখানি স্থান জুড়ে থাকে। শিল্পতত্ত্বের বই খুললেই চোখে পড়ে—Metaphysical Theory of Beauty, Hedonistic Theory, Moral Theory, Intellectual Theory, Expressionistic Theory, Psychological Theory প্রভৃতি মতবাদের বিরাট এক মিছিল। সৌন্দর্যের সন্ধানে সকলেই বেরিয়েছেন বটে

কিন্তু যে বস্তুটি খুঁজতে বেরিয়েছেন তার রূপ এক-এক জনের কাছে এক-এক রকম। সৌন্দর্যের পারমার্থিক সত্তা খুঁজতে খুঁজতে একদল ভাবলোকেরও (Archetypes of Idea) ঊর্ধ্বে চলে গেছেন; পৌঁছে গেছেন ব্রহ্মলোকে—সত্য-শিব-সুন্দরের পরম নিধান ব্রহ্মে (The Absolute)। একদল দাঁড়িয়ে রয়েছেন—ব্রহ্মলোকে এক পা এবং ভাবলোকে এক পা দিয়ে। আর একদল ব্রহ্মলোক বা ভাবলোক থেকে দূরে সরে এসে বিষয়-বিষয়ীর বিশেষ সম্পর্কের মধ্যে সৌন্দর্যকে স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। সৌন্দর্যের ধারণা কত জটিল আকার ধারণা করেছে তা বুঝানোর জন্য আমি শ্রদ্ধেয় হ্যারলড অস্‌বোর্ন-কল্পিত একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করছি। এই তালিকা তৈরি করেছেন, সি. কে. ওগ্‌ডেন্‌, আই. এ. রিচার্ড এবং জেমস্‌ উড্‌ রচিত "দি ফাউণ্ডেশনস্‌ অফ ঈস্থেটিক" (১৯২২) গ্রন্থে যে শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে।

১। পরাতাত্ত্বিক (Metaphysical)

২। মিশ্র পরাতাত্ত্বিক (Mixed Metaphysical)

৩। নিরপেক্ষ বিষয়গত (Objective Non-Relational)

৪। সাপেক্ষ বিষয়ী-গত (Subjective Relational)

৫। বিষয়ী-বিষয়ের সংযোগ-সাপেক্ষ (Combined Subjective-Objective)

৬। সাপেক্ষ বিষয়গত (Objective Relational)

এদের প্রত্যেকেরই একাধিক উপবিভাগ রয়েছে। যথাস্থানে তাদের পরিচয় দেওয়া যাবে। এখানে শুধু এই কথাই জানিয়ে রাখছি যে সৌন্দর্যবাদীদের মধ্যেও বাদবিসংবাদ কম নেই।

তারপর, সকলেই যে শিল্পতত্ত্বকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে স্বীকার করেন তা নয়। একদল আছেন যাঁদের কাছে শিল্পতত্ত্ব হচ্ছে নন্দনতত্ত্ব অর্থাৎ আনন্দতত্ত্ব। এঁরা বলতে চান শিল্পের জন্ম আনন্দ থেকে, আনন্দানুভূতিকেই শিল্পী শিল্পের রূপে ব্যক্ত করে থাকেন, আনন্দ দেওয়াই শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, আনন্দই শিল্পের আত্মা। এঁদের

কাছে—আনন্দই পারমার্থিক, সৌন্দর্য আনুষঙ্গিক। আনন্দ যখন সুষ্ঠু রূপে ব্যক্ত হয় তখনই জন্ম হয় সুন্দরের—"যাহা আনন্দ দেয় তাহাই সুন্দর"—"Beauty is , objectified pleasure"। এক্ষেত্রেও আনন্দের স্বরূপ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল আনন্দের উৎস খুঁজতে সচ্চিদানন্দের আনন্দস্বভাবে গিয়ে পৌঁচেছেন, আর একদল ব্যক্তির জৈবিক ও সামাজিক বাসনার ক্ষেত্রে নেমে এসেছেন।

আনন্দবাদীদেরই আর এক নিকট প্রতিবেশী—ভাববাদী বা রসবাদী। এঁদের কাছে শিল্পতত্ত্ব="রসতত্ত্ব"। শিল্প হচ্ছে—"Expression of feeling"—"ভাবে"র প্রকাশ। এঁরা বলতে চান—'ভাব'কে রূপ দেওয়াতেই শিল্পের বিশেষত্ব, ভাবকে প্রকাশ করার প্রেরণা থেকেই শিল্পের জন্ম, ভাবকে আস্বাদ্য করে তোলাই শিল্পের উদ্দেশ্য, রূপ রসাত্মক হয়েই 'সুন্দর' হয়, আনন্দদায়ক হয়; সৌন্দর্য বা আনন্দ আনুষঙ্গিক, রসই পারমার্থিক।

তারপর শিল্পতত্ত্বকে (ঈস্থেটিক) যাঁরা পরমার্থত 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' বা 'আনন্দতত্ত্ব' অথবা রসতত্ত্ব বলে স্বীকার করেন না তাঁরাও আছেন। এই সম্প্রদায়ের কাছে শিল্পতত্ত্ব হচ্ছে—প্রকাশতত্ত্ব—Science of Expression and General Linguistic (ক্রোচে)—'প্রকাশ-বিজ্ঞান' বিশেষত 'কল্পনাতত্ত্ব'। সৌন্দর্য, আনন্দ বা রস কল্পনারই আনুষঙ্গিক ফল। এঁরা বলেন—শিল্পের প্রেরণা রয়েছে আত্মার প্রকাশবৃত্তির মধ্যে, জ্ঞানবৃত্তির মধ্যে। শিল্প একপ্রকার জ্ঞান—কল্পনাত্মক জ্ঞান। বিষয়কে ভাবে জানার প্রেরণা থেকেই শিল্পের জন্ম হয়। কল্পনাই শিল্পের আত্মা এবং কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। যা সুকল্পিত বা সুপ্রকাশিত তাই সুন্দর, তাই আনন্দদায়ক। অতএব সৌন্দর্য, আনন্দ, রস এ সমস্তই কল্পনা-ব্যাপারের আনুষঙ্গিক—গৌণ। অর্থাৎ শিল্প মুখ্যত সৌন্দর্যবোধের বা আনন্দবোধের বা রসবোধের অভিব্যক্তি নয়, শিল্পে ব্যক্ত হয় মানুষের জ্ঞানেরই আবেগ—spiritual activity—কল্পনাশ্রয়ী জ্ঞানের রূপ।

শিল্প হচ্ছে—"imaginative knowledge"—"intuition"—"expression."

এখানেও দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্য বাদ-বিসংবাদ অনিবার্য। আত্মা, আত্মার স্বরূপ, জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া ও কর্মাত্মিকা ক্রিয়ার সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাত্মবাদ ও বস্তুবাদের পরস্পর-বিরোধী কণ্ঠ শোনা যায়। কল্পনার জন্ম ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে অধ্যাত্মবাদী যেমন ঝোঁক দেখাবেন, বস্তুবাদী তার বিপরীত ঝোঁক দেখাবেন।

এই প্রকাশবাদীদেরই সগোত্র আর-এক সম্প্রদায় আছেন। এঁরা 'ঈস্থেটিক' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের উপরে জোর দিয়েছেন। গ্রীক 'aisthesis' শব্দটির অর্থ—'sense-perception'—ঐন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ। এই তাৎপর্য বুঝাতেই বাঙলায় 'বীক্ষণ' বা বীক্ষা শব্দ প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এঁদের কাছে—ঈস্থেটিক হচ্ছে "বীক্ষণতত্ত্ব"—বীক্ষাশাস্ত্র। বীক্ষণবাদীরা মনে করেন—শিল্প হচ্ছে বিশেষজাতীয় বীক্ষণ—"Art is experience"—"expression of heightened experience"। যেখানে প্রতিভাবাদীর কাছে শিল্পের সংজ্ঞা হচ্ছে "Art is intuition", "Art is expression", বীক্ষণবাদীর কাছে শিল্পের সংজ্ঞা হচ্ছে—"Art is experience"। প্রথম পক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের পার্থক্য এখানেই যে, প্রথম পক্ষ জোর দিয়েছে নির্বিকল্প বিষয়জ্ঞান বা নিরপেক্ষ কল্পনার উপরে, আর দ্বিতীয়টি জোর দিয়েছে—প্রতীতির প্রকাশের উপরে। প্রথমটিতে প্রকাশ্য বিষয়ের লোকসাপেক্ষতার উপরে জোর কম—নেই বললেই চলে—অর্থাৎ বিষয়িগততা (সাবজেকটিভটি) বেশী, আর দ্বিতীয়টিতে প্রকাশ্য বিষয়ের লোকসাপেক্ষতা বেশী, অর্থাৎ তারা লৌকিক জগতেরই অভিজ্ঞতা বা প্রতীতি। বীক্ষণবাদীদেরই কেউ কেউ বলেছেন—শৈল্পিক বীক্ষণ ও সাধারণ বীক্ষণের মধ্যে ব্যাপারগত কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে তা আছে—যে উদ্দেশ্যে বীক্ষণ করা হয় সেই উদ্দেশ্যেরই মধ্যে—বীক্ষণের বিশেষ অবস্থাটিরই মধ্যে।

এঁরা বলতে চান—শিল্পীর দৃষ্টিতে 'unique kind of mental element' কিছু থাকে না, এবং 'idea of a peculiar aesthetic value—a pure art value' বলেও কিছু নেই। সাধারণ বীক্ষণের সঙ্গে শৈল্পিক বীক্ষণের মৌলিক পার্থক্য এই যে সাধারণ বীক্ষণে বিষয়কে আমরা দেখি ততটুকুই যতটুকু দেখে আমাদের প্রয়োজন মিটে যায় অর্থাৎ দেখি তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই; আর শৈল্পিক বীক্ষণে আমরা বিষয়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনের কথা ভুলে যাই এবং বিষয়কে লৌকিক জগৎ থেকে পৃথক করে তার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করতে চাই। এক্ষেত্রেও দেখা যাবে, বীক্ষণ বিষয়ে ঐক্য থাকলেও, বীক্ষণের প্রেরণা, স্বরূপ, বীক্ষণেই বীক্ষণের শেষ কি না, শিল্পসম্ভোগজনিত আনন্দ শুধুমাত্র বীক্ষণের আনন্দ কি না, এ সব নানা প্রশ্ন সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিয়েছে এবং শিল্পতত্ত্বের আলোচনা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ভূমিতে গিয়ে পৌঁচেছে।

উল্লিখিত মতবাদগুলির মধ্যেই শিল্পতত্ত্বজিজ্ঞাসা যদি সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে জিজ্ঞাসার পরিধিটা যে অপেক্ষাকৃত ছোট হত এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা নেই। আরও একাধিক মতবাদ সেখানে রয়েছে। বিশেষত রয়েছে মনীষী টলস্টয়ের মতবাদটি, যাতে

> Art is a human activity consisting in this that one man consciously by means of certain signs hands on to others feelings he has lived through, and that others are infected by these feelings and also experience them.

পূর্বোক্ত বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে—বিশেষত যাঁরা বলেছেন শিল্প হচ্ছে ভাবের প্রকাশ, তাঁদের সঙ্গে টলস্টয়ের মতবাদের পার্থক্য এখানেই যে অ্যারিস্টটলের অনুকরণ বা নির্মিতিবাদ থেকে আরম্ভ করে, সৌন্দর্যবাদ, আনন্দবাদ, রসবাদ, প্রকাশবাদ, বীক্ষণবাদ প্রভৃতি যত মতবাদ দেখা দিয়েছে তাঁরা (অ্যারিস্টটলের 'ক্যাথারসিস্'-তত্ত্ব এবং রসবাদ ব্যতিক্রম) মানুষকে যতটা ব্যক্তি হিসাবে দেখেছেন ততটা 'সামাজিক জীব' হিসাবে দেখেন নি—সামাজিক মানুষের

কাছে সামাজিক মানুষের ভাবসঞ্চারের উপায় হিসাবে শিল্পকে দেখেন নি। টলস্টয়ের এই সিদ্ধান্ত থেকেই বক্তব্যটুকু আরো পরিচ্ছন্ন হবে—

> Art is not, as the metaphysicians say, the manifestation of some mysterious Idea of Beauty of God, it is not, as the aesthetic physiologists say, a game in which man lets off his excess of stored up energy; it is not the expression of man's emotions by external signs; it is not the production of pleasing objects, and above all, it is not pleasure; but it is a means of union among men joining them together in the same feelings, and indispensable for the life and progress towards well-being of individuals and of humanity.—What is Art? (P. 123)

অর্থাৎ শিল্প অলৌকিক রহস্যময় কোনো সৌন্দর্যসত্তা বা ভগবৎ-সত্তার অভিব্যক্তি নয়, অথবা শিল্প মানুষের বাড়তি শক্তির খেলা নয়, অথবা বাহ্যিক রূপের সংকেতে আবেগের প্রকাশ নয়, অথবা আনন্দদায়ক বস্তুর সৃষ্টির নয়—আনন্দের অভিব্যক্তি নয়; শিল্প হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উপায়—একই ভাবে সকলকে ভাবিত করবার উপায়, ব্যক্তির তথা মানবসমাজের সুষ্ঠু জীবন-যাপনের ও উন্নতির পক্ষে শিল্প অপরিহার্য। এই সম্প্রদায়ের কাছে শিল্পতত্ত্ব আসলে ভাবসঞ্চার-তত্ত্ব (art of communication or infection or transmission)। শাস্ত্রে সঞ্চারিত হয়—চিন্তা (thoughts), শিল্পে সঞ্চারিত হয়—ভাব (feelings)। সুতরাং আসল সমস্যা এখানেই যে শিল্পতত্ত্বের সাধারণ সংজ্ঞা দেওয়া যত সহজই হোক, শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে ঐকমত্য নেই বলে, শিল্পতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য বা বিচার্য বিষয় কি, এক কথায় তা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তারপর, শিল্পতত্ত্বের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা সৌন্দর্য দর্শন, আনন্দ-বিজ্ঞান, প্রকাশ-বিজ্ঞান, বীক্ষণতত্ত্ব, ভাবসঞ্চারণ-তত্ত্ব প্রভৃতির যে কোনোটিকেই গ্রহণ করি না কেন,—অর্থাৎ শিল্পতত্ত্বকে সৌন্দর্য, আনন্দ, রস, প্রকাশ, বীক্ষণ, সঞ্চারণ যে-কোনো তত্ত্বেরই উপর প্রতিষ্ঠিত

করার চেষ্টা করি না কেন—প্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি দার্শনিক সংস্কার দিয়েই তৈরি করতে বাধ্য। কারণ, এই ভিত্তির বৈশিষ্ট্যেই শিল্পতত্ত্ব নানা উপাধি পেয়েছে। পরাতত্ত্বমূলক (Metaphysical), মনস্তত্ত্ব-মূলক (Psychological), বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-মূলক (Experimental, Speculative Aesthetic, Inductive Aesthetic), সমাজবিজ্ঞান-মূলক (Sociological) প্রভৃতি উপাধি তত্ত্ব-আলোচনার দার্শনিক দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য অনুসারেই আরোপিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, দৃষ্টিকোণের আলোচনা পদ্ধতিরই আলোচনা—অতএব পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। এখানে শুধু এই কথাটাই বলে রাখতে চাই যে সভ্যতার ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধি বা বিচারশক্তির যে উৎকর্ষ ঘটেছে তা থেকে নানা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং শিল্পতত্ত্ব আলোচনায় পদ্ধতির বা দার্শনিক দৃষ্টিকোণের আলোচনা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—এক কথায় অপরিহার্য। আগেই বলেছি—প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য শিল্পতত্ত্ব-রচয়িতাই প্রথমে দার্শনিক ভিত্তি রচনা করেছেন, তারপর সেই ভিত্তির উপরে তার সিদ্ধান্ত স্থাপনা করেছেন। যাঁরা দর্শন-বিজ্ঞানের উপর বিরক্ত, শিল্পতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে দর্শন-বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ সহ্য করতে পারেন না, অথচ শিল্পতত্ত্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনের সাধ যাঁদের ঐকান্তিক, সেই সব শৌখিন সমালোচকরা অপরের দেওয়া কোনো একটা সিদ্ধান্তকেই মনোহর রূপ দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে। ধরা যাক—সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কেউ বললেন—সুন্দর হচ্ছে সেই রূপ যা আমাদের সৌন্দর্যবোধকে জাগিয়ে দিতে সমর্থ; সুন্দর রূপ—"significant form"—চিত্তাকর্ষক রূপ। কি হলে রূপ চিত্তাকর্ষক হয়—'significant' হয়—এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেই বললেন—আমি দার্শনিক নই, শিল্পতত্ত্বজ্ঞ, রূপ নিয়ে আমার কারবার, কেন রূপ সুন্দর হয় এ তত্ত্বে প্রবেশ করতে আমি চাইনে। কিন্তু প্রশ্ন, এই উত্তর শুনে কোন্ জিজ্ঞাসু তৃপ্ত হবেন? কেউ কি প্রশ্ন করবেন

না—কি হলে form significant হয়? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেই কোনো না কোনো গুণের কথা উঠবেই—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে যেমন **যতো** বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে **যেন** জাতানি জীবন্তি **যৎ** প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি···এই উত্তরের অর্থাৎ "যৎ"-এর স্তর পেরিয়ে নির্দিষ্ট পদার্থে—অর্থাৎ আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি···আনন্দেন···এবং আনন্দং···এই স্তরে পৌছতে হয়, তেমনি শিল্পজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও আমাদের রূপের উৎকর্ষহেতু বা তাৎপর্য অবশ্যই নির্ধারণ করতে হবে, যে ধর্ম থাকলে রূপ উৎকৃষ্ট হয় সেই ধর্মটিকে নির্দেশ করতেই হবে। তা নির্দেশ করতে যাওয়া এবং দর্শনের রাজ্যে প্রবেশ করা একই কথা। এ কথা একাধিকবার বলেছি, সুতরাং এখানেই এ প্রসঙ্গের উপসংহার।

দার্শনিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য কি করে মতপার্থক্য সৃষ্টি করে এ কথা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাতে গিয়ে, শিল্পতত্ত্বের মুখ্য ও ও গৌণ আলোচ্য বিষয়ের দিকে যতটুকু দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, আশা করি তা থেকে পাঠকের মনে এ ধারণা অবশ্যই জন্মেছে যে—শিল্পতত্ত্বের সংজ্ঞা নিয়েও মতভেদ আছে—যদিও শিল্পতত্ত্ব (ঈস্থেটিক) বলতে সাধারণত বুঝায় "theoretical invbstigation of the beautiful"। অনেকেই বলেছেন—"definitions of beauty are also descriptions of the nature and scope of aesthetic investigation."—Harold Osborne. এখন প্রশ্ন উঠবে এই যে শিল্পতত্ত্ব বলতে মুখ্যত সৌন্দর্যতত্ত্ব, আনন্দতত্ত্ব, প্রকাশতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, বীক্ষণতত্ত্ব, সঞ্চারতত্ত্ব বা আর যে তত্ত্ব বুঝাক, এই তত্ত্বগুলির মধ্যে কোনো সামান্যধর্ম আবিষ্কার করা কি সম্ভব নয়? এ প্রশ্ন কি শিল্পতত্ত্বের আলোচ্য নয়? নিশ্চয়ই আলোচ্য এবং শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করার সময় এ প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্যই করতে হবে। এখানে, শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যাটিকে স্পষ্টতর আকারে উপস্থাপিত করবার জন্যই আমি সামান্যধর্মের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি। অনুচিকীর্ষা, সৌন্দর্যবোধ, আনন্দবোধ, রসবোধ, প্রকাশব্যাকুলতা, বীক্ষণপ্রবণতা,—যেটিকেই শিল্পের প্রেরণা

বলে ধরা হোক না কেন এবং যে উদ্দেশ্যেই শিল্প রচনা করা হোক না কেন, শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটি আসলে অভিব্যঞ্জনা—ব্যক্তীকরণ—বস্তুরূপকল্পনা—বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক উপলব্ধিকে (ভাবময় + রূপময়) তার নিজের সত্তায় বা স্বরূপে প্রকাশ করা। একে একে উল্লিখিত তত্ত্বগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। প্রথমত, সৌন্দর্যতত্ত্ব। সৌন্দর্যবোধ মূলত রূপবোধ। যার কোনো রূপ নেই, তার সৌন্দর্য বা অসৌন্দর্য কোনো কিছুই নেই। দ্বিতীয়ত, আনন্দতত্ত্ব। আনন্দ স্বরূপে নির্বিষয় আবেগমাত্র। যে আনন্দ কোনো রূপ রূপের মধ্যে অঙ্গলাভ করে নি, সে আনন্দ তো অব্যক্ত—ধরাছোঁয়ার বাইরে। তৃতীয়ত, রসতত্ত্ব। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের সংযোগ না ঘটলে রসনিষ্পত্তি হয় না এ কথা বলা মানেই, ভাবকে বিচিত্র রূপের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে বলা। চতুর্থত, প্রকাশতত্ত্ব বা প্রতিভানতত্ত্ব বা কল্পনা-তত্ত্ব। নামেই প্রকাশ—রূপকেই এখানে বৈশেষিক লক্ষণ বলে গণ্য করা হয়েছে। যে প্রকাশে চিন্তা প্রকাশিত হয় এ সে প্রকাশ নয়; এ ভাবে-প্রকাশ, এক কথায় রূপে প্রকাশ। পঞ্চমত, বীক্ষণতত্ত্ব। ইংরেজিতে যাকে বলা হয়েছে 'experience', তা আসলে বিষয়ের গ্রহণ—বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর নিবিড় ও ঐকান্তিক সংযোগ। সুতরাং 'heightened experience' মানেই বিষয়ের স্বরূপটিকে ধ্যান করা,—বিষয়কে স্বরূপমহিমায় প্রকাশ করা। বীক্ষণের বাইরে বা ঊর্ধ্বস্তরে যে ঈক্ষণ তার নাম অন্বীক্ষণ বা অন্বীক্ষা—অনুমান, বিচার, বিতর্ক, তত্ত্বচিন্তা—নৈয়ায়িক জ্ঞানের ব্যাপার। ষষ্ঠত, সঞ্চারতত্ত্ব। সামাজিকের মনে ভাবাবেগ সঞ্চার করা তথা সমাজমনে আনন্দ, উদ্দীপনা ও প্রেরণা সৃষ্টি করা শিল্পের উদ্দেশ্য—এইটি সঞ্চারতত্ত্বের বিশেষ বক্তব্য বটে, কিন্তু সঞ্চারবাদীকেও 'by means of external signs' নিজের উপলব্ধিকে ব্যক্ত করতে হয়—এক কথায়, 'রূপ' বা সংকেত সৃষ্টি করতে হয়। এইভাবে বাহ্যত দেখতে গেলে দেখা যাবে—শিল্পের আপাত বিশেষত্ব হচ্ছে রূপময়ত্ব—ব্যক্তিত্ব—ভাবের বা রূপের বস্তু-সত্তায় প্রকাশ (concretization)। কিন্তু এই বিশেষত্বটি আবিষ্কার

করলেই কি মূল সমস্যার সমাধান হয়? তা হয় না বলেই—মানব-জীবনের কোন্ কাম্য শিল্পের রূপে ব্যক্ত হয়েছে, বিভিন্ন কাম্য বা মূল্যের মধ্যে সেই মূল্যটির স্থান কি, কি তার বিশেষত্ব—এ সব প্রশ্নের মীমাংসা করতেই হবে। শিল্পশাস্ত্রকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তার জন্য অবশ্যই স্বতন্ত্র একটি আলোচ্য বিষয় নির্ধারিত করতে হবে, অর্থাৎ সৌন্দর্য, আনন্দ, রস, প্রকাশ, বীক্ষণ, সঞ্চার প্রভৃতি বিষয়ের যে-কোনো একটি তত্ত্বকে মুখ্য আলোচ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে প্রত্যেকটি তত্ত্বের দাবি বিচার করে দেখতে হবে।

তারপর, যে কাম্যই শিল্পতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য হোক—অর্থাৎ শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ যাই হোক না কেন—সেই বিশিষ্ট বস্তুটিকে কোন্ মাধ্যমে (medium) প্রকাশ করা হয়েছে—কত প্রকার শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে, প্রত্যেকটি প্রজাতির বিশেষত্ব কোথায়, প্রকৃত শিল্পের সঙ্গে শিল্পজাতীয় দ্রব্যের পার্থক্য কি—এ সব বিষয়ের আলোচনাও গৌণত শিল্পতত্ত্বের অন্তর্গত। অর্থাৎ শিল্পতত্ত্ব-আলোচনা শুধু সামান্যভাবেই শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার করে ক্ষান্ত থাকবে না, বিশেষ বিশেষ শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ (differentia) বা স্বরূপ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করবে। এই আলোচনার বিশিষ্টতা প্রকাশ পাবে সেখানেই যেখানে বিশেষ বিশেষ মাধ্যম কি করে শিল্পের বিষয়কে ও রূপকে নিয়ন্ত্রিত করে, শিল্পকলাগুলি সর্বাংশে সমান (parallel) কি না—'form'-এর পার্থক্যে 'matter' পৃথক হয়ে যায় কি না, অর্থাৎ "it is not only the form which differentiates but the matter as well"—(জঁ। পল সর্তরের উক্তি)—এই সিদ্ধান্ত মানা হবে কি না—এই সব প্রশ্নের মীমাংসা করা হবে। মোট কথা, কারুকলা ও চারুকলার পার্থক্য নির্দেশ করার পর, চারুকলাগুলির সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার করতে হবে—বিশেষ পরিচয় দিতে হবে। বলা বাহুল্য, বিশেষ পরিচয় দেওয়া বলতে শুধু সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচারই বুঝায় না, সঙ্গে সঙ্গে আরো

কিছু বুঝায়—প্রত্যেকটি প্রজাতির উৎকর্ষ-অপকর্ষের লক্ষণ বা সূত্র নির্ধারণ করাও বুঝায়। অর্থাৎ শিল্পতত্ত্ব শুধু তত্ত্ব সন্ধান করেই ক্ষান্ত হবে না, রুচি গঠনের ও পরিমার্জনের দায়িত্বও পালন করবে। শিল্পতত্ত্ব অনুশীলনের ফলে, অশিল্পী শিল্পী হয়ে ওঠে কি না, যাঁর শিল্পবোধ নেই তাঁর মধ্যে রুচির উন্নতি ঘটে কি না, প্রতিভা অনুশীলনসাপেক্ষ কি না—এ সব প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হয়েও এ কথাটা বলা যায়—শিল্পের আস্বাদন যতটা করুক না করুক, শিল্পের সমালোচনা—উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার—সূত্রেরই উপরে নির্ভর করে। অবশ্য আস্বাদনও রুচিসাপেক্ষ, রুচি সংস্কারসাপেক্ষ এবং সংস্কার সূত্রসাপেক্ষ। প্রত্যেক আস্বাদনের মূলেই, ব্যক্তভাবে বা অব্যক্তভাবে, মূল্যবোধ কাজ করে থাকে—"in every act of approciation norms of judgement are latent"। এই মূল্যবোধ বা রুচি তৈরির ব্যাপারে শিল্পতত্ত্বের বিধিনিষেধই বড় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে—

> "Every formulation of doctrine, every casual remark about the critic's function, indeed every assay of practical criticism inevitably and inescapably implies theoretical a,sumptions which belong to the province of aesthetics."

অর্থাৎ শিল্পের সমালোচনা সূত্রসাপেক্ষ এবং সেই সূত্রগুলি পাওয়া যায় শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থেই। এই দিক থেকে দেখলে সমালোচনাসূত্র নির্ধারণ করাও শিল্পতত্ত্বের অন্যতম দায়িত্ব। শিল্পদার্শনিক বিশেষ বিশেষ শিল্পের স্বরূপ বিচার করে যে সূত্রাবলী তৈরি করেন স্রষ্টাকে সেই সব সূত্র জানতে হয় সৃষ্টির উৎকর্ষ বিধান করবার জন্য, আর সমালোচককে সে সূত্র জানতে হয়—শিল্পের মূল্য বিচার করবার জন্য। সূত্র ও সূত্রের প্রয়োগবিধি যিনি না জানেন, তাঁর পক্ষে সমালোচক হওয়া সম্ভব হয় না বলেই শিল্পতত্ত্বের গ্রন্থে সূত্রের প্রয়োগবিধি সম্বন্ধেও আলোচনা থাকে—সমালোচকের যোগ্যতা, সমালোচকের কর্তব্য, সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ের

আলোচনাও স্থান পেয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে আলোচিত হয় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি—সমালোচক হতে গেলে শিল্পী হতে হবে কি না? শুধু পাণ্ডিত্য বা শুধু রসবোধ থাকলেই শিল্পসমালোচক হওয়া যায় কি না? সমালোচনাশক্তিকেও প্রতিভার মতো বিধিদত্ত শক্তি বলে গণ্য করা হবে কি না? সংস্কারমুক্ত বা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সমালোচকের অস্তিত্ব সম্ভব কি না? সমালোচনা শুধু রূপ-মূল্যেরই (art value) বিচার অথবা রূপ-মূল্যের সঙ্গে সঙ্গে রসমূল্যের এবং বিষয়-মূল্যেরও বিচার কি না? 'Good art' এবং 'great art'-এর পার্থক্য স্বীকার করলে—'form-value' বিচার এবং 'significance value' বিচার অবশ্যকর্তব্য হয় কি না?—বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিচারে সামাজিক উপযোগিতার (social utility) প্রশ্ন অপরিহার্য কি না? সামাজিক উপযোগিতার আলোচনা যুগপ্রবৃত্তি বা নীতিবোধের কথা উত্থাপন না করে সম্ভব কি না? শিল্পকর্মের কি ও কেন সম্যক বুঝতে হলে শিল্পীর মানস বা ব্যক্তিত্বের প্রকৃতিটি জানার কোনো প্রয়োজন আছে কি না? শিল্পীর 'মানস' নির্ধারণ করতে শিল্পীর ব্যক্তিসত্তাকে জাতি-যুগ-মুহূর্তের বা সমসাময়িক ঘটনার পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে পর্যালোচনা করা আবশ্যক কি না, —race-milieu moment-এর পরিচয় স্পষ্ট করে তুলতে সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করতে হবে কি না? সমাজ-বিবর্তনের ধারা দেখাতে ইতিহাসের আর্থনৈতিক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক কি না? এই সব প্রশ্নের আলোচনা সমালোচনা-বিধি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য বলেই শিল্পসূত্র আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্যই উত্থাপনীয়।

এতক্ষণ যে আলোচনা করা হল তা থেকে নিশ্চয়ই এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে পাঠকের মনে জেগেছে যে শিল্পতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য 'রূপতত্ত্ব'—এ অতি সামান্য কথা এবং শিল্পতত্ত্ব,—সৌন্দর্যতত্ত্ব,—আনন্দ-তত্ত্ব,—রসতত্ত্ব,—কল্পনাতত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্ব,—বীক্ষণতত্ত্ব,—সঞ্চারণতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বের কোনটি, এ বিষয়ে অবিসংবাদিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

সম্ভব হয় নি; এবং তা হয় নি বলেই শিল্পতত্ত্বের স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়ের সুনির্দিষ্ট পরিচয় বা স্বরূপ পাওয়া যায় নি; যা পাওয়া গেছে তা এই যে, শিল্পতত্ত্বের আলোচ্য হচ্ছে শিল্প ও তার নানা সমস্যা।

শিল্পতত্ত্ব আলোচনার ধারা

যে শাস্ত্র আজও তার আলোচ্য বিষয়ের বিশেষত্ব সম্পূর্ণ আবিষ্কার করতে পারে নি বা পারলেও বিশেষত্ব সম্বন্ধে একমত হতে পারে নি—শিল্পের সামান্য পরিচয় জানলেও, বিশেষ পরিচয় বা অবিসংবাদিত বৈশেষিক লক্ষণ নির্ধারণ করতে পারে নি, সেই শাস্ত্রের আলোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি অর্থাৎ ধারা থেকে 'ধরণ'—'ধারণার ধরণ' উদ্ধার করার চেষ্টা খুবই ফলপ্রসূ। ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ধারণার 'ধরণ'গুলি আবিষ্কার করে নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে ধরণগুলির দোষগুণ বিচারের চেষ্টা—অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তিদোষ দেখিয়ে নির্দোষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করাই সেখানে একমাত্র পন্থা। শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস চোখের সামনে রাখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারব—শিল্পতত্ত্বচেতনার উন্মেষ কখন এবং কিভাবে হয়েছে, চেতনার ক্রমবিকাশে কখন কোন্ নতুন ধারণা এসেছে, আরম্ভকাল থেকে আজ পর্যন্ত কত ধারণা জমায়েত হয়েছে এবং কোন্ ধারণার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন্ কোন্ যুক্তি দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অতিসংক্ষেপেই এই ইতিহাস বিবৃত করতে হবে; কারণ সবিশেষ বিবরণ দিতে গেলে শিল্পতত্ত্বের একখানি গোটা ইতিহাসই রচনা করতে হবে। বলা বাহুল্য, তার অবকাশ এখানে নেই। অতএব এই অধ্যায়ে আমি শিল্পতত্ত্বের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তের ঐতিহাসিক বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হব।

বিবরণ দিতে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটি মনে জাগছে এবং যে কথাটি পাঠককে জানাতে চাই সে এই যে, যাঁরাই শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস রচনা করেছেন, তাঁরাই নিজ নিজ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে

শিল্পতত্ত্বের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেখাতে চেষ্টা করেছেন। যাঁর কাছে সৌন্দর্যতত্ত্বই শিল্পতত্ত্বের মুখ্য আলোচ্য, তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন, সৌন্দর্যচেতনার উন্মেষ থেকেই শিল্পতত্ত্বের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে; তেমনি আনন্দবাদী, রসবাদী, প্রকাশবাদী বা কল্পনাবাদী প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ ধারণার কষ্টিপাথরে ঘষেই শিল্পতত্ত্বের খাঁটি আরম্ভ ও বিকাশ যাচাই করতে চেষ্টা করেছেন। স্বনামখ্যাত শিল্পদার্শনিক বেনিডেট্টো ক্রোচে মহাশয় "ঈস্থেটিকের ইতিহাস" পর্বের সূচনায় যে কথাটি বলেছেন তা উদ্ধৃত করলেই আমার কথার তাৎপর্য স্পষ্টতর হবে। তিনি লিখেছেন—

> "The question whether Aesthetic is to be considered as an ancient or a modern science has on several occasions been a matter of controversy; whether, that is to say, it arose for the first time in the eighteenth century, or had previously arisen in the Graeco-Roman world. This is a question, not only of facts, but of criteria, as is to be easily understood: whether one answers it in this way or that depends upon one's idea of that science, an idea afterwards adopted as a standard or criterion."
>
> —Aesthetic. P. 155

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক 'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে'র নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী আছে এবং সেই ভঙ্গীটি দেখা দেয় ঐতিহাসিকেরই ধারণা-বৈশিষ্ট্য থেকে—শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যে বিশেষ ধারণা পোষণ করেন সেই ধারণার স্বাতন্ত্র্য থেকেই। ক্রোচের কথাই ধরা যাক। ক্রোচের মতে শিল্পতত্ত্ব হচ্ছে 'প্রকাশবিজ্ঞান' (Science of expressive, representative or imaginative activity)। সুতরাং যতদিন না কল্পনাতত্ত্ব বা প্রকাশতত্ত্ব দেখা দিয়েছে, শিল্পতত্ত্বকে কল্পনাতত্ত্বের সঙ্গে এক করে দেখা হয় নি, কল্পনাকে জ্ঞানব্যাপার বলে অর্থাৎ নৈয়ায়িক জ্ঞান এবং প্রতিভানিক জ্ঞানের পার্থক্য বুঝতে পারা যায় নি, ততদিন প্রকৃত শিল্পতত্ত্ব জন্মগ্রহণ করে নি—ততকাল শিল্পতত্ত্বের নামে কতকগুলি ভ্রান্ত

ধারণাই চলে এসেছে। অন্যপক্ষে বার্নার্ড বোঁসাঙ্কে তাঁর "হিস্ট্রি অভ ঈস্থেটিক" গ্রন্থে লিখছেন—

> If then, "Aesthetic" means the philosophy of the Beautiful, the history of Aesthetic must mean the history of the philosophy of the Beautiful; and it must accept as its immediate subject-matter the succession of systematic theories by which philosophers have attempted to explain or connect together the facts that relate to Beauty.
>
> —Chapter 1, P. 1.

অবশ্য প্রত্যেকেই উৎসসন্ধানে বেরিয়ে প্রাচীন গ্রীসে পৌঁচেছেন এবং গ্রীক দার্শনিকদের মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। আমরাও 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা' অনুসরণে গ্রীস থেকে যাত্রা শুরু করছি এবং বিশেষ কোনো পূর্বনির্ধারিত "ধারণা"র সন্ধান না করে খোলা মনে শিল্পতত্ত্বসম্বন্ধীয় উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করছি। তবে বিদেশী ঐতিহাসিকরা যেখানে শুধু ইউরোপীয় দার্শনিকদের সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন, সেখানে আমি তাঁদের পাশাপাশি ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রকারদের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করছি এবং করছি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই। সে উদ্দেশ্য এই যে, আমি দেখাতে চাই—মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ঐক্য থাকার ফলেই,—স্বভাবের প্রেরণাতেই, সমান অবস্থায় মানুষের মন প্রায় একই ধরনে কাজ করেছে; যেমন প্রায় একই রূপ আচরণ করেছে, তেমনি আচরণের ব্যাখ্যায় প্রায় একই ধরনে চিন্তা করেছে। সমস্যা যেখানে এক, সেখানে সমাধানের চেষ্টা এক হবেই। শিল্পতত্ত্বের জিজ্ঞাসায় এবং উত্তরে বিভিন্ন দেশের মানুষের মন যুগে যুগে যেভাবে ঐক্য দেখিয়েছে তা খুবই লক্ষণীয় বিষয়। আমরা দেখতে পাব—আদিম যুগের সমাজের চিন্তায়—সেই সমাজ ভারতেরই হোক অথবা গ্রীসেরই হোক—বেশ একটা ঐক্য রয়েছে এবং সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, চিন্তাদর্শের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রত্যেক সমাজের

মনে সমস্যার সমাধানে নতুন চেষ্টা তথা নতুন নতুন চিন্তা দেখা দিয়েছে। শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস—বিশেষত প্রত্যেকটি চারুকলার সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা—লক্ষ্য করলেই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাবে; দেখা যাবে, মানুষ উন্নত চেতনার দায়ে যে সত্যকে খুঁজছে, সে সার্বজনীন সত্য—সে একান্তভাবে গ্রীসের বা ভারতের সত্য নয়।

উন্নত চেতনার অধিকারী মানুষ যখনই তার নিজের সৃষ্টির বা কর্মের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছে, তখনই তার চোখের সামনে তিন ধরনের পদার্থ এসে দাঁড়িয়েছে। এক—যে সমস্ত বস্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রানির্বাহে, অর্থাৎ আত্মরক্ষার কাজে লাগে, —সেই সব নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী; দুই—প্রকৃতি ও জীবনের 'কি ও কেন' সম্বন্ধে যে সব চিন্তা করা হয়েছে সেই চিন্তাগুলি এবং তদনুসারে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে সব বিধিনিষেধ তৈরি হয়েছে, সেই নীতিসূত্রগুলি; তিন—রূপ-রস-গন্ধ শব্দ-স্পর্শের প্রত্যয়সংযোগে গড়া নানা রূপকে, সমাজের স্মরণীয় ঘটনাকে অথবা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবাবেগকে ব্যক্ত করবার জন্য যে সব মূর্তি, চিত্র, গান, গল্প রচনা করা হয়েছে সেই সব শিল্পনামধেয় বস্তুগুলি। প্রথম শ্রেণীর পদার্থ—ভোগ্য ব্যবহার্য বস্তু; দ্বিতীয় শ্রেণীর পদার্থ—'চিন্তা' বা জ্ঞাতব্য—তত্ত্ববাক্য ও বিধিনিষেধবাক্য; তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থ —উপভোগ্য শিল্পসামগ্রী। এই তৃতীয় শ্রেণীর পদার্থের প্রধান যে বৈশিষ্ট্যটি মানুষের চোখে পড়েছে সে এই যে, এই সব পদার্থে মানুষ তার প্রকাশশক্তিকে বিভিন্ন উপায়ে রূপ গড়ার ও আবেগ প্রকাশের কাজে নিয়োগ করেছে এবং পদার্থগুলি দেখে বা শুনে অথবা দেখে-শুনে মানুষ আনন্দিত হয়ে থাকে। শিল্পের আনন্দ দেওয়ার ক্ষমতাটি যেমন সহজেই মানুষের চোখে পড়েছে (আজও পড়ে), তেমনি চোখে পড়েছে আর-একটি ধর্ম—অনুকরণধর্মিতা—রূপস্বরূপতা।

মানুষ তার প্রথম নৃত্যবাদ্যসংবলিত গানের দিকে চেয়ে দেখেছে—নৃত্য-গীতে সামাজিক মানুষেরই নানা আবেগের তথা আচরণের অনুকরণ করা হয়েছে। ভাস্কর্যে ও চিত্রে ব্যক্তি ও বস্তুর মূর্তি গড়বার চেষ্টা করা হয়েছে; বাঁশিতে বা বীণায় যে নির্বাক সংগীত বাজে তাতেও আবেগকেই শব্দধ্বনিতে অনুকরণ করবার চেষ্টা রয়েছে। গল্পে-কাব্যে দেবতার ও মানুষের যে সব কাহিনী রচিত হয়েছে, তাতেও শব্দসংকেতে জীবনের রূপকেই অনুকরণ করা হয়েছে। প্রকাশ সবাক হোক বা নির্বাক হোক, সব ক্ষেত্রেই ভাব ও রূপের অনুকরণ করবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে।

এই অভিজ্ঞতা থেকেই প্রথম যুগের শিল্পদার্শনিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন—শিল্প হচ্ছে অনুকৃতি-করণ (mimesis-making), অনুকরণ। গ্রীসের এবং ভারতবর্ষের শিল্পতত্ত্বমীমাংসার তুলনামূলক আলোচনা করলেই দেখা যাবে—প্লেটো-অ্যারিস্টটলের ধারণার সঙ্গে ভারতীয় মুনি ও আচার্যদের ধারণার অনেকখানি ঐক্য আছে। এই ধারণাকে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে—'অনুকরণবাদ' (imitation theory)। প্লেটোর সঙ্গে অ্যারিস্টটলের এবং প্লেটো-অ্যারিস্টটলের সঙ্গে ভারতের বিদ্যাবুদ্ধিগত পার্থক্য যতই থাক, শিল্প যে অনুকরণ বা অনুকৃতি, শাস্ত্রের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য নিহিত রয়েছে যে শিল্পের অনুকৃতিস্বরূপতায়, এ বিষয়ে সকলেই মোটামুটি একমত। ভরতমুনির কথাই আগে ধরা যাক।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যের স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে ভরত বার বার 'অনুকরণ', 'অনুদর্শক', 'অনুকীর্তন' শব্দ ব্যবহার করেছেন—যেমন "ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্তনম্"…"লোকস্য সর্বকর্মানুদর্শকম্…লোকবৃত্তানুকরণং নাট্যম্…নাট্যং বৃত্তান্তদর্শকম্"। তারপর চিত্রসূত্রেও লেখা আছে—"যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতঃ"। এখানেই ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে আমার সিদ্ধান্তের পক্ষে একটু জোর দেওয়া যাক। "ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা" গ্রন্থে ডক্টর দাশগুপ্ত লিখেছেন—

"অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিতে প্রকৃতের অনুকরণের কোনও ধারণা ছিল না, কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। চিত্র এবং নৃত্য এই উভয়কেই তাঁহারা একজাতীয় মনে করিতেন এবং উভয়কেই তাঁহারা প্রকৃতির অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন। নৃত্যের উৎপত্তিবিষয়ে বলিতে গিয়া বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে প্রলয়ের সময় ভগবান নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য যে অনন্ত জলাশয়ে বিবিধ ভঙ্গীতে চংক্রমণ করিয়াছেন তাঁহার সেই স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতেই নৃত্যের উৎপত্তি। বোধ হয় তাৎপর্য এই যে, যে সাবলীল প্রাণের ক্রিয়াতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিধৃত রহিয়াছে সেই প্রাণপরিস্পন্দনব্যাপারেই ত্রৈলোক্যের স্বরূপ এবং সেই প্রাণব্যাপারের অনুকরণ। এইজন্যই নৃত্য এবং চিত্র উভয়কেই ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে" (১৯ পৃঃ)। ভরতের উক্তি এবং এই উদ্ধৃতি একসঙ্গে পাঠ করলে নিশ্চয়ই পাঠকের মনে এ ধারণা জাগবে যে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের প্রথম দিকে শিল্পকে সামান্যত "অনুকৃতি" বলেই গণ্য করা হত। সামান্যত বলছি এই কারণে যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রেই দৃশ্য-শ্রব্য-কাব্য নাট্যের আত্মাস্থানীয় করা হয়েছে 'রস'কে, অর্থাৎ কাব্যের বৈশেষিক লক্ষণ করা হয়েছে রস বা ভাবকে।

বিশ্লেষণ করে বলতে গেলে বলা যেতে পারে—শিল্প বাহ্যত অনুকৃতি বটে, কিন্তু নিছক রূপের অনুকৃতি সে নয়, সে ভাবের রূপ—ধ্যানের প্রতিমা। এ সম্পর্কে একটু পরেই আলোচনা করতে হবে বলে এখানে আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন নেই। সুতরাং এবারে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের ধারণা সম্বন্ধে দু-এক কথা বলা যাক, ইউরোপীয় শিল্পচিন্তার উৎসে পৌঁছানো যাক। প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার—প্লেটো-অ্যারিস্টটলে এসে গ্রীসের শিল্পতত্ত্বচিন্তা দানা বেঁধে উঠেছে বটে, কিন্তু তাঁদের আগেও অনেকে ছিলেন, অনেক কথা বলেছিলেন এবং অনেক ভালো ভালো কথাও বলেছিলেন। তাঁদের ইতিহাস ইতিহাসের তলে চাপা পড়ে আছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত

দু-একটা কথাই শুধু এভাবে-সেভাবে রক্ষা পেয়েছে। অগত্যা প্লেটো থেকেই আলোচনার যাত্রারম্ভ—অবশ্যই শুভারম্ভ। বিজ্ঞতম সক্রেটিসের শিষ্য যিনি, নৈয়ায়িকশিরোমণির কাছে যিনি দীক্ষা পেয়েছেন বিচার-বিশ্লেষণের, ভাববাদী দর্শনের যিনি মূল প্রবক্তা, এমন একজন দার্শনিকের শিল্পতত্ত্ব-আলোচনা যে অবশ্যই দর্শনমূলক হবে এ কথা সহজেই অনুমেয়। এ অনুমান অক্ষরে অক্ষরেই সত্য।

দার্শনিক মূলসূত্রের আলোকে রেখে বিচার করার রীতিকে আমরা যদি দার্শনিক বিচারপদ্ধতি বলে মনে করি, তাহলে অবশ্যই এ কথা বলতে হবে যে দার্শনিক প্লেটোই প্রথম শিল্পবস্তুকে দর্শনের পটভূমিকায় স্থাপনা করে দেখবার চেষ্টা করেছেন—আইডিয়া-তত্ত্বের আলোকে রেখে শিল্পের প্রকৃতি ও মর্যাদা বিচার করেছেন। প্লেটোর দার্শনিক দৃষ্টি বিশ্লেষণ করবার প্রয়োজন আমাদের নেই। আমাদের শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে প্লেটো ভাববাদী (আইডিয়াবাদী)—তাঁর কাছে 'আইডিয়া'ই হচ্ছে নিত্য এবং সত্য। বিচিত্র বস্তুজগৎ আইডিয়ারই বিশেষ বিশেষ অনুকৃতি—সামান্যের বিশেষরূপে স্থিতি। সামান্য স্বরূপে নির্বস্তু, সংজ্ঞাস্বরূপ—ভাবের পরাদর্শ (আরকিটাইপ)। বিশেষ সবস্তু—সাবয়ব। প্রত্যেক বিশেষে সামান্যরূপী আইডিয়াই বেশী কম ব্যক্ত হয়। যে বিশেষ যে পরিমাণে সামান্যের পরাদর্শকে আপন সত্তায় ধারণ করে, সেই বস্তু সেই পরিমাণে সামান্যের তথা সত্যের নিকটবর্তী। সামান্য থেকে যা যত দূরে, সত্য থেকে, নিত্য থেকে সম্পূর্ণতা থেকে তা তত দূরবর্তী। সামান্যই নিত্য—সামান্যই সত্য—বিশেষ অনিত্য, বিশেষ মিথ্যা বা প্রতিভাস মাত্র। আইডিয়ার জগৎ পারমার্থিক, বস্তুজগৎ প্রাতিভাসিক। শিল্পীদের কারবার এই প্রাতিভাসিক জগৎ নিয়ে। যাঁরা কারুকার্য করেন তাঁরা নির্মাণ করেন বস্তুময় প্রতিভাস (semblance of existence)—ভোগ্যবস্তু; আর যাঁরা চারুকর্ম করেন তাঁরা নির্মাণ করেন—'অবস্তু বস্তুকিঞ্চিৎ', 'appearance'; তাঁরা "the imitator

of that which the others make"। এঁরা "third in the descent from nature"—imitator.

রিপাবলিক গ্রন্থের দশম অধ্যায় থেকে যথাযথভাবে প্লেটোর বক্তব্য উদ্ধার করবার জন্য দীর্ঘ উদ্ধৃতির শরণাপন্ন হচ্ছি। আশা করি প্লেটোর নিজের মুখেই প্লেটোর বক্তব্য (ইংরেজি অনুবাদে) শুনে পাঠক বেশী করে প্লেটোকে বুঝতে পারবেন।

"And there is another artist (besides the workman who makes useful real things) I should like to know what you would say of him."

"Who is he ?"

"One who is the maker of all works of all other workmen . . . This is he who makes not only vessels of every kind, but plants and animals, himself and all other things—the earth and heaven, and the things which are in heaven or under the earth , he makes the gods also . . . Do you not see that there is a way in which you could make them yourself ?—there are many ways in which the feat might be accomplished, more quicker than that of *turning a mirror round and round* . . ."

"Yes", he said, but that is an *appearance* only."

"Very good . . . the *painter*, as I conceive, is just a creator of this sort, is he not ?"

"Of course."

"But then I suppose you will say that what he creates is *untrue*. And there is a sense in which the painter creates a bed ?"

"Yes, . . . but not a *real* bed."

"And what of the manufacturer of the bed ? Did you not say that he does not *make the idea* which is according to our view is the essence of the bed, but only a *particular* bed ?"

"Yes, I did."

"Then if he does not make that which *exists* he cannot *make true existence* but only *semblance of existence* ; and if anyone were to say that the work of manufacturer of

the bed or of any other workman, has real existence, he could hardly be supposed to be speaking the truth. No wonder then that his work too is an *indistinct expression of truth.* Well then here are three beds, one existing in nature which as I think that we may say, is made by God—there is another which is the work of the carpentar ? And the work of the painter is a third ? Beds then are of three kinds and there are three artists who superintend them : God, the manufacturer of the bed and the painter ? . . . Shall we then speak of Him as the natural author or maker of the bed ?

"Yes," he said, inasmuch as by the natural power of creation He is the author of this bed and all other things."

"And what shall we say of the carpenter ; is not he also the maker of the bed ?"

"Yes."

"But would you call the painter a creator and maker ?"

"Certainly not."

"Yet if he is not the maker, what is he in relation to the bed ?"

"I think," he said, "we may fairly designate him as the imitator of that which the others make."

"Good", I said, "then you call him who *is third in the descent from nature an imitator* ; and the tragic poet an imitator and therefore like *all other imitators* he is thrice rsmoved from the king and from tiuth ?"

"That appears to be case. Then about imitator we are agreed . . ."

এই উদ্ধৃতি থেকে পাঠক বুঝতে পেরেছেন প্লেটোর কাছে—

(ক) আইডিয়াই সত্য (essence) এবং আইডিয়ারই নিত্যসত্তা (existence) আছে।

(খ) বিশেষ বস্তুর প্রকৃত বাস্তবতা বা নিত্যতা নেই—আছে সত্তাভাস (semblance of existence)।

(গ) প্রত্যেক বিশেষ বস্তুর একটি এবং একটিমাত্রই ঈশ্বর-কৃত

আদর্শ রূপ আছে। এই রূপকে বলা হয়েছে—'প্রাকৃতিক'। এই শিল্পের স্রষ্টা ঈশ্বর।

(ঘ) দ্বিতীয় শ্রেণীতে রয়েছে—কারুকর্মীদের নানা কর্ম। এই সব বস্তুর নিত্যতা নেই, শুধু সত্তাভাসই আছে।

(ঙ) তৃতীয় শ্রেণীতে রয়েছেন—শিল্পীরা—অনুকারীর দল, যাঁরা অন্যের গড়া বস্তুর প্রতিমা নির্মাণ করেন। ভাস্কর, চিত্রকর, মহাকাব্য-কার, নাট্যকার সকলেই অনুকারী; সকলেই সৃষ্টবস্তুর অনুকৃতি রচনা করেন।

(চ) অতএব শিল্পীরা সকলেই 'সত্য' থেকে তিন ধাপ দূরে অবস্থান করেন।

প্লেটো আরো বলতে চেয়েছেন, শিল্পী "that which originally exists in nature" তাকে অনুকরণ করেন না, অনুকরণ করেন—"only the creations of artists (artificers)" এবং সেখানেও শিল্পী বস্তুটির 'স্বরূপ'কে (as they are) অনুকরণ করতে পারেন না, অনুকরণ করেন শুধু বস্তুর প্রতিভাসকে (image,—as they appear)। অতএব অনুকারীরা "a long way off the truth"। মোট কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে, শিল্পীরা যে অনুকরণ করেন তা বস্তুর রূপের যথাযথ অনুকরণ নয়, বস্তু যে-রূপে শিল্পীর চোখে প্রতিভাত হয় সেই প্রতিভাসিত রূপের (image) অনুকরণ।

উপরে যেটুকু বলা হয়েছে তাতেই প্লেটোর সব কথা নিঃশেষে বলা হয়েছে—এ কথা কেউ যেন মনে না করেন। 'রিপাবলিক' গ্রন্থের বাইরেও শিল্প ও শিল্পী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। সেই সব কথার সঙ্গে এই কথাগুলি মিলিয়ে নিতে পারলেই প্লেটোর ধারণার সম্পূর্ণ বৃত্তটি পাওয়া যাবে। "আয়ন" নামক "ডায়লোগ"-এ প্লেটো যে সব উক্তি করেছেন তাদের তাৎপর্যও অবশ্য লক্ষণীয়। এ সম্পর্কে "এরিস্টটলের পোয়েটিকস্ ও সাহিত্যতত্ত্ব" গ্রন্থে যে আলোচনা করেছি, তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি :—

"প্লেটোর উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেতে পারে : (ক) শিল্পসৃষ্টি দৈব প্রেরণার আবেশের মত একটা আবেশের অবস্থায় সম্ভব, (খ) আবেশবিভোর অবস্থার অর্থ আবেগোদ্দীপিত অবস্থা—যে অবস্থায় বিচার বিকল্প নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়, (গ) কবিতা যুক্তি বা বুদ্ধির সৃষ্টি বা কাজ নয়—অর্থাৎ আবেগের সৃষ্টি। লক্ষণীয় এই যে তত্ত্ব বুদ্ধিসাধ্য এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য, আর কাব্য অনুভবসাধ্য এবং হৃদয়সংবেদ্য—এই ধারণার উদ্ভব প্লেটোর মস্তিষ্কেই প্রথম দেখা যায়। শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে রসসাহিত্যের বিলক্ষণ পার্থক্য যেন এখানেই যে শাস্ত্রসাহিত্যের সৃষ্টি হয়—যুক্তি-বিচার ('reason') থেকে; আর রসসাহিত্যের সৃষ্টি হয়—ভাবাবেশ ('inspiration') থেকে। . . . লক্ষ্য করবার আর একটা বিষয় এই যে "Ion" ডায়লোগের মধ্যে প্লেটো কবিদের তত্ত্বজ্ঞানবঞ্চিত যুক্তিলেশহীন বলে ঘোষণা করেছেন বটে, কিন্তু কবিরা যে সত্যলেশবর্জিত এ কথা বলেন নি। দৈবপ্রেরণাবাদ স্বীকার করলে—কবিরা দৈবপ্রেরিত এ কথা মানলে, অবশ্যই এ কথা স্বীকার করতে হয় যে কাব্যও "divine as coming from God"। স্বীকার করতে হয় poets are interproters of divinitios। কবিরা ভাষ্যকার (interpreters)—

> These souls flying like bees from flower to flower and wandering over the gardens and meadows and the honey-flowing fountains of the Muses return to us laden with the sweetness of melody; and arrayed as they are in the plumes of rapid imagination they speak of truth. (Ion)

কবিরা যে সবই মিথ্যা বলেন না এ স্বীকৃতি এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আর সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে এ কথাটাও যে inspiration একেবারে "beggar" নয়। মনে হয়, একদিকে "আইডিয়া"-বাদ, অন্যদিকে দৈবপ্রেরণাবাদ—আর একদিকে যুক্তি ও আবেগের স্বরূপ বিচার—এই তিন টানায় পড়ে প্লেটোর চিন্তা দ্বন্দ্বমুক্ত হতে পারে নি।"

প্লেটো যখন আইডিয়াবাদী তখন তাঁকে স্থায়ত এ কথা বলতে হয়েছে (ক) অনুকরণ সত্য থেকে তিন ধাপ দূরে, (খ) 'আইডিয়া'কে তথা সত্যকে পাওয়া যায় শুধু যুক্তির (Reason) সাহায্যেই, (গ) শিল্প যেহেতু অনুকৃতের অনুকৃতি,—'আইডিয়া' নয়, শিল্পের জগৎ মিথ্যার বা মায়ার জগৎ, (ঘ) শিল্প বুদ্ধির সৃষ্টি নয়, আবেগের সৃষ্টি; শিল্প 'আইডিয়া' নয় বলেই যুক্তিবিচারসাধ্য কোনো ব্যাপার নয়, আবেগ-মূলক কল্পনার ব্যাপার—'image making'। প্লেটো যখন দৈব-প্রেরণাবাদী তখন তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন—(ক) শিল্প ভাবাবেগের—ভাবাবেশের সৃষ্টি বটে, কিন্তু—শিল্পীর আত্মা "speak the truth"। আবার প্লেটো যখন শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার কথা চিন্তা করেছেন, তখন শিল্পের মনোরঞ্জকত্ব ও মাধুর্য স্বীকার করা সত্ত্বেও শিল্পের আবেদনের অর্থাৎ নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষমতার দিকটা না ভেবে পারেন নি এবং ভেবে দেখেছেন, শিল্প মানুষের বাসনা-কামনা-বক্ষে আবেদন করে—মানুষকে আবেগবিহ্বল করে তোলে—বিশুদ্ধ চিন্তায় প্রবৃত্ত না করে কামনাবিক্ষুব্ধ ও আবেগচঞ্চল তথা বিমুগ্ধ করে তোলে।

উপসংহারে প্লেটোর সিদ্ধান্তগুলি একটু গুছিয়ে নেওয়া যাক এবং দেখা যাক শিল্পের স্বরূপ বিচারে প্লেটো আমাদের কতখানি সাহায্য করেছেন। প্লেটোর আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি :

(১) শিল্প কোনো তত্ত্ব তৈরি করে না। যুক্তির সাহায্যে কোনো 'আইডিয়া' চিন্তা করা শিল্পের উদ্দেশ্য নয়; শিল্প কোনোরূপ তত্ত্বজ্ঞান দান করে না।

(২) শিল্পসৃষ্টি বুদ্ধিসাধ্য কোনো ব্যাপার নয়,—ইণ্টেলেক্টের কাজ নয়।

(৩) শিল্প তৈরি করে অনুকৃতি বা প্রতিমা (images)। শিল্পের জগৎ বিশেষের (particular) জগৎ—appearance-এর জগৎ।

(৪) শিল্পসৃষ্টি আসলে 'image making' ব্যাপার।

(৫) শিল্পসৃষ্টি মূলত ভাবাবেগের ব্যাপার ; কারণ Reason-এর সঙ্গে সৃষ্টির কোনো সম্পর্ক নেই। (Reason বাদ গেলে বাকী থাকে—feeling or emotion) শিল্পের প্রেরণা inspiration।

(৬) শিল্পের আবেদন—বুদ্ধির কাছে নয়, শিল্পের আবেদন—ভাবের কাছে। অর্থাৎ শিল্প মানুষের বুদ্ধিকে পুষ্ট করে না ; পরিতুষ্ট করে আবেগবন্ধকে—মানুষের জীবস্বভাবকে।

(৭) ভাবাবেগ উদ্দীপিত ক'রে ক'রে শিল্প সামাজিক মানুষকে আবেগপ্রবণ করে তোলে, তথা মানুষের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয় এবং আমোদ-প্রমোদের সম্ভোগের প্রবৃত্তি বাড়িয়ে চরিত্রের নৈতিক দৃঢ়তাকে শিথিল করে দেয়।

প্লেটোর উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলি সর্বাংশে সত্য না হলেও, এ কথা কিন্তু সত্য যে প্লেটো শিল্পের বিশেষত্বের কেন্দ্র থেকে খুব একটা দূরে সরে যান নি। যিনি মানুষের নানারূপ 'making'-এর হিসাব করে শিল্পকে 'image making branch'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন—(idea making থেকে পৃথক করেছেন), শিল্পকে 'intellect'-এর ব্যাপার না বলে 'inspiration' এর অর্থাৎ feeling বা emotion-এর ব্যাপার বলে মনে করেছেন, তিনি কল্পনাতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করতে না পারলেও, অবশ্যই আমাদের শিল্পতত্ত্বের মূল সমস্যার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

প্লেটোর পরে প্লেটোরই প্রধান শিষ্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪ ৩২২ খ্রীঃ পূঃ) শিল্পতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক মতৈক্য নিয়ে শুরু হয়েছিল বটে কিন্তু শেষ হয়েছিল মতপার্থক্যে। সেই মতপার্থক্যের গুরুত্ব খুবই বেশী এবং এই কারণেই বেশী যে অনেক ক্ষেত্রে শিষ্য গুরুর বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। গুরু যেখানে বলেছেন—'আইডিয়া'ই সত্য, 'সামান্য'ই বাস্তব (exists), শিষ্য সেখানে বলেছেন আইডিয়া বা 'সামান্য' নামমাত্র, বাস্তব হচ্ছে বিশেষ,—'বিশেষ'ই সত্য। বিশেষ-

নিরপেক্ষ সামান্যের যে অস্তিত্ব তা মানসিক ধারণামাত্র (nomina), তা বস্তু-সত্তা (res = things) নয়। 'সামান্য' ও বিশেষের স্বরূপ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে গুরুশিষ্যের এই মতপার্থক্য অন্যান্য চিন্তার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য মতপার্থক্য সৃষ্টি করেছে। যেমন শিল্পক্ষেত্রে, গুরু যেখানে শিল্পকে 'বিশেষে'র প্রতিভাসের অনুকরণ বলে মিথ্যার জগৎ বলে মনে করেছেন, শিষ্য সেখানে শিল্পকে বিশেষের (particular) আশ্রয়ে বা মাধ্যমে সামান্যের (universal) অনুকরণ বলেছেন, মিথ্যার জগৎ বলে হেয়জ্ঞান না করে শিল্পকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন, শিল্পের সত্যের আধার হওয়ার যোগ্যতা স্বীকার করেছেন। গুরু যেখানে শিল্পের আবেগজনকতা দেখে, শিল্পকে হেয় এবং অপাঙ্‌ক্তেয় করতে চেষ্টা করেছেন, শিষ্য সেখানে শিল্পের 'ক্যাথার্‌সিস্‌' করার ক্ষমতা দেখে, শিল্পকে মঙ্গলজনক বলে ঘোষণা করেছেন। গুরুর কাছে অনুকরণ অনুকৃত বস্তুবিশেষেরই অনুকরণ—বিশেষ বস্তুর প্রতীতির অনুকরণ; স্বাধীন কল্পনার অবকাশ সেখানে নেই বললেই চলে; আর শিষ্যের কাছে অনুকরণ ব্যাপকতর ব্যাপার—'as they are', 'as they appear' এবং 'as they ought to be'—সবই অনুকরণব্যাপারের বিষয়। এই কারণেই, অ্যারিস্টটলকে প্লেটোর 'সরল সংস্করণ' এবং তাঁর দর্শনকে "Plato diluted by common sense" বলা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায় না—এবং গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে সূক্ষ্ম মতভেদ রয়েছে তার তাৎপর্য অবশ্যই উপলব্ধি করা দরকার। এ সম্পর্কে অন্যত্র যে কথা বলেছি এখানে তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"প্লেটো বলেছেন—বিশ্বের সমস্ত বিশেষের মূলে আছে সামান্য এবং সেই সামান্যের পরা-আদর্শ (archetype) ঈশ্বরের মনের মধ্যে বিরাজ করছে। এই সামান্যের বাস্তব সত্তা নিয়েই গুরু-শিষ্যের মধ্যে মতভেদ। গুরুর মতে, সামান্যের বিশেষ-নিরপেক্ষ বাস্তব সত্তা আছে। শিষ্যের মতে—নেই; সামান্য একটা মানসিক ধারণামাত্র, বিশেষই বাস্তব। সামান্য নামমাত্র (nomina), বস্তু (res = things)

নয়।···প্লেটো সত্য কি অ্যারিস্টটল সত্য এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবেশ না করেও আমরা একটা কথা বলতে পারি—যেখানে প্লেটোর মতবাদে অতিপ্রাকৃত রহস্যের যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে, সেখানে অ্যারিস্টটল ধর্মের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার না ক'রে বস্তুসত্তাকে অতিপ্রাকৃত রহস্যের আওতা থেকে মুক্ত রেখেছেন। একে অতিপ্রাকৃতপ্রবণতা, অন্যে অতিপ্রাকৃতবিমুখতা। 'প্লেটো সর্বাধিক প্রয়োজনীয় মনে করতেন সামান্যকে, অ্যারিস্টটল বিশেষকে' (পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস)।

"অতিপ্রাকৃতবিমুখতা শুধু সামান্যের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস্বীকারের মধ্যেই যে ধরা পড়েছে তা নয়—বস্তুর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্যাখ্যার মধ্যে এবং ঈশ্বরকল্পনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে। অ্যারিস্টটলের পরাতত্ত্ব জীববিজ্ঞানের প্রভাবে গড়ে উঠেছে।···বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের ব্যাপারের মূলে কোনো দেবতার ইচ্ছা বা লীলার হাত নেই। অ্যারিস্টটলের দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত বটে কিন্তু সে ঈশ্বর সাংখ্যের পুরুষেরই মতো অসঙ্গ নিষ্ক্রিয় ও চৈতন্যস্বরূপ—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ে তাঁর কোনো হাত নেই। তাঁর মর্যাদা শুধু গতির প্রথম কারণ হিসাবে···বস্তু স্বধর্ম অনুসারেই স্বভাবের পূর্ণ অভিব্যক্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব-জগৎ তার "এন্টেলেকি"র অন্তর্নিহিত আবেগে বিবর্তনশীল। প্রত্যেক বস্তুর অভিব্যক্তি ঘটছে তার অন্তর্নিহিত স্বভাব, গঠন ও উদ্দেশ্যের বশে। প্রত্যেক বস্তু বিশেষ বিশেষ পরিণতির টানে (Entelecheia) অভিব্যক্ত হয়ে থাকে।" [অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব—৯-১১ পৃঃ]

প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মতপার্থক্য সম্বন্ধে আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার অ্যারিস্টটলের আলোচনা সম্পর্কে যে বক্তব্য আছে তা বলা যাক।

অ্যারিস্টটল পোয়েটিকস-গ্রন্থের প্রারম্ভেই শিল্পের প্রকৃতি ও প্রকার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডি—কমেডিও —এবং ডিথাইর‍্যাম্বিক কবিতা এবং বাঁশি ও বীণার নানারূপ সংগীত,

সামান্যধর্মের দিক দিয়ে অনুকরণেরই নানা উপায়। তবে এদের একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য তিনটি বিষয়ে ;—অনুকরণের মাধ্যম, অনুকরণের বিষয় এবং অনুকরণের রীতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন (অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস ও সাহিত্যতত্ত্ব)।" *

অর্থাৎ অ্যারিস্টটলের মতে—শিল্পের সামান্য লক্ষণ হচ্ছে—'মাইমেসিস'। ভাস্কর্য, চিত্র, নৃত্য, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি শিল্পের বিভিন্ন প্রজাতি। মাইমেসিস (অনুকরণ) বলতে অ্যারিস্টটল ঠিক কি বুঝতেন তা জানতে হলে, যেখানে তিনি কবিদের বা শিল্পনির্মাতাদের সঙ্গে শাস্ত্রকারদের পার্থক্য নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন, সেখানকার বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে। প্রচলিত ধারণার সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"লোকে অবশ্য ছন্দের নামের পিছনে 'স্রষ্টা' বা 'কবি' শব্দ যোগ করে থাকে এবং বলে—এলিজিয়াক (শোকগাথার) কবি বা এপিক কবি (অর্থাৎ ষট্‌মাত্রার ছন্দের কবি)। যেন অনুকরণই কবির বিলক্ষণ ব্যাপার নয়, পদ্য লিখলেই নির্বিচারে সকলকে কবি বলা চলে। এমন কি যখন ভৈষজ্যবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ বা প্রকৃতিবিজ্ঞানও পদ্যে লেখা হয় তখনও যথারীতি লেখককে কবি আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু হোমর এবং এম্পিডোকসের মধ্যে ছন্দের ঐক্য ছাড়া কোনো বিষয়েই ঐক্য নেই ; সুতবাং একজনকে কবি বলাই উচিত আর একজনকে কবি না বলে পদার্থতত্ত্ববিদ বলাই সঙ্গত।" (অ্যাঃ পোঃ ও সাঃ)। অ্যারিস্টটলের বলার অভিপ্রায় এই যে—ভৈষজ্যবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় 'তত্ত্ব' (সংজ্ঞা) ব্যক্ত করা

* Epic Poetry and Tragedy, Comedy also and Dithyrambic Poetry, and the music of the flute and of the lyre in most of their forms, are all in their general conception modes of imitation. They differ, however, from one another in three respects—the medium, the objects, the manner or mode of imitation, being in each case distinct.—The Poetics of Aristotle—Butcher.

হয়, আর সাহিত্য-শিল্প ছন্দোবদ্ধ ভাষায়—"imitates character, emotion and action"। তাঁর বক্তব্য আরো স্পষ্টাকার ধারণ করেছে যেখানে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। চিত্র অনুকরণ, এ কথা বুঝাতে তেমন বেগ পেতে হয় না, সংগীতে ভাবাবেগের অনুকরণ করা হয় এ কথাও সহজে বুঝানো যায়, নৃত্যে চরিত্র, আবেগ ও ক্রিয়াকলাপ অনুকৃত হয়, এ কথাও অনেকের কাছে বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু কাব্যশিল্প যে সামান্যলক্ষণে অনুকরণ—এ কথাটা সহজে আমাদের মনে ধরতে চায় না। তাই অ্যারিস্টটল কাব্যশিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে, প্রথমত তাকে পদার্থতত্ত্ব, ভৈষজ্যতত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বপ্রতিপাদক রচনা থেকে পৃথক করবার চেষ্টা করেছেন, দ্বিতীয়ত তাকে অনুকরণদেশীয় 'ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে পৃথক করেছেন। সেই বিশ্লেষণটুকু পর্যালোচনা করলে আমরা অ্যারিস্টটলের শিল্পতত্ত্বচিন্তার বৈশিষ্ট্য বেশি করে উপলব্ধি করতে পারব—এই মনে করেই আমি এখানে তা উপস্থাপিত করছি: "আগে যে সব কথা বলা হয়েছে তাতে এ কথাটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, যা ঘটেছে তারই বিবরণ দেওয়া নয়; কবির কাজ—যা ঘটতে পারে, আবশ্যিকতা ও সম্ভাব্যতার দিক দিয়ে যা সম্ভব, তাই বিবৃত করা। কবির এবং ঐতিহাসিকের পার্থক্য পদ্যে-লেখার বা গদ্যে-লেখার পার্থক্য নয়। হেরোডোটসের রচনা পদ্যেও লেখা যেত এবং ছন্দ থাকা সত্ত্বেও যেমন তেমনি ছন্দ না থাকলেও, রচনাটি ইতিহাসই হত। আসল পার্থক্য এখানেই যে একজন বর্ণনা করেন "যা ঘটেছে", অন্যে করেন—"যা ঘটতে পারে"। সুতরাং কাব্য ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর দার্শনিকতাময় এবং মহত্তর সামগ্রী। কারণ কাব্য প্রকাশ করতে চায় 'সামান্য'কে (universal), ইতিহাস প্রকাশ করে 'বিশেষ'কে (particular)। অবশ্য তত্ত্বগ্রন্থে 'সামান্য' যেভাবে অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিকরূপে ব্যক্ত হয় কাব্যে 'সামান্য' সেভাবে ব্যক্ত হয় না। কাব্যের 'সামান্য'—'how a person of a certain type will on occasion speak and act,

according to the law of probability or necessity'। আসল কথা, ইতিহাস প্রকাশ করে নিছক 'বিশেষ'কে আর কাব্য ব্যক্ত করে বিশেষের মাধ্যমে সামান্যকে, বিশেষের আদর্শ রূপটিকে। কবির কাজ 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্'-গোছের কোনো ব্যাপার নয়, কবি ব্যক্ত করেন—'what may happen'কে অর্থাৎ ঘটনার আদর্শ রূপটিকে—রূপের পরাদর্শকে তথা বিশেষ-আশ্রয়ে সামান্যকেই। অ্যারিস্টটল যেন বলতে চান—তত্ত্ব গ্রন্থে ব্যক্ত হয় সামান্যের নির্বিশেষ রূপ, ইতিহাসে বিশেষের নিছক বিশেষ রূপ এবং কাব্যে সামান্যের সবিশেষ রূপ অর্থাৎ বিশেষের সামান্যরূপ।

অ্যারিস্টটল শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নির্ধারণ করবার যে চেষ্টা করেছেন প্লেটোক্ত লক্ষণের সঙ্গে তার ঐক্য রয়েছে এই যে, দুজনেই শিল্পকে বিশেষের প্রকাশ অর্থাৎ image-making বলেছেন ; উভয়ের পার্থক্য এই যে, প্লেটোর মতে শিল্প হচ্ছে বিশেষ বস্তুর প্রতিভাসের অনুকরণ, আর অ্যারিস্টটলের মতে শিল্প হচ্ছে বিশেষ-মাধ্যমে রূপ-সামান্যেরই প্রকাশ। প্লেটোর বিশেষ সামান্য-বর্জিত, অ্যারিস্টটলের বিশেষ সামান্যব্যঞ্জক। শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা প্লেটো-অ্যারিস্টটলে এই পর্যন্তই এগিয়েছে।

পোয়েটিকস গ্রন্থে অ্যারিস্টটল অতিসামান্যত শিল্পতত্ত্ব, সামান্যত সাহিত্যতত্ত্ব, বিশেষত নাট্যতত্ত্ব এবং মহাকাব্যতত্ত্ব এবং অতিবিশেষত ট্র্যাজেডিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সব বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি শিল্পতত্ত্বভুক্ত নানা প্রশ্নের উত্থাপন ও মীমাংসা করবার চেষ্টা করেছেন। চেষ্টা সব ক্ষেত্রেই যে চূড়ান্ত মীমাংসায় পরিণত হয়েছে তা নয়, কিন্তু তা যে সব প্রশ্নের বা সমস্যার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য। যেমন ধরা যাক শিল্পসৃষ্টির প্রেরণার প্রশ্নটি। প্লেটোর মতে শিল্পের প্রেরণা—inspiration, ভাবোন্মাদনা—দৈব অনুপ্রেরণা। অ্যারিস্টটলের মতে শিল্পের প্রেরণা রয়েছে মানুষের স্বভাবের দুটি বৃত্তির মধ্যে। এক—মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি—'অনুচিকীর্ষা'

(instinct of imitation); মানুষ—"most imitative of living creatures" এবং সব মানুষই অনুকৃত বস্তু দেখে আনন্দ পায়; কারণ অনুকৃত বস্তু দেখার অর্থ বস্তুটিকে জানা অর্থাৎ অনুকৃত বস্তু দেখার আনন্দ মূলত জ্ঞানেরই আনন্দ। দুই—মানুষের মধ্যে "instinct for harmony and rhythm"—ছন্দ- ও সুষমা-বোধ রয়েছে। এই দুই সংস্কারের পরিশীলিত বা পরিণত অবস্থা থেকে শিল্পের উৎপত্তি হয়েছে। বিশেষ লক্ষণীয় এই যে, "instinct of imitation" এবং "instinct for harmony and rhythm"—দুটিই চৈতন্যসাপেক্ষ ব্যাপার। প্রথমত, উপলব্ধ বিষয়ের বা প্রতীতির অনুরূপ রূপ তৈরি করা মূলত জ্ঞানকর্মাত্মিকা ক্রিয়াই বটে। দ্বিতীয়ত, সুষমা- ও ছন্দ-চেতনাও বোধক্রিয়ারই আনুষঙ্গিক সংস্কার। অঙ্গবিন্যাসে যে দৈহিক সুষমা সৃষ্টি হয় তার নাম 'হারমনি' আর গতিলয়ের কালমাত্রার বৈশিষ্ট্য থেকে যে সুষমার সৃষ্টি হয় তার নাম ছন্দ। ছন্দ- ও সুষমা-বোধ রূপচেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-ভাবে সংযুক্ত। আরো লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'অনুচিকীর্ষা' থেকে শিল্পের জন্ম—এ কথাটি অ্যারিস্টটল অনুকরণের আপাত সহজ অর্থে ব্যবহার করেন নি। প্রমাণ: "Persons, therefore, with natural gift developed by degrees their special aptitudes, till their rude improvisation gave birth to poetry"। অনুকরণ যখন 'what has happened'-এর গণ্ডী ছাড়িয়ে 'what may happen'-এর স্তরে গিয়ে পৌছায়, তখন অনুকরণ ও কল্পনার ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হয়েই যায়।

তারপর ধরা যাক, শিল্পসম্ভোগজনিত আনন্দের স্বরূপ বিচারের কথা। শিল্প সামাজিকের মনে আনন্দ দেয়—এ কথা সব যুগের এবং সব লোকেরই কথা। কিন্তু এই আনন্দের কারণ কি?—এ প্রশ্নের উত্তরে সকলে এক কথা বলেন নি। আমরা দেখি, এ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের সিদ্ধান্ত অতি যুক্তিযুক্ত। এ আনন্দ কোনো ব্যক্তিগত সাধারণ বাসনা-কামনার পরিপূরণ থেকে জন্মে

না, এ আনন্দ জন্মে সার্থক অনুকরণ-উপলব্ধি থেকে—অনুকরণের যাথাযথ্য ও সুষমা উপভোগ করার ফলে। এই আনন্দ রূপের পরাদর্শ দেখার তথা জানার আনন্দ। যে কয়েকটি যুক্তির উপরে দাঁড়িয়ে অ্যারিস্টটল তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—তা অবশ্য উল্লেখ-যোগ্য। এ বিষয়ে তাঁর প্রথম যুক্তি এই—

> "and no less universal is the pleasure felt in things imitated. We have evidence of this in the facts of experience. Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate when reproduced with minute fidelity. . . The cause of this again is that to learn gives the loveliest pleasure. . ."

দ্বিতীয় যুক্তি উদ্ধৃতাংশের শেষ পঙ্‌ক্তিটিতে ব্যক্ত হয়েছে—আসলে অনুকৃত বস্তু দেখলে যে আনন্দ হয় তার কারণ নিহিত রয়েছে ভাবের আরো গভীরে—জ্ঞানতৃষ্ণার মধ্যে : "to learn gives the loveliest pleasure"। মোটকথা অ্যারিস্টটলের কাছে অনুকরণ ব্যাপারটি জ্ঞানমূলক ব্যাপার এবং শিল্পের আনন্দও জ্ঞানমূলক।

তারপর ধরা যাক, সৌন্দর্যের ধারণার কথা। যাঁরা শিল্পতত্ত্বকে সৌন্দর্যতত্ত্ব বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে সৌন্দর্যের ধারণার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাব—অ্যারিস্টটলের শিল্পতত্ত্বে সৌন্দর্যের স্থান গৌণ ; সৌন্দর্য অনুকৃত বস্তুরই রূপগত একটা ধর্ম ; অনুকরণব্যাপারের সঙ্গে নিমিত্তকারণ হিসাবে যুক্ত থাকে যে 'হারমনি' বা 'রিদম্‌'-সংস্কার, বস্তুদেহে সেই হারমনি বা রিদমেরই বিশেষ অভিব্যক্তি। সৌন্দর্য অনুকরণেরই আনুষঙ্গিক ফল, অনুকরণের উৎকর্ষ-লক্ষণ। অ্যারিস্টটলের ধারণা—

> "A beautiful object whether it be a living organism or any whole composed of parts, must not only have an orderly arrangement of parts, but must also be of a certain magnitude, for beauty depends on magnitude and order."

অর্থাৎ সৌন্দর্য বস্তুত আকৃতিগত (formal)—অনুকৃত বস্তুর আয়তনগত বা অঙ্গসংস্থানগত সুষমা। কিন্তু আয়তন এবং অঙ্গসংস্থানকে যেহেতু তিনি নিরপেক্ষ সত্তা বলে মনে করেন নি এবং যেহেতু অনুকরণের উদ্দেশ্য বিশেষের সামান্য (universal) রূপটিকে ব্যক্ত করা, সৌন্দর্যকে নিছক আকৃতিগত মনে করবার কোনো প্রবল যুক্তি নেই—বরং এই কথাই বলা চলে যে সৌন্দর্য হচ্ছে বস্তুর সামান্য রূপের আয়তনগত সুষমা—সৌন্দর্য রূপের সামান্য মূর্তির সুষমা। অবশ্য এ কথা অ্যারিস্টটল স্পষ্ট ভাষায় বলেন নি, তাঁর সিদ্ধান্তেরই যুক্তিযুক্ত অনুসিদ্ধান্ত। তবে এ কথাও সত্য যে তিনি সৌন্দর্যকে স্বতন্ত্র বা নিরপেক্ষ কোনো সত্তা হিসাবে গ্রহণ করেন নি—রূপ, সত্য, মঙ্গল ও আনন্দ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নিয়ে সৌন্দর্যকে বিচার করতে চেষ্টা করেন নি। আগের উক্তিতে যেমন আকৃতিগত সুষমা সৌন্দর্যের লক্ষণ হিসাবে ধরা হয়েছে, তেমনি—"the beautiful is that good which is pleasant because it is good" (Rhetoric)। এই উক্তিতে তিনি সৌন্দর্যকে আনন্দ ও মঙ্গল-সাপেক্ষ করেছেন। সে যাই করুন না কেন, এ সিদ্ধান্ত করলে ভুল করা হবে না যে অ্যারিস্টটলের কাছে—শিল্প রূপরচনা, সৌন্দর্য রূপেরই আকৃতিসুষমা এবং শিল্পের সঙ্গে সামাজিকের মনের যোগ ঘটলে সামাজিক মনে যে আনন্দ জন্মে তা সাধারণ আনন্দ নয়—শিল্পের রূপচমৎকারিত্ব উপলব্ধি করার বিশেষ আনন্দ।

শিল্পতত্ত্বের সাধারণ আলোচনা ছাড়াও অ্যারিস্টটল সাহিত্যশিল্পের অন্যতম প্রজাতি নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষত ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে, অবিস্মরণীয় আলোচনা করেছেন এবং মহাকাব্যের স্বরূপ এবং সমালোচনা বিষয়েও মৌলিক চিন্তা করেছেন। এই সব চিন্তার শুধু যে ঐতিহাসিক মূল্যই আছে তা নয়, ট্র্যাজেডিতত্ত্ব আলোচনায় আজও অ্যারিস্টটলের চিন্তা সত্যের স্বকীয় মর্যাদা নিয়ে বিরাজ করছে—ট্র্যাজেডি, কমেডি, মহাকাব্য প্রভৃতি

সাহিত্য-শিল্পের স্বরূপ বিচারে আজও অ্যারিস্টটলের উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সেই বিচারক্ষেত্রে প্রবেশ করার অবকাশ এখানে নেই। অতএব এখানেই প্রথম পর্বের ইতিহাস শেষ করছি।

প্লেটো-অ্যারিস্টটলের পরে এবং মধ্যযুগের পূর্বে, শিল্পতত্ত্বচেতনার যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়—শিল্পের স্বরূপলক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা খুব একটা এগিয়ে না গেলেও, শিল্পের আনুষঙ্গিক ও অপরিহার্য ধর্ম সুষমা বা সৌন্দর্য প্রভৃতির সংজ্ঞা বিষয়ে নতুন নতুন কথা অনেকে বলেছেন। এই যুগের (আলেকজান্দারের মৃত্যু ৩২৩ খ্রীঃ পূঃ থেকে—রোমসাম্রাজ্যের রাজধানীরূপে কনস্ট্যান্টি-নোপলের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) চিন্তা হিসাবে যাঁদের মন্তব্যাদি উল্লেখ করা হয়ে থাকে তাঁরা হচ্ছেন—স্টোয়িক-পন্থী ক্রাইসিপ্পাস, পোসেইডোনিয়াস; এপিকিউরাস-পন্থী ফিলোডিমাস; আলেকজান্দ্রিয়ার সাহিত্য-সমালোচক এরিসটারকাস ও জোইলাস; হেলিকারনেসাসের ডাওনিসিয়াস, সিসেরো, **লঙ্গিনাস,** কেইরোনিয়ার প্লুতার্ক (৫০—১০০ খ্রীঃ অঃ), দিয়ো ক্রাইসোসস্তোম (৫০ খ্রীঃ অঃ ১১৭ খ্রীঃ অঃ), ফিলোসট্রেটাস **প্লোটিনাস** (জন্ম—২০৫ খ্রীঃ অঃ—মৃত্যু—২৭০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি। **ক্রাইসিপাস** (খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী) একটি উক্তিতে, সৌন্দর্য সৃষ্টিকে প্রয়োজননিরপেক্ষ ব্যাপার বলে স্বীকার করার পথ প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলেছেন—

> "Many animals have been produced by nature with a view to beauty in which she takes delight enjoying their colouring."

প্রকৃতি যদি বিনা প্রয়োজনে অর্থাৎ শুধু রঙের বাহার দেখবার জন্যই নানা প্রাণী সৃষ্টি করে থাকে, তবে মানুষ শুধু সৌন্দর্য উপভোগেরই উদ্দেশ্যে সুন্দর সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করতে পারবে না কেন? এই ক্রাইসিপাসই আবার বলেছেন—সিসেরোর উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়—এই বিশ্বই একমাত্র সম্পূর্ণ, মানুষ অপূর্ণ, যদিও

তার মধ্যে পূর্ণতার অংশ কিছু আছে এবং তার জন্ম হয়েছে—"to contemplate and imitate the universe"। ক্রাইসিপাসের দু শতাব্দী পরে পোসেইডোনিয়াসও কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অ্যারিস্টটলেরই অনুসরণে লিখেছেন—"পার্থিব ও অপার্থিব বস্তুর অনুকরণ" (comprising an imitation of human and divine things)।

'সিসেরো'র মধ্যে দেখা যায়, তিনিও শিল্পকে অনুকরণ (copy) বলে মনে করেছেন—বলেছেন শিল্পী তাঁর মনের ভিতরকার ধ্যান বা ছবিকেই অনুকরণ করে থাকেন এবং ঐ ধ্যান বা মানসমূর্তিই হচ্ছে সৌন্দর্যের আদর্শ। সৌন্দর্যের শ্রেণীবিভাগ করতে সিসেরো লিখেছেন—

> "Seeing that there are two kinds of beauty, one of which consists in grace, the other in dignity ; we must consider grace as feminine and dignity as masculine beauty."

তাঁর আগে কেউই নাকি এমন কথা লেখেন নি এবং তাতে বার্নার্ড বোসাঙ্কের মতে—গ্রীসের সৌন্দর্যধারণা থেকে বেশ এক ধাপ এগিয়ে আসা হয়েছে। কারণ, সৌন্দর্যকে আকৃতি-প্রকৃতি উভয় দিক থেকে বিচার করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

তারপর, লংগিনাসের লেখা থেকেও ('অন দি সাবলাইম' নামে বহুপরিচিত) আমরা বুঝতে পারি—শিল্পকে নিছক অনুকরণ বলে উপেক্ষা করার মনোভাব বেশ কেটে গেছে এবং আত্মার গভীর ধ্যান-ধারণার সঙ্গে শিল্পকে সমান বা এক করে দেখা হয়েছে। মানুষকে প্রকৃতি হীন করে সৃষ্টি করে নি, সে তাকে জীবন দিয়েছে, এনেছে এই বিশ্বের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে, করেছে তাকে একাধারে দ্রষ্টা ও প্রতিদ্বন্দ্বী ; স্রষ্টা আত্মার মধ্যে প্রথম থেকেই 'মহতোমহীয়ান'এর জন্য অদম্য আকৃতি দিয়ে দিয়েছে। অতএব এই বিরাট বিশ্বকে পেয়েও মানুষের আত্মা অতৃপ্ত থাকে, আরো বিরাটকে পাওয়ার

জন্য দেশকালের সীমা পেরিয়ে যেতে যায়। যখন আমরা সৃষ্টির দিকে চেয়ে দেখি—সেখানে কত বিরাট, কত মহান, কত সুন্দর বিরাজ করছে, তখনই আমরা বুঝতে পারি—মানুষের জীবনেরও প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। মানুষের স্বভাব ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছতা বা প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় না, তাকে নীল, ডানিয়ুব, রাইন এবং শেষ পর্যন্ত সাগর-মহাসাগরের বিরাটত্ব দেখতে প্রেরণা দেয়। এই বিরাট দর্শনের প্রেরণা থেকেই 'সাবলাইম' শিল্পকলার জন্ম। স্রষ্টাদের মধ্যে যাঁরা সামান্য তাঁরা দেখান ক্ষুদ্রকে ও পরিচিতকে, আর যারা অসামান্য দৈবীশক্তির অধিকারী তাঁরা দেখান বিরাটকে—মহীয়ানকে। *

আত্মার মহত্ত্বই মহান শিল্পের রূপ পরিগ্রহ করে—"Sublimity is, so to say, the image of the greatness of soul."

লংগিনাস শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে—বৈশেষিক লক্ষণ নির্ধারণে কোনো নতুন কথা না বললেও, শিল্পের মহত্ত্ব বা মহীয়ানত্ব নিরূপণের যে চেষ্টা করেছেন তা অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং উল্লেখযোগ্য। "সাবলাইম"তত্ত্ব নিয়ে আলোচনার সূচনা তিনিই করেছেন এবং সেই যুগে তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। 'কেইরোনিয়া'র প্লুতার্কের (৫০—১০০ খ্রীঃ অঃ) কৃতিত্ব এই যে তিনি অ্যারিস্টটলেরই একটি সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। "যা কুৎসিত তা শিল্পে সুন্দর হতে পারে কি?" এই প্রশ্নটি উত্থাপন এবং আলোচনা করে তিনি 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য' এবং 'শিল্পের সৌন্দর্য' এই দুই সৌন্দর্যের ধারণাকে স্পষ্টতর করার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে প্লুতার্কের সিদ্ধান্ত এই যে—যা বস্তুত কুৎসিত তা কখনই সুন্দর হতে পারে না, সুন্দর বলে প্রশংসিত হয়—অনুকৃতি-রচনার শক্তিটুকুই। কুৎসিত বস্তুর ছবি কখনও সুন্দর ছবি হতে পারে

* "When a writer uses any other resource, he shows himself to be a man, but the sublime lifts near to the great spirit of the Deity."

না; তা যদি হয় তবে বুঝতে হবে অনুকার্য বস্তুর রূপান্তর ঘটে গেছে। অতএব—"Beauty and to imitate beautifully are quite different things"। প্লুতার্ক বলতে বা বুঝাতে চেয়েছেন শিল্পের সৌন্দর্য সৃজনক্ষমতার নৈপুণ্যের মধ্যেই নিহিত থাকে। লৌকিক জগতে বস্তুকে কুৎসিত ও সুন্দর বলা হয় যে-বিচারে, সেই বিচারে শিল্পের সৌন্দর্য নির্ধারণ করা যায় না। শিল্পে কুৎসিত বলে গণ্য হয় সেই যা সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত হয় নি, যা সুব্যক্ত তাই সুন্দর। লৌকিক জগতে যা কুৎসিত শিল্পে তা যদি সুব্যক্ত হয়, তাহলে তা সুন্দর; আবার অন্যপক্ষে, লৌকিক জগতে যা 'সুন্দর' বলে গণ্য, সে যদি সুষ্ঠু আকারে ব্যক্ত না হয় তাহলে তাকে 'সুন্দর' বলা চলবে না। প্লুতার্কের বক্তব্যের তাৎপর্য বুঝতে যদি আমরা ভুল না করে থাকি তাহলে এ কথা বলতেই হবে—শিল্পের সুন্দর-অসুন্দর কি?—এই প্রশ্নের আলোচনায় প্লুতার্ক যা বলেছেন তাতে শিল্পবিচারের একটি মূলসূত্রের দিকেই তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তবে শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি গভীর কোনো তত্ত্বকথা আমাদের শোনাতে পারেন নি। তাঁর তুলনায় দিও ক্রাই-সোসস্তোম একাধিক তত্ত্বকথা শুনাতে চেষ্টা করেছেন। দিও ক্রাই-সোসস্তোম বলতে চেয়েছেন—শিল্পসৃষ্টি কোনো ধরাবাঁধা আইডিয়ার অনুকরণ নয়, সৃজনব্যাপার আসলে মনের মধ্যে উদ্ভূত ধারণাকে বাস্তবাকার দেওয়া চেষ্টা—বোসাঙ্কের ভাষায় "to give adequate reality to conceptions which before and apart from such realisation are not definite"। 'আইডিয়া'কে অতীন্দ্রিয় জগৎ থেকে নামিয়ে রূপ-সত্তার ব্যাপারে পরিণত করার এই যে চেষ্টা তাতে লেখকের বাস্তবপ্রবণতাই সূচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দিও ক্রাইসোসস্তোম, কাব্য ও অন্যান্য নির্মাণকলার ঐক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন—কাব্যকলার ক্ষেত্র অন্যান্য কলাক্ষেত্রের চেয়ে অনেক ব্যাপক; কাব্যকলা রূপের জগৎ ও ভাবের জগৎকে

সমানভাবে প্রকাশ করতে পারে, দেশ-কালের আয়তনের উপরেও তার অধিকার অনেক বেশি।

কাব্যকলার বিশেষত্ব নিরূপণের চেষ্টা হিসাবে ক্রাইসোসস্তোমের এই মন্তব্য খুবই উল্লেখযোগ্য। চারুকলাগুলির ব্যাপ্তির ও শক্তির তুলনামূলক আলোচনা এই প্রথম, এ কথাও স্মরণে রাখা দরকার।

তত্ত্বকথা হিসাবে অবশ্য **ফিলোসট্রেটাসের** (৩য় শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক) রচনা—"much matter of aesthetic interest"। 'এপোল্লোনিয়াসের জীবনী'তে তিনি অনুকরণবৃত্তি ও কল্পনাবৃত্তির স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন, শিল্পতত্ত্বের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। 'অনুকরণ' বলতে সকলেই যা বুঝে থাকেন, তিনিও সেই সংকীর্ণ অর্থটিই গ্রহণ করেছিলেন—বুঝেছিলেন "Imitation will make what it has seen. . ."; সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝেছিলেন, শিল্প শুধু তো দৃষ্টের পুনরাকরণ নয়, শিল্প নতুন নতুন রূপের উন্মেষণ বা উদ্ভাবনও বটে, সুতরাং অনুকরণের উপরেও আর একটি বৃত্তি আছে যা অদৃষ্টের রূপ তৈরি করে। এই বৃত্তির নাম—কল্পনা। এই কল্পনাবলেই ফিডিয়াস দেবতাদের মূর্তি গড়েছিলেন—স্বর্গে যেয়ে দেবতাদের দেখে এসে, তারপর তাঁদের মূর্তি অনুকরণ করেন নি :

> "It was imagination that wrought these forms, a more cunning artist than imitation. Imitation will make what it has seen, but imagination will make what it has not seen."

যদিও এ কথা আমরা বলব না যে ফিলোসট্রেটাস কল্পনাতত্ত্বের সবকিছু জেনেছিলেন, তাঁর আলোচনাতেই শিল্পতত্ত্ব স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে—তবু এ কথা বলতেই হবে—কল্পনাবৃত্তির স্বভাব নির্ধারণ করার চেষ্টা করে, তিনি চিন্তাক্ষেত্রকে কিছু পরিমাণে পরিষ্কার করেছেন—চিন্তাকে বেশ একটু এগিয়েও দিয়েছেন। পরবর্তী কালে যে সৃজনশীল কল্পনাকে (creative imagination) শিল্পের জন্মভূমি বলে মর্যাদা

দেওয়া হয়েছে, তার সাক্ষাৎকার এখানে নিশ্চয়ই মিলবে না। কিন্তু কল্পনাবৃত্তিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সূচনা যে এখানেই সে কথা অস্বীকার করলে চলবে না। শিল্প শুধু দৃষ্ট বস্তুকেই উপস্থাপিত করে না—এ কথা যিনি বলেন তিনি অবশ্যই সংকীর্ণ অনুকরণবাদের গণ্ডী থেকে আমাদের দূরে নিয়ে আসেন।

এই প্রশ্নেরই নতুন আলোচনা পাওয়া যায় বিখ্যাত নব্য-প্লেটোবাদী প্লোটিনাসের (২৯৫ খ্রীঃ—২৭০ খ্রীঃ) লেখায়। প্লোটিনাস প্লেটোর আইডিয়া এবং ঈশ্বর-সত্তার সংযোগে এমন এক দার্শনিক দৃষ্টিকোণ তৈরি করে নিয়েছিলেন যেখান থেকে দেখলে শিল্পকে মিথ্যা বা মায়া মনে করা যায় না। তাঁর বক্তব্য এই—"শিল্প প্রাকৃতিক বস্তুর অনুকরণ এ কথা বলে কেউ যদি শিল্পকে হেয় করতে চায়, তাহলে প্রথমেই আমাদের এ কথা বলতে হবে যে প্রাকৃতিক বস্তু ও আরো দূরবর্তী কিছুর (মূলীভূত বুদ্ধি বা আইডিয়ার) অনুকরণ এবং এ কথাও মনে রাখতে হবে যে শিল্প শুধু যা চোখে দেখা যায় তারই অনুকরণ করে না," যে 'আইডিয়া বা রিজিন' থেকে প্রকৃতির উদ্ভব সেই 'রিজিন'-এর জগৎকেই রূপ দিতে চেষ্টা করে। অধিকন্তু শিল্পীরা ভিতরকার সৌন্দর্যবোধের প্রেরণাতেই সৃষ্টি করে থাকেন এবং তা করেন বলেই খণ্ডিতকে অখণ্ড রূপ দিয়ে থাকেন। ফিডিয়াস জিউসের কোনো ধরাবাঁধা রূপের উপলব্ধিকে মূর্তি দেন নি, জিউস শরীর ধারণ করে মানুষের সামনে এসে দাঁড়াতে চাইলে যে মূর্তি পরিগ্রহ করতেন, ফিডিয়াস সেই মূর্তিকেই নির্মাণ করেছেন—এই যেখানে প্লোটিনাসের ধারণা, সেখানে শিল্পকে যে শুধু পরিদৃশ্যমান বস্তুর অনুকরণ বলে মনে করা হচ্ছে না—অদৃশ্য ভাবলোকের বা সত্তার ধ্যানমূর্তি বলে স্বীকার করা হচ্ছে, এ কথা অবশ্যই বলা যায়। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলতে হয় যে—যেহেতু প্লোটিনাসের কাছে ভাব দৈবনিরপেক্ষ কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়—ভাব দৈবনিঃসৃত, সেই হেতু শিল্পের সৌন্দর্য নির্ভর করে

তার ভাবগ্রাহিতার তথা দৈবসত্তার মাত্রার উপরেই। প্লটিনাসের মতে—

"A beautiful material thing is produced by participation in reason issuing from the Divine."

দৈবনিঃসৃত ভাবনার সঙ্গে যোগযুক্ত বা তদ্‌গত হয়েই সুন্দর বস্তু সৃষ্টি করা হয়। এই হিসাবে সৌন্দর্য ভাবনিহিত অর্থাৎ নিছক আকৃতি-সুষমার মধ্যে সৌন্দর্য সীমাবদ্ধ নয় এবং ভাব যেহেতু দৈবাশ্রয়ী, সৌন্দর্যও দৈবাশ্রয়ী। সেই বস্তুই সুন্দর যার মধ্যে 'আইডিয়া' সুব্যক্ত হয়েছে, অসুন্দর বা কুৎসিত হচ্ছে তাই যাতে তা ব্যক্ত হতে পারে নি বা যা আইডিয়ার আধার হওয়ার অনুপযুক্ত। বেনিডেটো ক্রোচের ভাষ্যে—

"A beautiful body is such, because of its communion with the Divine; beauty is the Divine, the Idea shining through."

শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে প্লটিনাসের গুরুত্ব এখানেই। প্লটিনাসই প্রথম শিল্পের জগৎকে এবং সুন্দরের জগৎকে এক করে দেখেছেন— শিল্পচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনাকে আধ্যাত্মিক আবেগের সঙ্গে একাকার করে তুলেছেন তথা সত্যের সঙ্গে শিবের এক মহাসমন্বয় ঘটিয়েছেন। শিল্পী যখন আইডিয়া বা সত্যকে সুব্যক্ত করে তখনই সুন্দরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সত্যের সুন্দর ধ্যান নির্মল চিত্তেই সম্ভব বলে সুন্দরকে সৃষ্টি করবার জন্য বিশুদ্ধ চিত্ত আবশ্যক। যে চিত্ত বিশুদ্ধ তা শিব-চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়ে পারে না। অতএব সৌন্দর্যচেতনার সঙ্গে শিবচেতনা অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত। ক্রোচের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাক—

"It is only with Plotinus that the two divided territories are united and the beautiful and art are fused into a single concept . . . And thus we reach an altogether new view : the beautiful and art are now both alike melted into a mystical passion and elevation of the spirit."

(Aesthetic—P. 166)

প্রথম যুগের চিন্তার ইতিহাস—প্লেটো থেকে প্লটিনাস পর্যন্ত শিল্পতত্ত্বের কথা—এখানেই শেষ হল।

ইউরোপীয় ইতিহাসে মধ্যযুগ ও রেনেসাঁস নামে যে যুগ চিহ্নিত তার শিল্পতত্ত্বচিন্তা সম্বন্ধে এক কথায় কিছু বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয় যে এই সময়ে শিল্পতত্ত্বচিন্তায় উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে নি—গ্রীস-রোমের চিন্তার গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে গভীরতর কোনো চিন্তা কেউ করেন নি। নব-প্লেটোপন্থী প্লটিনাসের ঈশ্বরমূলক বা আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে খ্রীস্টপন্থীদের ধর্মদর্শন খুব সহজেই নিজেকে মিলিয়ে নিতে পেরেছিল—অতি অবাধেই ভাববাদীর 'আইডিয়া'র আসনে খ্রীষ্টকথিত 'ঈশ্বর' সত্য-শিব-সুন্দর উপাধি নিয়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সে যাই হোক, প্লটিনাসের চিন্তার খাতেই যে এই যুগের শিল্প-ভাবনা প্রবাহিত হয়েছিল এই কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে—এই যুগে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে—সৌন্দর্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের আধারে ভাবের (রিজন্) অভিব্যক্তি—দৈবসত্তার সাকার প্রকাশ। শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসকার শ্রদ্ধেয় বোসাঙ্কের ভাষায় বলা যাক—

> "That beauty is the revelation of reason in sensuous shape, that its fascination consists in its affinity with mind, and that consequently the entire sensible universe, as a symbol of the divine reason must be beautiful to the eye that can see it in relation to its creator, all this had sunk deep into Christian sentiment ··· "

বেনিডেটো ক্রোচেও বলেছেন—মধ্যযুগে এবং রেনেসাঁসে, প্রাচীন গ্রীক-রোমের সিদ্ধান্তেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

একদিকে, সৌন্দর্য বলতে, বস্তুর আকৃতিগত সুষমা—অংশ অংশীর সুসমন্বয় বা সামঞ্জস্য ধরা হয়েছে; অন্যদিকে, সেই সুষমাকে দৈব ভাবের অভিব্যক্তি স্বরূপে—সৌন্দর্যকে দেবভাবের সাকার প্রকাশ বলে আখ্যাত করা হয়েছে। বাস্তবিক এই দৈবীভাব খুবই স্বাভাবিক।

মানুষের চৈতন্যশক্তির প্রকৃতির মধ্যেই এর সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। ইন্দ্রিয়ের কাছে বিষয় আকৃতি বা প্রত্যয় রূপেই আসে এবং আকৃতিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে; আর বুদ্ধি বিষয়কে বুঝতে চায়—মৌলিক কোনো ধারণার সঙ্গে সঙ্গত করে নিয়ে—কোনো মৌলিক সত্তার অংশ হিসাবে। এই কারণে কখনই মানুষ 'রূপ'কে নিরপেক্ষভাবে ধারণা করতে পারে নি—এখনও পারে না। রূপকে সে ভাবের (আইডিয়া) বা পরম সত্তার অভিব্যক্তি হিসাবেই দেখে আসছে। প্লেটো রূপকে দেখেছেন নিরপেক্ষ ভাবের অক্ষম অনুকরণ হিসাবে; অ্যারিস্টটল 'রূপ'কে দেখেছেন রূপেরই—বিশেষেরই—সামান্য রূপটির অধীন করে; প্লটিনাস দেখেছেন—ভাব তথা চিৎস্বরূপেরই অভিব্যক্তি হিসাবে; খ্রীষ্টপন্থীরা রূপকে দেখতে চেয়েছেন—সত্য-শিব-সুন্দর ঈশ্বর-সত্তারই অনুভা হিসাবে। তবে সকলেই দেখেছেন, রূপের অন্তর্নিহিত ভাব যাই হোক, রূপ আমাদের মনকে আকর্ষণ করে তার 'সুষমা' দিয়েই। সেণ্ট অগাস্টাইন, স্কোটাস এরিগেনা, টমাস একুইনাস প্রমুখ চিন্তাশীলদের চিন্তার মধ্যে ছোটখাট পার্থক্য থাকলেও উল্লিখিত দুই প্রবণতা সকলেরই মধ্যে বেশীকম দেখা যায়।

মধ্যযুগের শিল্পতত্ত্বচিন্তা সম্বন্ধে ক্রোচে বলেছেন—শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে মধ্যযুগে যে সূত্র বা সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার ঐতিহাসিক মূল্য যতটা আছে, ততটা তত্ত্বগত মূল্য নেই। রেনেসাঁস সম্পর্কেও তিনি ঠিক একই কথা বলেছেন। এ যুগেও প্রাচীন বৃত্তের পরিধির বাইরে চিন্তা অগ্রসর হতে পারে নি। সভ্যতা-সংস্কৃতির উন্নতি হয়েছে, মূল গ্রন্থের পঠন-পাঠন বেশী হয়েছে; বহু টীকা ভাষ্য রচিত হয়েছে—শিল্পকলা, ব্যাকরণ, অলংকার, সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থনিবন্ধ রচনা করা হয়েছে—এ সবই সত্যি, কিন্তু, ক্রোচের ভাষায় বলা যাক—"but truly original ideas do not yet show themselves in the domain of aesthetic science"। একদিকে প্লেটোর মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় যত পাকা হয়েছে তত আধ্যাত্মিক রহস্যের দিকে

ঝোঁক বেড়েছে, অন্যদিকে পিথাগোরাসপন্থী গণিতকুশলীরা এবং অ্যারিস্টটলপন্থীরা সুষ্ঠু বা সুষম অঙ্গন্যাসের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সৌন্দর্যের সূত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন। প্লেটোপন্থীদের কাছে সৌন্দর্য হল আত্মনিহিত আর অ্যারিস্টটলপন্থীদের কাছে সৌন্দর্য হল বস্তুনিহিত বিশেষ ধর্ম। *

লিওনার্দোর বন্ধু লিউকা পেকিয়োলো (Luca Paciolo) তাঁর 'দি ডিভাইনা প্রোপোরশানি' গ্রন্থে সৌন্দর্যের গাণিতিক সূত্র ('ল অফ গোলডেন সেকশান' নামে যা পরিচিত) নির্ধারণ করতে যে চেষ্টা করেন তা ঐ বস্তুনিহিত বিশেষ ধর্মটি—অংশীর সঙ্গে অংশের সংযোগের আদর্শ সম্পর্কটি—সুষমার (হারমনি) সার্বজনীন সূত্র আবিষ্কার করারই চেষ্টা। এখানে লক্ষণীয় এই যে, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণের চেষ্টা, মোটামুটি হিসাবে, দুই পথে এগিয়েছে—এক পথ প্রকাশিত বস্তুর প্রকৃতিকে, অন্য পথ প্রকাশিতের রূপ বা আকৃতিকে লক্ষ্য করে এগিয়ে গেছে। এই দুই প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব প্লেটো-অ্যারিস্টটলের যুগে বা মধ্যযুগে ও রেনেসাঁসে শেষ হয়ে যায় নি, পরবর্তী কালেও চলেছে এবং এখনও চলছে। সৌন্দর্যবাদ-অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হবে বলে এখানে উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট। এখানে এই কথাটিই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ, শিল্পের প্রেরণা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখানে যত কথা বলা হয়েছে, তারা পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি। পুরাতন কথাকেই নতুন ভাষায় সাজিয়ে গুছিয়ে বলা—পুরাতন কোনো প্রবৃত্তির উপরে বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বলা। যাকে নতুন মতবাদ বলা যায় তা এসেছে অনেক কাল পরে—অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বচিন্তার কথা বলার আগে, ভারতীয় শিল্পতত্ত্বচিন্তার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

"The platonists generally placed beauty in the soul, the Aristotelians rather in the physical qualities—ক্রোচে ১৮০ পৃষ্ঠা)।

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল থেকেই শিল্পচর্চা শুরু হয়েছে এবং শিল্পের সংজ্ঞা, স্বরূপ, উৎকর্ষ, অপকর্ষ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। চিত্রকলা, মূর্তিকলা, কাব্যকলা, সংগীতকলা প্রভৃতি চারুকলা সম্বন্ধে বহু সূত্র ও আলোচনাগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাদের বিস্তারিত ইতিহাস লেখার অবকাশ এখানে নেই। এখানে শুধু এই কথাটাই বিশেষ করে বলতে চাই যে তত্ত্বচিন্তায় ভারতীয়রা কম আগ্রহ ও সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দেননি। শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ করবার জন্য তাঁরা যে চেষ্টা করেছেন, সেই চেষ্টার সঙ্গে ইউরোপীয় চিন্তাশীলদের চেষ্টার যথেষ্ট ঐক্যও রয়েছে। প্রথম যুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্য পাশাপাশি রেখে দেখলে দেখা যাবে—প্রাচীন যুগে যেমন গ্রীসে তেমনি ভারতেও শিল্পকে 'অনুকৃতি' বলে মনে করা হয়েছে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করলে, এমন অনেক উক্তি পাওয়া যাবে যা থেকে স্পষ্টতই এ কথা বুঝা যাবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে শিল্পের বিশেষ লক্ষণ ধরা হয়েছে—'অনুকৃতি'। বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে, চিত্রসূত্রে যেমন লেখা আছে—"যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা", তেমনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রেও নাট্যশিল্পকে 'লোকবৃত্তানুকরণম্' বলা হয়েছে।

কিন্তু অনুকৃতি কথাটি কি গ্রীসে, কি ভারতবর্ষে কোথাও সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। অনুকৃতি বলতে যে ধ্যানের রূপটি প্রকাশ করাই বুঝায়—এই কথাটাই তাঁরা বুঝাতে চেয়েছিলেন। শিল্পনির্মাণ ব্যাপারটি আসলে যে রূপকল্পনাই—এ সংস্কার সকলেরই বেশী-কম ছিল। এ সম্পর্কে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা' গ্রন্থে যে মন্তব্য করেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"আমাদের সাহিত্যে একদিকে যেমন প্রকৃতি হইতে সৌন্দর্য আহরণ করিতে একত্র সন্নিবেশ দ্বারা সুন্দর মূর্তি পরিকল্পনার কথা আছে, অপর দিকে তেমনি অন্তরের ধ্যানপরিকল্পিত রূপকে বাহিরের মূর্তি প্রদান করিলে যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য উৎপন্ন করা যায়, তাহার কথাও উল্লিখিত আছে।"—(৩ পৃঃ)॥ . . . "গ্রীক শিল্পে

ভাস্করের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এই যে তিনি কেমন করিয়া কঠিন পাথরকে কাটিয়া কাটিয়া একটি মানুষের হুবহু সাদৃশ্য তাহার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবেন। কিন্তু ভারতীয় ভাস্করের প্রধান দৃষ্টি ছিল এইখানে যে তিনি কেমন করিয়া একটি ধ্যানগৃহীত জীবন্ত ভাবকে রূপ দিবেন—জীবনের পরিস্পন্দে জড় প্রস্তরকে স্পন্দময় করিবেন, ভাবের বিক্রুতিতে মূর্তিটিকে প্রাণময় করিবেন।"—(১১-১২)॥. . .
"এই ভাবপরিস্ফূর্তি বা expression হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মূর্তি গড়িবার একটি অত্যাবশ্যক মূল কথা"—(২ পৃঃ)॥ . . .

"ভারতীয় চিত্রে কেবলমাত্র শরীরসংস্থানের যথাযথ অনুকরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই, শরীর সন্নিবেশের দ্বারা বস্তুটিকে চিনিতে পারিলেই যথেষ্ট, চিত্রের যথার্থ লক্ষ্য ছিল প্রাণপ্রদ ধর্মের অনুকৃতির দিকে।"—(২১ পৃঃ)॥ উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে এই কথাটিই বিশেষ ভাবে জানা যাচ্ছে যে ভারতীয় শিল্পদার্শনিকরা 'অনুকৃতি' শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ যান্ত্রিক অনুকরণ বলতে যা বুঝায় সেই অর্থে ব্যবহার করেন নি, অনুকরণ বলতে তাঁরা ধ্যানধৃত রূপেরই প্রকাশ বুঝাতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থেই আচার্য দাশগুপ্ত মহাশয় ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবার প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং অভিনব একটি তথ্য আমাদের জানিয়েছেন। এই তথ্যটি, আচার্যের নিজেরই ভাষায়, "অতিবিস্ময়জনক"। বুদ্ধঘোষের ধম্মসঙ্গনীর অট্ঠশালিনী টীকায় চিত্রীর চিত্রকল্পনা সম্বন্ধে যে কথা লেখা রয়েছে—তাতে "কেবলমাত্র কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ক্রোচের Aesthetic-এর মূল তত্ত্বটি ক্রোচে অপেক্ষাও সুস্পষ্টভাবে বুদ্ধঘোষ বর্ণনা করিয়াছেন"। যথাস্থানে এর বিশেষ পরিচয় দেওয়া যাবে, এখানে শুধু এই কথাটুকুই বলে রাখতে চাই যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় শিল্পদার্শনিকরা শিল্পরহস্যের ভিতরে প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছেন এবং ইউরোপে শিল্পতত্ত্বের ক্ষেত্রে যত প্রবণতা দেখা দিয়েছে তাঁদের চিন্তাতেও ঐ সমস্ত প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। শিল্পসৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রত্যেক দেশেরই মানুষের মধ্যে প্রথম এই চিন্তা

জেগেছে যে শিল্প আসলে জাগতিক কোনো বিশেষ বস্তুরই অনুরূপ রূপ—জাগতিক অভিজ্ঞতার অনুকৃতি।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে জেগেছে যে শিল্প রূপরচনা হলেও, রচিত রূপমাত্রই শিল্প নয়, শিল্পের যে রূপ তা আসলে ভাবেরই রূপ। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে শিল্পসৃষ্টি রূপরচনা বটে, কিন্তু মূলত শিল্প বিশেষ বিশেষ ভাবেরই রূপ। কাব্যশিল্পের দিকে চেয়ে এ সিদ্ধান্ত করার ঝোঁক আসতেই পারে। আমরা দেখি, ভরত নাট্যকে 'লোকবৃত্তানুকরণ' বললেও, তিনিই প্রথম রসনিষ্পত্তিকেই দৃশ্যকাব্যের তথা কাব্যের বিলক্ষণ লক্ষণ বলে মনে করেছেন; তাঁরই নাট্যশাস্ত্রে—"বিভাবানুভাবব্যভিচার-সংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তি" সূত্রে রসবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমস্ত পারিভাষিক জটিলতা সরিয়ে রেখে রসবাদের তাৎপর্য নির্দেশ করতে গেলে এই কথাই বলতে হবে যে, রসবাদী বলতে চান—শিল্পে বৈশেষিক লক্ষণ হচ্ছে রসরূপ অর্থাৎ ভাবের সমর্থ বা আস্বাদন-যোগ্য রূপ। ইংরেজীতে—expression of feeling, concretization of feeling, objectification of emotion বলতে যা বুঝায়, রসবাদের বক্তব্যও অনেকটা তাই। উভয়েরই বিশেষ বক্তব্য এই যে—শিল্প আসলে ভাবেরই রূপ।

কিন্তু ভারতে ভরতই একমাত্র শিল্পবিদ্ নন। কাব্যশিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে বহু শাস্ত্রী বহু শাস্ত্র রচনা করেছেন। ভরতের সময় থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, সংস্কৃত সাহিত্যে বহু শিল্পশাস্ত্র রচিত হয়েছে এবং প্রত্যেক শাস্ত্রবিদ্ই স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

ভরতকে ভিত্তি করে সাহিত্যশাস্ত্রে একদিকে যেমন রসবাদের সৌধ গড়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি অলংকার, রীতি, বক্রোক্তি, ধ্বনি এবং রম্যার্থকে ভিত্তি করে নতুন নতুন মতবাদ গড়ে উঠেছে। পঞ্চম শতাব্দীর ভামহ-কৃত "কাব্যালংকার", ভামহ-পরবর্তী দণ্ডীর "কাব্যাদর্শ", অষ্টম শতাব্দীর বামন-কৃত "কাব্যালংকার-সূত্রবৃত্তি," সমসাময়িক উদ্ভটের "কাব্যালংকার সংগ্রহ" নবম শতাব্দীর "ধ্বন্যালোক",

একাদশ শতাব্দীর মম্মটভট্ট-কৃত "কাব্যপ্রকাশ', ঐ শতাব্দীরই ভোজরাজ-কৃত "সরস্বতীকণ্ঠাভরণ" এবং ক্ষেমেন্দ্র-কৃত "কবি-কণ্ঠাভরণ," দ্বাদশ শতাব্দীর রুচক-রচিত "অলংকারসর্বস্ব", হেমচন্দ্রের "কাব্যানুশাসন", চতুর্দশ শতাব্দীর বিশ্বনাথ-কৃত "সাহিত্যদর্পণ", সপ্তদশ শতাব্দীর জগন্নাথ-কৃত "রসগঙ্গাধর", ঊনবিংশ শতাব্দীর চন্দ্রকান্ত তর্কালংকারের "অলংকারসূত্র'—কাব্যতত্ত্ব আলোচনার এক বিরাট শোভাযাত্রা। যদিও এই সব মতবাদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করার অবকাশ এখানে নেই, তবু সংক্ষেপে এদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করলে মোটামুটি একটা পরিচয় পাওয়া যাবে। পারিভাষিক জটিলতা বাদ দিয়ে, শুধু শিল্পতত্ত্বের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, রসবাদ ঝোঁক দিয়েছে ভাবের উপরে—প্রকাশ্য বিষয়ের বিশেষত্বের উপরে; অর্থাৎ রসবাদী বলতে চান—শিল্পের শিল্পত্ব নির্ভর করে সামাজিকের মনে 'ভাব' সঞ্চার করার—রসনিষ্পত্তির ক্ষমতার উপরে। অন্যপক্ষে, অলংকারবাদ, রীতিবাদ, বক্রোক্তিবাদ এবং ধ্বনিবাদ, প্রকাশ্য বিষয়ের বিশেষত্বের উপরে ঝোঁক না দিয়ে, ঝোঁক দিয়েছে—প্রকাশ-ভঙ্গিমার উপরে—প্রকাশ-মাধ্যমের প্রয়োগ-কৌশলের উপরে। "কাব্যং গ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ" অথবা 'রীতির্নামেয়মাত্মা কাব্যস্য" অথবা "বক্রোক্তি কাব্যজীবিতম", অথবা "ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য" যে বিষয়-বৈশিষ্ট্যের চেয়ে প্রকাশভঙ্গিমার উপরেই বেশি ঝোঁক দিয়েছে, এ কথা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তবে ধ্বনিবাদ যে রসবাদ ও রীতিবাদের (অলংকারবাদ, বক্রোক্তিবাদ-সহ) সমন্বয়ের চেষ্টা করেছে, ধ্বনির প্রকারভেদ লক্ষ্য করলেই তা বুঝা যায়। রসবাদের অব্যাপ্তিস্থলগুলি ধ্বনিবাদ আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করেছে—বস্তুধ্বনি ও অলংকারধ্বনির কল্পনাই তার স্পষ্ট প্রমাণ। ধ্বনিবাদের মুখ্য বক্তব্য এই যে শব্দাদি সংকেত দ্বারা বস্তুরূপ, অলংকার বা বাক্-চমৎকার এবং রস ধ্বনিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। কবিকর্ম শুধু রসসৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তু ও অলংকার ধ্বননেও পরিব্যাপ্ত।

অর্থাৎ কবি বা বাক্‌শিল্পী ভাষা দিয়ে রূপকে বা ভাবকেই ব্যক্ত করেন বটে কিন্তু আসলে শিল্পীর শিল্পিত্ব নিহিত থাকে মাধ্যমের (মিডিয়াম) চমৎকারজনক প্রয়োগে—ধ্বনিসৃষ্টির ক্ষমতায়। শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সৃজনক্রিয়া হিসাবে, তা ধ্বনির প্রয়োগ-নৈপুণ্য এবং বিষয় হিসাবে—রূপ ও ভাব। রম্যার্থবাদ আরো ব্যাপকভাবে কাব্যের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছে, ভাববাদের বা প্রকাশবাদের ঊর্ধ্বে আনন্দবাদকে স্থাপন করতে চেয়েছে।

"রমণীয়ার্থপ্রতিপাদকাঃ শব্দাঃ কাব্যম্"—বলে জগন্নাথ 'রমণীয়তা'কেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন এবং 'রমণীয়তা'র সংজ্ঞা দিতে যা লিখেছেন তাতে শিল্পের সংজ্ঞা আনন্দজনক প্রকাশ মাত্রেই পরিব্যাপ্ত হয়েছে। "রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনক জ্ঞানগোচরতা" কথাটি প্রণিধানযোগ্য। শিল্প স্বরূপে জ্ঞানগোচর অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় এবং ব্যবহারে অর্থাৎ সহৃদয়হৃদয়-সংবাদে—আহ্লাদজনক। শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য—রমণীয় অর্থ প্রতিপাদন করা।

আমরা দেখলাম খ্রীষ্টজন্মের আগেই ভারতবর্ষে শিল্পতত্ত্বজিজ্ঞাসা জেগেছে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য-শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে—শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণে আজ পর্যন্ত যে যে বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে, সেই সব প্রবণতা এখানেও রয়েছে। প্রকাশরীতিকে বৈশেষিক লক্ষণ করে শিল্পের সংজ্ঞা তৈরি করা হবে, অথবা প্রকাশ্য বিষয়কে (রূপ বা ভাব বা আনন্দ) ভিত্তি করে সংজ্ঞা তৈরি করা হবে—এ সমস্যা যেমন আজকের আলোচনায় তেমনি সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রীদের আলোচনাতেও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এ প্রসঙ্গের আলোচনা এখানেই শেষ করা যাক। শিল্পের সংজ্ঞা বিচার করবার সময় এই সব মতবাদের মূল্য বিচার করতে চেষ্টা করব। আবার ইউরোপীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়া যাক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বচিন্তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে প্রখ্যাতনামা শিল্প-দার্শনিক বেনিডেটো ক্রোচে দেখাতে চেয়েছেন যে

এই শতাব্দীতে কয়েকটি নতুন শব্দের অর্থ তাৎপর্য নিয়েই সমালোচকরা বেশী মাথা ঘামিয়েছেন কিন্তু শিল্পতত্ত্বের মূল কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন নি, অর্থাৎ "ইনটুইশ্যান"-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। Wit, taste, imagination, fancy, feeling প্রভৃতি শব্দের টীকা-ভাষ্য রচনা করা এবং ঐ শব্দগুলির অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপণের চেষ্টা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই করা হয় নি। প্রথমত ধরা যাক 'wit' শব্দটিকে। 'Wit' (উইট) কথাটা তখন বহুব্যবহৃত এবং 'প্রতিভা'র সমার্থক হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ উইটের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে লিখেছেন—"that part of the soul which in a certain way practises, aims and seeks to find and create the beautiful and the efficacious" (মত্তিও পেল্লেগ্রিনি—১৬৫০)। বাল্‌তাসার গ্রেসিয়ান (১৬৪২) 'উইট' ও সৃষ্টি-প্রতিভাকে সমার্থক করে তুলেছিলেন। তারপর, Taste (রুচি) কথাটা ব্যবহৃত হয়েছিল সৌন্দর্য-সমালোচনার বৃত্তি স্বরূপে। 'টেস্ট' যে মনের একটা স্বতন্ত্র বৃত্তি—এ কথাটা প্রথম স্পেনদেশীয় Gracian-এর লেখায় ব্যবহৃত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে "ইমাজিনেশান" বা "ফ্যান্সি" শব্দ দুটিও কম ব্যবহৃত হয় নি, বিশেষ করে ইতালিতে খুবই প্রচলিত হয়েছিল। 'ইমাজিনেশান' বলতে কেউ কেউ বুঝেছিলেন—অ্যারিস্টটল-কথিত "প্রোব্যাবিলিটি," কেউ কেউ বুঝেছিলেন—"an inferior apprehensive faculty"—নিম্ন শ্রেণীর এক প্রকার জ্ঞানবৃত্তি—যা চেতনায় বস্তুপ্রতীতি সৃষ্টি করে। কেউ কেউ, যেমন ইতালির জনৈক কার্ডিনাল স্‌কোরজা পল্লভিসিনো, কল্পনাকেই কাব্যের লক্ষণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কল্পনার তৃষ্ণা যে প্রত্যেক ব্যক্তির মনেই আছে এবং কাব্য যে সেই তৃষ্ণাকেই মেটায় তাঁর এই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই লক্ষণীয়। ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পল্লভিসিনো কল্পনাবৃত্তির স্বাতন্ত্র্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করেছিলেন ; এই উদ্ধৃতি থেকেই তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে—কাব্যের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে—

"to adorn our understanding with imagery, that is to say, with sumptuous, novel, marvellous and splendid appearances. And this is known to diffuse so useful an influence on mankind that humanity insists on rewarding poets with praise more glorious than is bestowed on any other men………. See how the world thirsts for beautiful first apprehensions, although these are neither laden with science, nor are they vehicles of truth—"

(History of Aesthetic by Croce).

শেষোক্ত পঙ্‌ক্তিগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কাব্যের কাজ শুধু কল্পনা-তৃষ্ণা মেটানো, জ্ঞান দেওয়া বা সত্যের প্রচার নয়। কল্পনাকে এতখানি স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়া—এতখানি প্রয়োজননিরপেক্ষ করে তোলা সূক্ষ্মদর্শী মনেরই পরিচয়। তবে গোড়ার দিকে যিনিই যত স্বাতন্ত্র্য দান করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত মূল সিদ্ধান্তে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি, সত্যের ও নীতির মুখ না চেয়ে পারেননি, এই লেখকই আবার লিখেছেন—

"And for as much as I theorized concerning poetry in the basest manner, treating it solely as a minister of that delight which the mind enjoys in the less noble operation of imagination or apprehension arising from imagination; and, therefore in consequence I somewhat relaxed the strings which bind it to the probable. I now wish to demonstrate that poetry has other functions more exalted and fruitful while remaining in strict servitude to the probable, which office is to guide our minds in the noble exercise of judgement; thus it becomes the nurse of philosophy which it nourishes with sweet milk."

["ট্রিটিজ অন্ স্টাইল"—(এস্থেটিকসের ইতিহাস—ক্রোচে)]

লক্ষণীয়, এখানে পল্লভিসিনো কল্পনাকে মনের অপেক্ষাকৃত হেয় বৃত্তি বলে মনে করেছেন এবং কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করা ছাড়াও যে কাব্যের মহত্তর উদ্দেশ্য আছে, সেই কথাই ঘোষণা করেছেন। সে যাই হোক, সব দেশেই এই সময়ে 'কল্পনা'বাদের প্রচার ঘটতে

থাকে। কাব্য যে কল্পনাবৃত্তিরই সৃষ্টি এই ধারণা অনেকের মধ্যেই বদ্ধমূল হতে থাকে। তবে কল্পনা সম্বন্ধে খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা যেমন অনেকেরই ছিল না, তেমনি সকলেই কাব্যকে কল্পনার সৃষ্টি বলে স্বীকার করেন নি। এমন একদল ছিলেন যাঁরা কাব্যকে ভাবাবেগের সৃষ্টি বলেই মনে করেছেন—মনে করেছেন, বুদ্ধি বা যুক্তিবিচার দিয়ে কাব্য রচনা করা যায় না, কাব্যের জন্ম হয় ভাবাবেশ থেকে। এই যুগের ধারণা সম্পর্কে বেনিডেটো ক্রোচে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তা উদ্ধৃত করেই আমি এ প্রসঙ্গ শেষ করছি—"In the writings of this period imagination was often identified with wit, wit with taste, taste with feeling and feeling with first apprehensions or imagination." অর্থাৎ এই যুগের লেখায় কল্পনাকে বাক্‌চাতুর্যের সঙ্গে, বাক্‌চাতুর্যকে রসরুচির সঙ্গে, রসরুচিকে আবেগের সঙ্গে এবং আবেগকে কল্পনার সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। মোট কথা ক্রোচে বলতে চেয়েছেন, এই যুগের চিন্তাশীলরা শব্দগুলির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু উপলব্ধি করতে পারেন নি ; তাঁদের কাছে শব্দগুলি ছিল "Shades, not bodies"। আগেই বলা হয়েছে—ক্রোচের কাছে শিল্পতত্ত্ব মূলত কল্পনাতত্ত্বই—কল্পনার স্বরূপ নিরূপণের সাফল্যেই শিল্পতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার পরিপূরণ। কিন্তু শিল্পতত্ত্ব যাঁদের কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব, তাঁরা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টার দিক থেকে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এই যুগের দার্শনিক চিন্তায় অতিপ্রাকৃত সত্তায় বিশ্বাস এবং আনুষঙ্গিক অনুসিদ্ধান্তে আস্থা একেবারে ছিল না এমন নয় ; তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে এই যুগে একদিকে বুদ্ধিবাদ (intellectualism) অন্যদিকে প্রত্যক্ষবাদ (empiricalism) মাথা তুলতে থাকে এবং সৌন্দর্য প্রভৃতির আলোচনা এই সব দার্শনিক প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। একদিকে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্তে (১৫৯৬-১৬৫০), স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭), লাইবনিৎস (১৬৪৬-১৭১৬) অন্য-

দিকে প্রত্যক্ষবাদী বেকন, হবস্, লক প্রমুখ। একের চেষ্টা সৌন্দর্যকে 'reason in the form of feeling'-রূপে অথবা 'a confused form of intelligence'-রূপে ব্যাখ্যা করা; অন্যের চেষ্টা সৌন্দর্যকে অনুভূতিগম্য বিশেষ রূপোপলব্ধি—রূপের আধারে ভাবের (feeling) অভিব্যক্তি—রূপে দেখা। অতিপ্রাকৃতবাদীর সঙ্গে বুদ্ধিবাদী ও প্রত্যক্ষবাদীর পার্থক্য খুব সুস্পষ্ট হয়ে না উঠলেও 'reason' অথবা feeling-কে নিরপেক্ষ সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা অবশ্যই লক্ষণীয়। তাই বলে বুদ্ধিবাদীদের সামান্যবাদী বা অতিপ্রাকৃতবাদীদের উত্তরাধিকারী এবং প্রত্যক্ষবাদীদের বিশেষবাদী বা প্রকৃতিবাদীদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করা ঠিক হবে না—বোসাঙ্কের সেই সিদ্ধান্ত এখানে স্মরণ করা যাক—

> But it would not be possible to identify the intellectualist school of thought as the heir of the former or supernatural point of view, and the sensationalist or "empirical" as the heir of the latter or merely natural point of view, . . . Thus either reason or feeling may seize upon the place of the supernatural and either of them, again may be interpreted into a purely natural system."—P. 175.

অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বের ধারণা অতীত চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারে নি। প্লেটোর ধারণা, অ্যারিস্টটলের ধারণা, প্লটিনাসের ধারণা, নতুন কল্পনাবাদের ধারণা—এমনি বিভিন্ন সংস্কার বা প্রবণতা এই সময়ের চিন্তায় লক্ষ্য করা যায়।

মোটামুটি এই সব প্রবণতা নিয়েই সপ্তদশ শতাব্দী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিবর্তিত হয়। এখানেই কল্পনাবাদ ও সৌন্দর্যবাদ বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হয় এবং শিল্পতত্ত্ব 'ঈস্থেটিক" নাম ধারণ করে। এই শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে আমি জার্মানির বোমগার্টেন ইতালির জামবাতিস্টা ভিকো এবং জার্মানির প্রখ্যাত দার্শনিক কাণ্ট ও তাঁর সহকর্মিগণের বক্তব্যের সামান্য পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

গট্লিয়েব বোমগার্টেন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক উল্‌ফের শিষ্য। ইনিই প্রথম (১৭৩৫) ঈস্থেটিক শব্দটি ব্যবহার করেন এবং ১৭৫০ "ঈস্থেটিক" নাম দিয়ে বিরাট একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বোমগার্টেনের কাছে ঈস্থেটিক হচ্ছে—science of sensory consciousness···*

অর্থাৎ ঈস্থেটিকের আলোচ্য—

ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রতীতি, কলাতত্ত্ব, অবর বা চিন্তেতর জ্ঞান, সৌন্দর্য-বোধ প্রভৃতি বিষয়। ঈস্থেটিক স্বতন্ত্র শাস্ত্র, কারণ তার আলোচ্য বিষয়ও স্বতন্ত্র। এই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়লব্ধ রূপের পরাদর্শ তথা সৌন্দর্যের স্বরূপ (pulcritudo) নিরূপণ করা। কাব্য কল্পনায়-গড়া —বিশেষের রূপ। যত বিশেষত্ব তত্ত কাব্যত্ব। ক্রোচের ভাষ্যের ভাষায় বলা যাক—

> "Poetical representations are confused or imaginative, distinctness that is intellect is not poetical. The greater the determination the greater the poetry ; individuals...are highly poetical ; poetical also are the images or phantasms as well as all that appertains to the senses."—P. 213.

এই প্রসঙ্গেই বলে রাখা যাক—বেনিডেটো ক্রোচে বোমগার্টেনকে ঈস্থটিক শাস্ত্রের জনক ব'লে মর্যাদা দিতে চান নি এবং চান নি এই কারণেই যে তিনি কল্পনা ও বুদ্ধির মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানতে পারেন নি এবং ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রতীতির সঙ্গে 'perfectio'—অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশেষণটি যোগ করলেও, (লাইবনিৎসের "claritas" —সুস্পষ্ট—স্মরণীয়) ,কল্পনার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতাধারণা করতে পারেন নি—বুদ্ধিবাদের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। ক্রোচের ধারণা—"Save in its title and its first definitions Baumgarten's Aesthetic is covered with the mould of antiquity and commonplace." (P. 218)

* (scientia cognitionis sensitivae, theoria liberalium artium, gnosiologia inferior ars pulcre cogitandi, ars analogi rationis).

তাঁর মতে 'ঈস্থেটিকের জনক জার্মান বোমগার্টেন নন, ঈস্থেটিকের জনক ইতালীয় জাম্‌বাতিস্তা ভিকো। ভিকোর মধ্যেই প্রথম বৈপ্লবিক চিন্তা দেখা যায়। ভিকোর গ্রন্থ "Scienza nuova", বোমগার্টেনের গ্রন্থের দশ বৎসর আগে, ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়—এই ঘটনাটি যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় এই যে ভিকোই প্রথম কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে নতুনভাবে চিন্তা করেন। কল্পনা যে জ্ঞানাত্মিকা ব্যাপার এবং বিশেষ একপ্রকার জ্ঞানব্যাপার—স্বাধীন স্বতন্ত্র এক আত্মিক ব্যাপার, তা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেন। কাব্য জ্ঞানাত্মিকা ব্যাপারের সৃষ্টি না ভাবাবেগের সৃষ্টি ? ইতিহাসের ও বিজ্ঞানের সঙ্গে কাব্যের পার্থক্য কোথায় ?—এই প্রশ্নগুলির (ক্রোচের মতে অমীমাংসিত) আলোচনায় ভিকো নতুন আলোকপাত করেন। যে মূলসূত্রের ভিত্তির উপরে ভিকো তাঁর চিন্তাকে দাঁড় করিয়েছেন—ক্রোচের ঈস্থেটিকের ইতিহাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তা উপস্থাপিত করা যাক—

> "Men at first feel without being aware ; next they become aware with a perturbed and agitated soul, finally they reflect with an undisturbed mind. This Aphorism is the principle of poetical sentences which are formed by *the sense of passions and affections* ; differing thereby from philosophical sentences which are formed by *reflection through ratiocination* ; whence the latter approach more nearly to truth the more they rise towards the *universal*, while the former have more of *certainty* the more they approach the *individual*. (P. 221)

এই উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় এইগুলি—

(ক) প্রথম অবস্থায় মানুষ অনুভব করে কিন্তু অনুভব সম্বন্ধে কোনো চেতনা তার থাকে না।

(খ) দ্বিতীয় অবস্থায় মানুষ অনুভব সম্বন্ধে সচেতন হয়, কিন্তু সেই চেতনার সঙ্গে আবেগ-আন্দোলন মিশে থাকে।

(গ) তৃতীয় অবস্থায় মানুষ শান্তভাবে অর্থাৎ নিরাবেগ চিত্তে ভাবনা করে।

(ঘ) কাব্যিক বাক্য গঠিত হয়—"by the sense of passions and affections"—অর্থাৎ আবেগের বৃত্তি থেকে।

(ঙ) দার্শনিক বাক্য গঠিত হয়—"by reflection through ratiocination"—অর্থাৎ সবিকল্পক চিন্তা থেকে।

(চ) দার্শনিক বাক্য তত 'সত্য'-বাদী হয় যত সে 'সামান্য'কে ব্যক্ত করে।

(ছ) কাব্যিক বাক্য তত নিশ্চিত বা বাস্তব হয় যত সে 'বিশেষ'কে ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে—চেতনার দ্বিতীয় পর্যায়ে কাব্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই পর্যায়ে চেতনা আবেগবিযুক্ত নয়—আত্মা বিচলিত ও উত্তেজিত (perturbed and agitated)। এই পর্যায় ক্রোচের মতে—"imaginative phase of consciousness"—কল্পনার স্তর। সবিকল্পক চিন্তার সঙ্গে কল্পনার মৌলিক বিরোধ রয়েছে, ভিকো তা বুঝাতে চেষ্টা করেছেন, লিখেছেন—"তত্ত্বচিন্তা ও কাব্যের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ রয়েছে। তত্ত্বচিন্তা মনকে শিশুসুলভ সংস্কার থেকে মুক্ত করে, আর কাব্য মনকে সেই সংস্কারের মধ্যে মগ্ন করে দেয়। তত্ত্বচিন্তা ইন্দ্রিয়ের ধারণার স্তর অতিক্রম করতে চায়, আর কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়কে রূপ দেওয়া। তত্ত্বচিন্তা কল্পনাকে দুর্ব্বল করে, কাব্য কল্পনাকে উদ্দীপিত করে, তত্ত্বচিন্তা চেতনাকে রূপবিমুক্ত করে গৌরব বোধ করে, কাব্য গৌরব করে চেতনাকে রূপময় করে তুলে। এই কারণেই তত্ত্বচিন্তা স্বভাবতই নৈর্ব্যক্তিক হয়। আর কাব্যের উদ্দেশ্য ততই সিদ্ধ হয় যত সে ধারণাকে রূপময় করে তুলতে পারে। মোট কথা, তত্ত্বচিন্তা চেষ্টা করে পণ্ডিতদের মধ্যে আবেগ সম্পর্কশূন্য সত্য জ্ঞান উদ্‌বোধিত করতে আর কাব্য চেষ্টা করে অশিষ্টদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে সৎকাজে প্ররোচিত করতে"......"কবিরা হচ্ছেন মানব-

সমাজের ইন্দ্রিয় আর দার্শনিকরা হচ্ছেন মস্তিষ্ক।" (ক্রোচের ঈস্থেটিক গ্রন্থে উদ্ধৃত অংশের অনুবাদ।)

যে পরিমাণে বিচারবুদ্ধি দুর্বল হয় সেই অনুপাতেই কল্পনা প্রবলতর হয়ে থাকে। চিন্তাকে ছন্দোবন্ধে প্রকাশ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু তা করলে 'কাব্য' রচনা করা যায় না। তত্ত্বকথা ছন্দে লেখা হলেও তত্ত্বই থাকে। যে সব কবি নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্য সম্বন্ধে মননাত্মক শ্লোক রচনা করেন তাঁরা হচ্ছেন আসলে দার্শনিক—তাঁরা ছন্দোবদ্ধ ভাষাতে বা ছড়ায় যুক্তিবিন্যাস করেন।

ক্রোচে বলেছেন, ভিকো কলার ও বিজ্ঞানের পার্থক্য—কল্পনার ও মননের পার্থক্য—বিষয়ে খুব স্পষ্ট ধারণা পোষণ করতেন। কাব্য এবং ইতিহাসের পার্থক্য সম্বন্ধেও ভিকো যে চিন্তা করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। অ্যারিস্টটল এ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন তার সঙ্গে ভিকোর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মেলে না। ইতিহাসের চেয়ে কাব্য অধিকতর দার্শনিকতাময় বটে, কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে ইতিহাসের প্রকাশ্য বিষয় 'বিশেষ', আর কাব্যের বিষয় 'সামান্য'। কাব্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সাধর্ম রয়েছে তা রয়েছে এখানেই যে উভয়েই আদর্শায়িত (Ideal),—উভয়েই 'সামান্য'কে ভাবনা করে, অতএব কাব্য ও বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য মূলত এক—এ কথা সত্য নয়। সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য হবে 'সম্পূর্ণ আদর্শায়িত' (wholly ideal); আদর্শের দ্বারাই কবি অবাস্তব বস্তুকে 'সত্য' করে তথা চিরন্তন এবং সার্বজনীন করে তোলেন।

ভিকোর মতে ইতিহাস ও কাব্য মূলত একই। প্রথম কবিই ছিলেন প্রথম ঐতিহাসিক—তাঁর কাব্যের কাহিনী ছিল বাস্তব ঘটনারই বিবরণ; হোমার যেমন ছিলেন একাধারে কবি ও ঐতিহাসিক। কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং ঐতিহাসিক সকলেই সত্যকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছেন। কাব্য দেয় কল্পনাময় চিত্র, বিজ্ঞান ও দর্শন দেয় বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্য এবং ইতিহাস দেয় 'নিশ্চয়'-চেতনা (consciousness of certitude)।

ক্রোচে আক্ষেপ করে বলেছেন—যিনি 'ঈস্থেটিক' শাস্ত্রের প্রকৃত জনক তাঁকে লোকে বিশেষ করে 'ইতিহাস-দর্শনের' প্রবর্তক বলেই জানে এবং যতখানি মর্যাদা বা গুরুত্ব ভিকোর প্রাপ্য তা তাঁকে দেওয়া হয় নি। তাই বলে ভিকো যে সমালোচনার উর্ধ্বে তা নয়। ক্রোচে দেখিয়েছেন—ভিকো মূলসূত্র আঁকড়ে থাকতে পারেন নি, মাঝে মাঝে ভুল করে বসেছেন। 'কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য অজ্ঞদের সদাচার করতে শিক্ষা দেওয়া', বা 'সহজবোধ্য গল্পের ভিতর দিয়ে প্রবল আবেগ উদ্রেক করা'—এ সব সিদ্ধান্ত ভিকোর মূলসূত্রের সঙ্গে নিশ্চয়ই খাপ খায় না। সুনীতিবাদী ও আবেগবাদীদের কক্ষে প্রবেশ করা আর মূলসূত্র অর্থাৎ কল্পনাবাদ থেকে দূরে সরে যাওয়া—একই কথা।

তারপর ভিকো 'কল্পনা-সামান্য'কে (imaginative universals) অসম্পূর্ণ 'সামান্য' বলেই গণ্য করেছেন অর্থাৎ নিরপেক্ষ সম্পূর্ণতার মর্যাদা দেন নি। তৃতীয়ত, পারিভাষিক শব্দগুলিকে একই অর্থে সব সময় প্রয়োগ করেন নি। যেমন sensation, memory, imagination, wit প্রভৃতি শব্দ সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেন নি। 'Sensation'-কে কখনও আত্মিক ক্রিয়ার বাইরের ব্যাপার, কখনও ভিতরকার ব্যাপার বলে গণ্য করেছেন। কবিদের কখনও মানবসমাজের কল্পনাবৃত্তি, কখনও 'ইন্দ্রিয়' (sensation) বলেছেন কল্পনাকে বলেছেন বিগলিত স্মৃতি 'dilated memory'। সে যাই হোক, ক্রোচের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্ব-চিন্তায় ভিকোর দান অসামান্য; এমন কি সুবিখ্যাত কান্টের চিন্তার চেয়েও অধিকতর পরিপাটি—

> "Kant was at once unlike and less successful than Vico in that he was unable to attain a doctrine substantially true, and unable also to give his thoughts the necessary system and unity."
>
> (Aesthetic—P. 273)

তবে এটুকু স্বীকার করেছেন ভিকোর পরে একমাত্র কান্টেরই ছিল—

'real speculative genius'—যদিও কাণ্টের আগে ইতালিতে, জার্মানিতে, ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে শিল্পতত্ত্ব নিয়ে অনেকেই চিন্তা করেছিলেন। এই সব চিন্তাশীলদের মধ্যে ইতালির এ. কোন্টি, এম. সিসারোত্তি (Cesarotti), বেত্তিনেল্লি ও পেগানো জি. স্প্যালেট্টি প্রভৃতি জার্মানির বোমগার্টেন-শিষ্য জি. এফ. মেইয়ের এম. মেণ্ডেলসোন্, বাইডেল, ফেবার, স্থুৎজ, শুবার্ট, বেস্তেনরাইডের, শেরডাহেল, কোনিগ্, গ্যাংগ, মেইনাস, স্বট্, এবারহার্ড, জে. জি. স্থলজের (স্থইস), কার্ল হেইনরিক্ হেডেন রেইক, জে. জি হার্ডার, গটশেড, বিনকেলম্যান মেংগস্, নোসঙ হার্ট, মেযার, গেটে প্রমুখ; ফ্রান্সের এব্বি বাতু (Abbi Battu), ইংলণ্ডের হোগার্থ, বার্ক, লর্ড কেইম্‌স্, রেনল্ডস্ হেনরি হোম্‌স প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত চিন্তাশীলদের সংখ্যা মোট সংখ্যাব অংশমাত্র এবং সকলের সবরকম চিন্তার পবিচয় শিল্পতত্ত্বের বিস্তারিত ইতিহাসেও সবটুকু পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে এ কথাও আর একবার স্মরণ করা দরকার ক্রোচে যেমন শিল্পতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে কল্পনার স্বরূপ নিরূপণ ব্যাপারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছেন, বোসাঙ্কে প্রমুখ তত্ত্বচিন্তা-বিচারকরা তেমনি শিল্পতত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ধারণে পর্যবসিত করেছেন। ক্রোচে খুঁজে খুজে দেখেছেন কে কোথায় শিল্পকে কল্পনার সৃষ্টি বলেছেন, কল্পনাকে বুদ্ধিনিবপেক্ষ স্বতন্ত্র জ্ঞানবৃত্তি বলে স্বীকার করেছেন, ইন্দ্রিয়োপলব্ধি এবং বুদ্ধিবিচার থেকে কল্পনাকে পৃথক করে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানব্যাপার বলে মর্যাদা দিয়েছেন। চিন্তাশীলদের মধ্যে যিনি যে পরিমাণে কল্পনার এই স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এবং উপলব্ধি করে মূলসূত্র অনুসারে সব প্রশ্নের সঙ্গত সমাধান করেছেন, ক্রোচের মতে, তিনি সেই পরিমাণে শিল্পতত্ত্ব দর্শনে কৃতী হয়েছেন। কল্পনাতত্ত্ব থেকে যিনি যতদূরে রয়েছেন তিনি তত অকৃতী। অন্যপক্ষে যাঁরা সৌন্দর্যবাদী তাঁরা খুঁজে খুঁজে দেখেছেন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা কে কি দিয়েছেন এবং সেই

সংজ্ঞাকে শিল্পের জগতে কি ভাবে কাজে লাগিয়েছেন। অবশ্য সৌন্দর্যবাদী কখনও ভাববাদের দিকে কখনও বা রসবাদের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন। অর্থাৎ সৌন্দর্যকে কখনও ভাব বা 'আইডিয়া'—সাপেক্ষ, কখনও আবেগ-সাপেক্ষ করে দেখেছেন।

টলস্টয় তার 'শিল্পের স্বরূপ কি' (What is Art ?)-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্বপক্ষ হিসাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং উনবিংশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য শিল্পতত্ত্বদর্শীদের যে সব মত সংগ্রহ করেছেন, তা লক্ষ্য করলেই শিল্পতত্ত্বের মোটামুটি ইতিহাস জানা যাবে। আমরা দেখি, বোমগার্টেনকেই (১৬১৪-১৭৬২) টলস্টয় ঈস্থেটিকসের প্রতিষ্ঠাতা বলে স্বীকার করেছেন। বোমগার্টেনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখেছেন—নৈয়ায়িক জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে সত্য, 'শৈল্পিক বা প্রাত্যক্ষিক' জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে 'সৌন্দর্য'। সৌন্দর্য হচ্ছে পরমসত্তার পূর্ণতারই অসীম প্রকাশ—প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। সত্য হচ্ছে বুদ্ধির-সাহায্যে-পাওয়া পরমসত্তা বা পূর্ণতা, মঙ্গল হচ্ছে নৈতিক ইচ্ছার দ্বারা পরমকে উপলব্ধি করা, সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়া এবং বাসনা উদ্রিক্ত করা। (কান্টের সিদ্ধান্ত থেকে এ সিদ্ধান্ত ভিন্ন।) যেহেতু প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের চরম বিকাশ, শিল্পেরও চরম উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে অনুকরণ করা। বোমগার্টেনের অনুগামীদের মধ্যে, Maier, Eschenburg, Eberhard প্রভৃতি সুন্দর এবং আনন্দকরের মধ্যে পার্থক্য কল্পনা করলেও, উল্লেখযোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত কেউ করেন নি। বোমগার্টেনের পরে পৃথক ধারণা পাওয়া যায় সুলজের (১৭২০-১৭৭৭), মেণ্ডেলশোন্ (১৭২৯-১৭৮৬) এবং মোরিৎসের সিদ্ধান্তের মধ্যে। সুন্দর এদের কাছে শিব-সাপেক্ষ। সুন্দর হচ্ছে তাই যা শিব-চেতনা অর্থাৎ মঙ্গলাবেগকে জাগিয়ে দেয়—বাড়িয়ে দেয়। মেণ্ডেলশোনও মনে করেন শিল্পের উদ্দেশ্য নৈতিক পূর্ণতা সৃষ্টি করা, সুন্দরের তথা সত্যের ও শিবের ধ্যান করা। এই দলের যাঁরা, তাঁরা মনে করেন—সুন্দর দেহে সুন্দর আত্মার অভিব্যক্তিতেই আদর্শ সুন্দরের

প্রতিষ্ঠা। বোমগার্টেনের কাছে—সত্য-শিব-সুন্দর ছিল পরমসত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এদের কাছে সত্য-শিব-সুন্দর একাকার। কিন্তু পরবর্তী দার্শনিকরা এ মত মানেন নি।

বিন্‌কেলম্যান (Winckelmann—১৭১৭-১৭৬৭)। সত্য ও শিব থেকে সুন্দরকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছেন। তাঁর মতে শিল্পের একমাত্র কাজ সৌন্দর্য স্বষ্টি করা এবং এই সৌন্দর্য তিন প্রকার—(ক) গঠনের সৌন্দর্য, (খ) ভাবের সৌন্দর্য, (গ) প্রকাশের সৌন্দর্য (তৃতীয়টি গঠনসৌন্দর্য ও ভাবসৌন্দর্যের উপরে নির্ভর করে)। শিল্পের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে—'প্রকাশের সৌন্দর্য' (beauty of expression)। লেসিঙ, হার্ডার এবং গ্যেটেও অনেকটা এই ধারণাই পোষণ করতেন।

ইংলণ্ডের শ্যাপ্‌টস্‌বেরির (১৬৭০-১৭১৩) মতে যা সুসমঞ্জস ও সুষমাময় তাই সুন্দর, যা সুসমঞ্জস ও সুষমাময় তাই সত্য এবং যা যুগপৎ সুন্দর ও সত্য তা অবশ্যই মঙ্গলময়। ঈশ্বরই পরম সুন্দর এবং ঈশ্বরই পরম মঙ্গলময়।

হাচিসনের (১৬৯৪-১৭৪৭) মতে—শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য স্বষ্টি করা। সৌন্দর্য-স্বষ্টি বলতে, সমতা ও বিচিত্রতার বোধ উদ্রেক করা বুঝায়। শিল্প-বোধ বিশেষ একটি অন্তরেন্দ্রিয় (internal sense) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নৈতিক চেতনার সঙ্গে ঐ ইন্দ্রিয়ের বা বোধের বিরোধ থাকতেও পারে। অর্থাৎ সুন্দর হলেই যে মঙ্গলময় হবে এমন কোনো কথা নেই।

লর্ড কেইম্‌সের (১৬৯৬-১৭৮২) মতে—যা প্রেয় বা আনন্দজনক তাই সুন্দর। সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় একমাত্র 'রুচি'র (taste) দ্বারাই।

বার্কের (১৭২৯-১৭৯৭) মতে—সুন্দর এবং মহীয়ানকে রূপ দেওয়াই শিল্পের লক্ষ্য। আত্মরক্ষাপ্রবৃত্তির এবং সমাজের প্রেরণার মধ্যেই সৌন্দর্যচেতনা ও মহত্ত্ববোধ নিহিত থাকে। এই বৃত্তি দুটির উৎস খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, ব্যক্তির সাহায্যে জাতি রক্ষা

করার উপায় হিসাবেই তারা এসেছে। আত্মরক্ষার জন্য চাই দেহকোষের পরিপোষণ, বিপত্তি থেকে রক্ষা এবং যুদ্ধ, আর সমাজের জন্য চাই পারস্পারিক আদান প্রদান এবং আত্মপ্রজনন। আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের উৎস থেকে এসেছে মহত্ত্ব চেতনা এবং সহযোগিতা ও আত্মপ্রজননবৃত্তি থেকে জন্ম নিয়েছে সৌন্দর্যবোধ।

ফ্রান্সের—পিযেরি আন্দ্রে (Pe´re Andre´) এবং বাত্তু (Batteaux) এবং তদনুগামী দিদেরো, এলামবার্ট, ভলতেয়ার প্রভৃতি। পিযেরি আন্দ্রের (১৭৪১) মতে সৌন্দর্য তিনপ্রকার—(ক) দিব্য, (খ) প্রাকৃতিক, (গ) কল্পিত বা কৃত্রিম। বাত্তুর মতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে অনুকরণ করাই শিল্পের লক্ষ্য এবং শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। দিদেরোর অভিমতও অনুরূপ। ইংরেজদের মতো ফরাসী তত্ত্ববিদরাও সৌন্দর্যকে রুচিসাপেক্ষ বলে মনে করেছেন। এই রুচি বা রসবোধ নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত নয়। এলামবার্ট এবং ভলতেযারও এই মত পোষণ করেছেন।

ইতালির পেগানোর মতে শিল্পরচনা আসলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সৌন্দর্যকে একত্র করার চেষ্টা। রসরুচির সামর্থ্য থাকলেই তা করা সম্ভব এবং সুষম একটি সমগ্র রূপ তৈরি করতে পারার নামই শিল্পিপ্রতিভা। সুন্দর ও শিব ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। মঙ্গলের ব্যক্ত রূপই সৌন্দর্য এবং মঙ্গল হচ্ছে অন্তরতর সৌন্দর্য। মুরাতোরি (১৬৭২-১৭৫০) এবং স্প্যালেত্তি (১৭৬৫) বলেছেন—শিল্প হচ্ছে আত্মরক্ষা মূলক এবং সমাজরক্ষামূলক অহমিকারই অভিব্যক্তি (egotistical sensation)। ডাচ লেখকদের মধ্যে, হেমস্টেরহুই (Hemsterhuis—১৭২০ ১৭৯০) উল্লেখযোগ্য। জার্মানির শিল্প-তত্ত্ববিদদের উপরে, বিশেষ করে গোটের উপরে তাঁর প্রভাব লক্ষণীয়। তার মতে—যা যত বেশি আনন্দ দেয় তা তত বেশি সুন্দর এবং বেশি আনন্দ দেয় তাই যা অতি স্বল্পকালের মধ্যে বেশি সংখ্যক প্রতীতি (perceptions) জাগাতে পারে। এই কারণেই সৌন্দর্যসম্ভোগে মানুষের জ্ঞানবৃত্তি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত হয়।

এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) দানের কথা স্মরণ করা যাক। কাণ্টের চিন্তা, টলস্টয়ের মতে—"new aesthetic theory" এবং "which more than all others clears up what this conception of beauty and consequently of art really amounts to." অর্থাৎ অভিনব চিন্তা এবং সৌন্দর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা এত স্পষ্ট করে কাণ্টের আগে কেউ করেন নি। বোসাঙ্কের মতেও কাণ্টে এসেই "The problem brought to a focus"—সৌন্দর্যের স্বরূপের লক্ষ্য ভেদ করা হয়েছে। কিন্তু বেনিডেট্টো ক্রোচে এই সব সমালোচকদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। জার্মান দৃষ্টিকোণ থেকে যে সব শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস লেখা হয়েছে তাদের কটাক্ষ করে ক্রোচে লিখেছেন—এ কথা সত্য বটে যে জার্মানদের মধ্যে কাণ্টের আসন খুবই উচ্চে, কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে প্রবৃত্ত হলে দেখা যাবে শিল্পতত্ত্বের ইতিহাসে কাণ্টকে যত বড় বলে জাহির করা হয়ে থাকে, কাণ্ট তত বড় নন, তিনি "less successful than Vico" এবং এমন কোনো তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি যা "substantially true" এবং তিনি "unable also to give his thoughts the necessary system and unity"। উলফ বা বোমগার্টেন যা বলেছেন, কাণ্ট তার চেয়ে বেশি কিছু বলেন নি। বিশেষ করে তাঁর গোড়ার দিকের বক্তৃতা বা লেখাগুলি—"Baumgartenism pure and simple"। 'ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট'-গ্রন্থের আলোচনাও—"Baumgartenism transposed into a higher key…"। কাণ্ট কখনও বুদ্ধিবাদের বন্ধন (intellectualistic bond) কাটাতে পারেন নি এবং কল্পনার স্বরূপ ধরতে পারেন নি—

> "A profund concept of imagination was entirely lacking to Kant's system and his philosophy of the spirit."

আত্মার তিনটি বৃত্তি তিনি স্বীকার করেছেন—(ক) জ্ঞানবৃত্তি,

(খ) বেদনাবৃত্তি বা অনুভববৃত্তি, (গ) কামনাবৃত্তি। এদের মধ্যে কল্পনার কোনো স্বতন্ত্র স্থান নেই। কল্পনার স্থান অনুভবের কক্ষে। অনুকৃতিধর্মী (reproductive) কল্পনার বা ভাবানুষঙ্গধর্মী (associative) কল্পনার ধারণার মধ্যে তার কল্পনার ধারণা সীমাবদ্ধ, সৃজনক্ষম কল্পনার (creative imagination) অর্থাৎ খাঁটি কল্পনার ধারণা তার ছিল না। বুদ্ধিনিরপেক্ষ অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া সম্বন্ধে কাণ্টের যে একেবারেই কোনো ধারণা ছিল না সে কথা অবশ্য বলা চলে না। 'ক্রিটিক অফ পিওর রিজন' এবং 'ট্র্যান্সেনডেণ্টাল ডকট্রিন অফ এলিমেণ্টস' নামক গ্রন্থে কাণ্ট এই জাতীয় আত্মিক ক্রিয়ার অস্তিত্ব নির্দেশ করেছেন। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর সন্নিকর্ষ ঘটলে বিষয়ীর মধ্যে বিষয়াকার প্রতীতির সৃষ্টি হয়। এই প্রতীতি নৈয়ায়িক চিন্তার ফল নয়—নির্বিকল্পক উপলব্ধি বিশেষ (pure intuition)। যে শাস্ত্র এই নির্বিকল্পক উপলব্ধি বিষয়ে আলোচনা করবে সেই শাস্ত্রের নাম 'ঈস্থেটিক' (die transcendentale Asthetik)। এতদূর এগিয়েও কাণ্ট কল্পনা-তত্ত্বের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেন নি, কল্পনাকে আবেগমূলক ব্যাপার করে রেখেছেন—ক্রোচের আক্ষেপ সেখানেই।

যেহেতু "he has no exact idea of the nature of the aesthetic faculty and of art", কাণ্ট নির্বিকল্পক জ্ঞানের জন্য কোনো বিজ্ঞান রচনা করতে পারেন নি। তারপর এও লক্ষণীয় যে কাণ্ট সৌন্দর্যতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্বকে এক বলে মনে করেন নি এবং তাঁর 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' রহস্যমুক্ত হতে পারে নি। অবশ্য 'সুন্দর'কে তিনি একদিকে বাসনা-কামনা থেকে, অন্যদিকে সামান্যবচন বা সংজ্ঞা (concept) থেকে পৃথক করেছেন এবং সুন্দরের জন্য একটি পৃথক এলাকা নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু, ক্রোচে বলেন—কাণ্ট যে ধরনের এলাকা সৃষ্টি করেছেন তেমন কোনো এলাকা বাস্তবে নেই—"there is no such sphere ; it does not exist." কাণ্ট যখন বলেন—

"That is beautiful which pleases without *interest*" এবং "That is beautiful which pleases without *concept*" তখন তিনি বাসনালোক এবং ভাবনালোক থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্রলোকেরই কল্পনা করেন। এই লোকের স্বরূপ কি, তা "That is beautiful which has the form of finality without representation of an end"—এই সংজ্ঞা থেকে এবং "That is beautiful which is the object of universal pleasure"—এই উক্তি থেকে মোটামুটি আঁচ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু আসল কথা এই যে এই ধরনের স্বতন্ত্রলোক কোথাও নেই।

মোট কথা, বেনিডেট্টো ক্রোচে কাণ্টের শিল্পতত্ত্ববিষয়ক চিন্তাকে অপূর্ব এবং সত্য বলে স্বীকার করেন নি এবং করেন নি একটিমাত্র কারণেই—কাণ্ট কল্পনাতত্ত্বের স্বরূপ বুঝতে পারেন নি—নির্বিকল্পক বা প্রাতিভাসিক জ্ঞানের স্বরূপ ধরতে পারেন নি। ক্রোচের হাতে নিকষপাষাণ—কল্পনাতত্ত্ব; তার সঙ্গে ঘষে ঘষেই তিনি সব মতবাদের সত্যতা পরীক্ষা করেছেন।

টলস্টয় অতিসংক্ষেপে কাণ্টের শিল্পতত্ত্ব-চিন্তার পরিচয় দিতে যে কয়টি কথা লিখেছেন তা বিবৃত করলে কাণ্টের বক্তব্য মোটামুটি পাওয়া যাবে: মানুষের বাইরে রয়েছে প্রকৃতি। এক-দিকে তার জ্ঞান, অন্যদিকে মানুষের আত্মজ্ঞান—প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নিজেকে জানার চেষ্টা। বাইরের প্রকৃতির মধ্যে সে 'সত্য'কে খুঁজছে; নিজের ভিতরে সে 'মঙ্গল'কে খুঁজছে। প্রথমটি বিশুদ্ধ বুদ্ধির (pure reason) ব্যাপার, দ্বিতীয়টি ব্যবহারিক বা নৈতিক বুদ্ধির ব্যাপার। এই বিশুদ্ধ বুদ্ধি এবং ব্যবহারিক বুদ্ধি ছাড়া আর একটি বিচারবৃত্তিও আছে। এই বৃত্তির কাজ বিনা যুক্তিতর্কে বিচার করা এবং নিষ্কাম আনন্দ দান করা। এই বৃত্তিই শিল্পচেতনার ভিত্তি। কাণ্টের মতে, বোধের দিক দিয়ে সুন্দর হচ্ছে তাই যা বিনা বিকল্পনায় এবং বিনা প্রয়োজনে আনন্দ দেয় এবং বস্তু হিসাবে সুন্দর হচ্ছে সেই বস্তু যার ঐভাবে আনন্দ

দেওয়ার মতো ক্ষমতা আছে। বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই বিশিষ্ট মনোভাবটি বা বস্তুধর্মটি। কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ না করেও যা আনন্দ দিতে পারে এবং যে আনন্দ কোনো বিচার বিকল্পনার ফল নয় তাই সুন্দর। আরো লক্ষণীয় এই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে আজ পর্যন্ত সুন্দরের এই সংজ্ঞা প্রবল প্রতিপত্তি নিয়েই চলে আসছে। পরবর্তীকালে শিলার (১৭৫৯-১৮০৫), ফিক্‌তে (১৭৬২-১৮১৪), শ্লেগেল (১৭৭২-১৮২৯), এডাম মুলার (১৭৭৯-১৮২৯), শেলিঙ (১৭৭৫-১৮৪৫), সোলজের (১৭৮০-১৮১৯), ক্রৌস (১৭৮১-১৮৩২), হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) প্রমুখ বিখ্যাত ভাববাদী দার্শনিকদের অনেকেই কাণ্টের চিন্তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেছেন। তাই বলে এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে এরা সকলেই কাণ্টের কথাগুলি নিজের ভাষায় লিখেছেন বা কাণ্টকেই হুবহু নকল করেছেন। উল্লিখিত ব্যক্তিদের অনেকেরই লেখায় নতুন নতুন কথা এবং তত্ত্ব পাওয়া যায় বটে, কিন্তু খুব একটা মৌলিক পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন, কাণ্টেরই একটি কথার ইঙ্গিত অনুধাবন করে শিলার 'শিল্পসৃষ্টি' ও 'খেলা' এই দু'টি ব্যাপারের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করেন এবং "শিল্পতত্ত্বে খেলাবাদ" নামে যে মতবাদটা প্রচলিত, সেই মতবাদটি প্রবর্তন করেন। বৃত্তির স্বাধীন ও সামঞ্জস্য-পূর্ণ অভিব্যক্তিকে কাণ্ট 'খেলা' বলে অভিহিত করেছেন। শিলার এই সূত্রকেই শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করেছেন—দেখিয়েছেন মনের দুই প্রবৃত্তির (পরিকল্পনাবুদ্ধির এবং রূপ-প্রতীতির) স্বাধীন অনুশীলনের ফলে শিল্পের জন্ম সম্ভব হয়েছে। শিল্পতত্ত্বে খেলাবাদ সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে এ বিষয়ে আরো অনেক কথা বলতে হবে। অতএব এখানে শুধু একটি কথা বলার পরে এ প্রসঙ্গের উপসংহার করছি। কথাটি ক্রোচের সমালোচনার কথা। শিলারের শিল্পতত্ত্ব-চিন্তা সম্বন্ধে ক্রোচে সংক্ষেপে মারাত্মক কয়েকটি কথা বলেছেন। ক্রোচের প্রথম এবং প্রধান কথা যা হবে তা আমরা আগেই খানিকটা অনুমান করতে পারি—শিলার "কল্পনাতত্ত্ব" সম্যক ধরতে

পারেন নি। আত্মিকক্রিয়ার ধারণা নীতিবোধ এবং তত্ত্ববোধ এই দুই বোধ ক্রিয়া ছাড়িয়ে আর এগোতে পারে নি। জ্ঞানব্যাপার—তাঁর মতে একটিমাত্র; নির্বিকল্পক জ্ঞান অর্থাৎ কল্পনার ধারণা তাঁর নেই। তাই ক্রোচের জিজ্ঞাসা—"What for him was this art he describes as an activity neither formal nor material, neither cognitive nor moral? Was it for him, as for Kant, an activity of feeling, a play of several faculties at once?" যাই হোক শিলারকে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকের উল্লেখযোগ্য শিল্প-দার্শনিক বলে গণ্য করতে পারি। ১৭৯২ থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর 'প্রথম দশক' অবধি শিলার শিল্পতত্ত্বের নানা সমস্যা নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বিখ্যাত কবি-দার্শনিক গোটের সঙ্গে ১৭৯৫ থেকে শিলারের এ বিষয়ে সমানে পত্রালাপ চলেছিল এবং সমসাময়িক চিন্তায় শিলারের চিন্তা খুবই প্রভাব বিস্তার করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক শিল্পতত্ত্ব চিন্তার ইতিহাসে বিশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই দশকেই কাণ্টের শিল্প বিচার বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ—"ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট" প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এই সময়েই শিলার, ফিকতে, গ্যেটে, শেলিঙ, হেগেল প্রমুখ বিশ্বখ্যাত চিন্তাবীরদের চিন্তার আলোক বিচ্ছুরিত হতে থাকে। এই সময়ে যেমন শিলারের মস্তিষ্কে 'খেলাবাদের' (Play Theory of Art) উৎপত্তি হয়েছিল তেমনি গ্যেটে, হার্ট এবং মেয়েরের মনে শিল্পের একটি নতুন সংজ্ঞা গড়ে উঠেছিল। অতি স্পষ্ট ভাষায় এঁরা প্রচার করেছিলেন—শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা নয়, শিল্পের উদ্দেশ্য ব্যক্তি-বিশেষত্বকে (characteristic) ব্যক্ত করা। গ্যেটে বন্ধুর কাছে লিখছেন—

> "do not let the effeminate doctrine of the modern beauty-monger make you too tender to enjoy significant roughness, lest in the end your enfeebled feeling should be able to endure nothing but unmeaning smoothness. They try

to make you believe that fine arts arose from our supposed inclination to beautify the world around us. That is not true......Art is formative long before it is beautiful (fine) and yet is then true and great art very often truer and greater than beautiful art itself."

এই মতবাদটির বিশেষ বক্তব্য এই যে মানুষের মনে প্রকাশের বা রূপ গড়ার প্রবৃত্তি প্রবল। এই প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই মানুষ রূপ গড়ে চলেছে ; সুন্দর বস্তু অসুন্দর বস্তু কোন বস্তুকেই সে বাদ দেয় না। শিল্পীর কৃতিত্ব নির্ভর করে রূপনীয় বিষয়ের বিশেষত্বকে কল্পিত রূপের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত করে তোলার উপরে।*

এই সময়েই আমরা পাই ফিক্‌তে-অনুগামী শ্লেগেল, লুডবিগ তাইয়েক-এর (Ludbig Tieck), নোভালিসের—'আয়রনি' (Irony)-বাদ। এই সময়েই একদিকে কাণ্টের সাবজেকটিভ আইডিয়ালিজম এবং অন্য দিকে শেলিঙ-হেগেল প্রমুখ দার্শনিকদের "অবজেকটিভ আইডিয়ালিজম"-এর ভূমির উপরে ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী শিল্পতত্ত্ব দর্শনের পাকা ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এই সময়েই ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পরিপোষকতায় রোমাণ্টিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। এই সময়ের ইতিহাস যুগ-সন্ধির ইতিহাস—দার্শনিক দ্বন্দ্বের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যায়ের ইতিহাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে বিশেষতঃ শেষ পাদে দার্শনিক দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থিত হয়। একদিকে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদ অন্যদিকে বিজ্ঞানবাদ, বস্তুবাদ প্রভৃতি বিপরীত মতবাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মানীতে আমরা পাচ্ছি—শেলিঙ সোলগের হেগেল, শোপেনহাওয়ের, জোহান, ফ্রেডরিক হেরবার্ট, ফ্রেডরিক শ্লেইয়েরমেকার (Schleiermacher), হুমবোল্ড্‌ট স্তেইনথাল (Steinthal) এবং আরো অনেককে। ফ্রান্সে পাচ্ছি—ভিকতর কুঁজা (Victor Cousin) জুফ্রয় (Jouffroy) প্রভৃতিকে, ইংলণ্ডে পাচ্ছি—ডুগাল্ড ষ্টিউয়ার্ট, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কার্লাইল, শেলী

* প্রাচীন অনুকরণবাদের সঙ্গে মতবাদটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

প্রভৃতিকে এবং ইতালীতে রোস্‌মিনি, জিওবেত্তি, ফ্রানসেস্‌কো দ্য স্যাঙ্কতিস্‌ প্রভৃতিকে।

শেলিঙের মতে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব একই এবং সৌন্দর্য ও বিশেষত্ব অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত। শিল্প একাধারে সৌন্দর্য ও বিশেষত্বের অভিব্যক্তি। শিল্প ও দর্শন পরাভাবেরই দ্বিবিধ প্রকাশ। দর্শন পরম সত্তাকে (Absolute) প্রকাশ করে তত্ত্বের আকারে—"আইডিয়া"র আকারে; শিল্প পরম সত্তাকে প্রকাশ করে রূপকল্পনায় (reflexion)। সৌন্দর্যের মধ্যেই সত্য-শিব অন্তর্নিহিত থাকে। সৌন্দর্যের সঙ্গে যেখানে মতের বিরোধ ঘটে সেখানে বুঝতে হবে, সত্যটি আপেক্ষিক সত্য, আংশিক ও সীমাবদ্ধ সত্য। সুন্দর "আইডিয়ার"ই তথা সত্যেরই শরীরী অভিব্যক্তি। শেলিঙের মতে —কল্পনা এমন একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি যার সঙ্গে বুদ্ধির (ইন্টেলেক্ট) এবং মানসিক উঞ্ছবৃত্তির বা উৎকল্পনার (ফ্যান্সি) কোন সম্পর্ক নেই।

"ফ্যান্সি" বলতে তিনি ধরেছেন—"which collects and arranges the product of art' এবং কল্পনা বলতে যা" "intuits them, forms them out of itself, represents them" সবিকল্পক জ্ঞানের সঙ্গে নির্বিকল্পক জ্ঞানের যে পার্থক্য, ফ্যান্সির সঙ্গে ইমাজিনেশানের সেই একই পার্থক্য। ফ্যান্সি ও ইমাজিনেশানের পার্থক্য নিয়ে সোলগেরও উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন—সমসাময়িক অনেকেরই লেখায় (ইংলণ্ডের কোলরিজ, শেলী প্রমুখ কবি-সমালোচকদের লেখাতেও) কল্পনার স্বরূপ এবং কল্পনার সঙ্গে উপকল্পনার (ফ্যান্সি) পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা পাওয়া যায়। হেগেলের ধারণাও মোটামুটি এক।*

হেগেল ভাববাদী দর্শনের (Idealism) অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর মতে এই বিশ্বজগৎ "Absolute Idea"-রই বিচিত্র বিকাশ

* তাঁর বক্তৃতাবলী, তাঁর মৃত্যুর পরে, ১৮৩৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ছাত্রদের টুকে নেওয়া নোটসের পাঠ মিলিয়ে মিলিয়ে গ্রন্থখানি সংকলিত হয়। গ্রন্থখানি হেগেলেরই বটে কিন্তু ঠিক হেগেলের হাতে লেখা নয়।

সত্য, শিব ও সুন্দর এ আইডিয়ারই বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি। 'সত্য' আইডিয়ার নৈর্ব্যক্তিক অর্থাৎ তত্ত্বরূপ এবং সুন্দর আইডিয়ার ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ—সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ।

নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে হেগেলের মূল সিদ্ধান্ত খুব স্পষ্টভাবে জানা যাবে—

"Truth is Idea as Idea according to its being-in-itself and its universal principle, and so far as it is thought as such. There is no sensible or material existence in Truth; thought contemplates therein nothing but universal Idea. But the Idea must also realize itself externally and attain an actual and deteiminate existence. Truth also as such has existence; but when in its determinate external existence it is immediately for consciousness and the concept remains immediately one with the external appearance the Idea is not only true but beautiful. In this way Beauty may be defined as the sensible appearance of the Idea—"

অর্থাৎ আইডিয়ার সামান্যরূপে এবং স্বসত্তায় অর্থাৎ চিন্তা স্বরূপে যে অভিব্যক্তি তার নাম 'সত্য'। সত্যের কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব সত্তা থাকে না। সত্যের মধ্যে সার্বজনীন "আইডিয়া"ই চিন্তিত হয়। কিন্তু 'ভাব' তো বাহ্য রূপের মধ্যে নিজেকে অভিব্যক্ত করবেই—বাস্তব সত্তা গ্রহণ করবেই, 'রূপের মাঝারে অঙ্গ' নিতে চাইবেই। এই হিসাবে সত্যেরও অস্তিত্ব রয়েছে। যখন আইডিয়া তার পরিচ্ছিন্ন জাগতিক অস্তিত্ব নিয়ে চেতনার কাছে এসে প্রত্যক্ষরূপে প্রতিভাত হয়, ভাব রূপের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে একক হয়ে উঠে, তখন ভাব আর শুধুমাত্র 'সত্য' থাকে না, 'সুন্দর' হয়ে দাঁড়ায়। এই দিক থেকে দেখলে, সুন্দরের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে—ভাবের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ। এই মূল সিদ্ধান্তের উপরে হেগেলের ঈস্থেটিক দাঁড়িয়ে আছে এবং এই সিদ্ধান্তটিকেই প্রত্যেক ভাববাদীই মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন। এই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন কল্পনা, পরিকল্পনা এবং মন্তব্যাদি করতে দেখা যায় বটে, কিন্তু এও দেখা যায়

যে বহু পায়তাড়া করার পরে সকলেই উল্লিখিত সিদ্ধান্তেই পৌঁছতে চেষ্টা করেছেন। এমন কি শোপেনহাওয়ার এবং হার্বাটের মতো বিরুদ্ধবাদীও ঘুরে ফিরে একই সিদ্ধান্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সে যাই হোক আইডিয়ার আত্মপ্রকাশের ইতিহাস এক কথায় দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের ইতিহাস, শিল্পের বিবর্তনের ইতিহাস। শিল্পের সিম্‌বলিক, ক্লাসিকাল এবং রোমান্টিক পর্যায়ের স্বরূপ ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন চারুকলার সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার প্রভৃতি বিষয়ে হেগেল যে চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন তার পরিচয় এখানে দেওয়ার অবকাশ নেই। এখানে শুধু শিল্প-দার্শনিক হেগেলের গোত্রপরিচয়টুকুই দেওয়া হয়েছে। হেগেলের ঈস্থেটিক সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে বেনিডেটো ক্রোচে লিখেছেন—শিল্প সৃষ্টি যে জ্ঞানাত্মিকা ব্যাপার এ কথাটা হেগেল পূর্বাচার্যদের অনেকেরই চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলেছেন বটে কিন্তু ধর্ম ও দর্শনের পাশে শিল্পের আসনখানি তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা—

> "The principles of Hegel's system are at bottom rationalistic and hostile to religion and hostile no less to art."

ক্রোচে স্পষ্ট করেই বলেছেন—অধ্যাত্মবাদকল্প ভাববাদ শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচার ব্যাপারটিকে এমন এক কাল্পনিক পর্যায়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল যে শিল্প একেবারেই নিরর্থক সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।*

আগেই বলা হয়েছে শোপেনহাওয়ের এবং জে. এফ. হার্বার্ট —বিশেষতঃ প্রথম জন, মুখে যতই শেলিঙ-হেগেল প্রভৃতিকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করুন, শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিচারে কাণ্ট-

---

* "Romanticism and metaphysical idealism had elevated art to such a fantastic height among the clouds that at last they were obliged to admit that it was so far away as to be absolutely useless."

হেগেলের চিন্তাপরিমণ্ডলের বাইরে যেতে পারেন নি। শোপেন-হাওয়েরর—"দি ওয়ার্লড্ এ্যাজ উইল এ্যাণ্ড আইডিয়া" গ্রন্থে প্রতিভা, শিল্পী এবং শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে সুখপাঠ্য এবং চিন্তাকর্ষক প্রচুর আলোচনা রয়েছে, কিন্তু এই সব আলোচনা আপাতদৃষ্টিতে যতই নতুন বলে মনে হোক, সিদ্ধান্তগুলি কান্ট-হেগেলের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ। শোপেনহাওয়ের যখন প্রশ্ন করেন—

> "What kind of knowledge is concerned with that which is outside and independent of all relations, that which alone is really essential to the world, the true content of its phenomena, that which is subject to no change and therefore is known with equal truth for all time, in a word the *Ideas* which are the direct and adequate objectivity of the thing-in-itself, the will?

এবং প্রশ্নের উত্তরে বলেন—

> "We answer, *Art* the work of genius. It repeats or reproduces the eternal Ideas grasped through pure contemplation, the essential and abiding in all the phenomena of the world; and according to what the material is in which it reproduces it is sculpture, painting, poetry or music. Its one source is the knowledge of Ideas, its one aim the communication of this knowledge."

তখন আমাদের এ কথা বুঝতে বেগ পেতে হয় না যে শোপেন-হাওয়ের কোন যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত করছেন না। তাঁর 'eternal ideas', 'pure contemplation', 'knowledge of ideas' এবং 'communication' নতুন কোন কথা নয়—কান্ট, শেলিঙ, হেগেলের চিন্তারই নবতর সংস্করণ। জে. এফ. হার্বার্টের মতো লোকও (রিয়েলিস্ট বলে নিজেকে যিনি জাহির করেছেন)—যিনি সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে, রেখা-বর্ণ-স্বর-ভাবনা-বাসনার সংযোগের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সৌন্দর্য নিহিত—এমন কথা বলেছেন, তিনিও শেষ পর্যন্ত অতিপ্রাকৃতপন্থী (মিষ্টিক) হয়ে পড়েছেন, কান্ট-হেগেলের চিন্তা-

পরিমণ্ডলের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনেকেরই চিন্তা (সকলের নয়) মূলত ভাববাদী বা অধ্যাত্ম-বাদী দর্শনের সংস্কার দ্বারা অনুপ্রেরিত এবং একের চেয়ে অন্যের পার্থক্য যতটা মাত্রাগত, ততটা গুণগত নয়। ভাষা, পরিভাষা ও ভঙ্গিমা বাদ দিয়ে সারাংশ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে এঁদের চিন্তার ঘাড়ে প্লেটো-এরিস্টটল-প্লটিনাস প্রভৃতি অনেকেই ভর করে আছেন। ভাববাদী এবং অধ্যাত্মবাদী চিন্তার উচ্ছ্বাসই ছিল এই সময়কার শিল্পতত্ত্বের সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস। ফ্রান্সের দিকে তাকালেই দেখা যাবে—ভিকটর কুঁজা (Victor Cousin) ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে "সত্য-শিব-সুন্দর" বিষয়ে বক্তৃতা করছেন। পুস্তকাকারে এবং ঐ নামেই প্রকাশিত গ্রন্থখানির বহুসংস্করণে প্রকাশিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। কুঁজার মতে, সুন্দরের সঙ্গে আনন্দ ও প্রয়োজনের কোন অবিচ্ছেদ্য যোগ নেই; সুন্দরের রূপ তিন প্রকার—এক দৈহিক (physical) দুই বৌদ্ধিক (intellectual) এবং তিন নৈতিক (moral)। নৈতিক সৌন্দর্যই বিশুদ্ধ সৌন্দর্য এবং এই সৌন্দর্যের ভিত্তি হচ্ছে "ঈশ্বর"। শিল্পের উদ্দেশ্য আদর্শ সৌন্দর্যকে, অসীমকে তথা ঈশ্বরকে ব্যক্ত করা।*

শিল্পীর কৃতিত্ব বা প্রতিভা প্রকাশক্ষমতায় এবং রুচি কল্পনা-ভাব ও বুদ্ধির সংমিশ্রণের ফল। কুঁজার পরে থিওডোর জুফ্রয়-(Jouffroy)ও এ সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং অনেক নতুন নতুন কথাও বলেন; কিন্তু তারা সবই, ক্রোচের মতে, "Crude and immature"। এই ধরনের অধ্যাত্মবাদী চিন্তার পাশে de Bonald, de Barante, Mme. de. Stael প্রভৃতির সমাজ-সচেতন চিন্তা ("expression of society") শুনতে নতুন বলে মনে হ'তে পারে—কিন্তু আসলে "imitation of nature"—এই সিদ্ধান্তেরই সামিল।

* রবীন্দ্রনাথদের পরিবারে এই গ্রন্থখানির সমাদর কতখানি ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ 'সত্য-শিব-সুন্দর'ই তার স্পষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের শিল্পতত্ত্ব চিন্তায় কুঁজার চিন্তার প্রভাব সংলক্ষণীয়।

এই সময়কার ইংলণ্ডের চিন্তায়—বিশেষ করে কোল্‌রিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কার্লাইল,' শেলী প্রভৃতির চিন্তায় জার্মানীর ভাববাদী দার্শনিকদের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—ক্রোচে 'মনে করেন—শেলীর "ডিফেন্স অফ পোয়েট্রি" (১৮২১)। তাতে বুদ্ধি ও কল্পনার পার্থক্য, গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য, কবির রূপস্রিত্রী প্রতিভা (faculty of objectification) প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে গভীর চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে।

কিন্তু এই শতাব্দীরই মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই, অধ্যাত্মবাদবিমুখতা বেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে, পরাতত্ত্বের রহস্যময় লোকের উপরে লোকের আস্থা টলতে সুরু করে। অবশ্যই এ কোন অকারণ ঘটনা নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের পরাভবের এবং বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত হয়ে আছে। সেই ইতিহাস বিবৃত করবার চেষ্টা না করে আমরা সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত করতে পারি—"The ground lost by idealistic metaphysic was conquered in the latter half of the nineteenth century by positivistic and evolutionary metaphysic···" (ক্রোচে) ভাববাদী পরাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ভূমিকে অধিকার করল এসে প্রত্যক্ষবাদী বিবর্তনবাদী পরাতত্ত্ব। মূল দর্শনে পরিবর্তন ঘটলে, অন্যান্য দর্শনে সেই পরিবর্তনের ধাক্কা এসে লাগবেই। সুতরাং শিল্প-দর্শনের ক্ষেত্রেও অনিবার্য পরিবর্তন দেখা দিল। ক্রমে জীব বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং সমাজবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপরে শিল্পতত্ত্বের আলোচনা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। যখন বিবর্তনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি জগতের, জীবজগতের এবং মনুষ্যজগতের সব রকম ঘটনাকে ব্যাখ্যা করবার উদ্যম অতি ব্যাপক, তখন মানুষের তৈরি-করা শিল্পের ব্যাখ্যাতেও যে একই সংস্কার কাজ করবে এ কথা বলাই বাহুল্য। অগাস্ট কোম্‌তের 'পজিটিভিজম্‌'-এর এবং ডারুইনের বিবর্তনবাদের তখন অসামান্য

প্রভাব। হার্বার্ট স্পেন্সার ছিলেন পজিটিভিজমেরই একজন প্রধান পাণ্ডা। তাঁর "প্রিনসিপল অফ সাইকোলজি" (১৮৫৫)-গ্রন্থে তিনি "শিল্পানুভূতি" (ঈস্থেটিক ফিলিঙ) সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে দেখা যায় তাঁর মতে—"aesthetic feelings arise from the overflow of exuberant energy in the organism···" এবং এই 'ফিলিঙ' নানা স্তরে বিভক্ত। সংবেদনের স্তর থেকে আরম্ভ করে বিষয়ের সরল ও যৌগিক প্রতীতির স্তর, আবেগের স্তর এবং চৈতন্যের আরো ঊর্ধ্বতন স্তর পর্যন্ত, সব কটি স্তরই এই 'ফিলিঙ'-এর উৎপত্তির মূলে একযোগে কাজ করে থাকে।*

বলা বাহুল্য, হার্বার্ট স্পেনসারের শিল্পতত্ত্ব চিন্তার মূলে জীববিজ্ঞানের সংস্কারই বেশি করে কাজ করেছে। Sully, Bain, Grant Allen প্রমুখের চিন্তাও এই একই খাতে প্রবাহিত। গ্রাণ্ট এলেন মহাশয়ের 'Physiological Aesthetics' (১৮৭৭) গ্রন্থে, শৈল্পিক আনন্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

> "The subjective concomitant of the normal sum of activity, not connected directly with the vital functions in the terminal peripheric organs of the cerebro-spinal nervous system."

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, গ্রাণ্ট এলেনও বৃত্তির ক্রিয়াকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—এক শ্রেণীতে প্রয়োজনীয় ব্যাপার (vital activities), অন্য শ্রেণীতে অপ্রয়োজনীয় বা খেলা ব্যাপার। জৈবিক ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকে বৃত্তিগুলি যখন স্বাধীন অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়, তখনকার অবস্থার নামই খেলা। এই অবস্থায় শারীর ক্রিয়া কিভাবে চলে,

* "The most perfect form of aesthetic feeling is attained by the coincidence of the three orders of pleasure—a coincidence produced by the full action of their respective faculties with the least possible subtraction due to the painful effect of excessive activity."

গ্রাণ্ট এলেন তাও নির্দেশ করেছেন। তখন ক্রিয়া চলে—"in the terminal peripheric organs of the cerebro spinal nervous system." জার্মানিতে হেলমহোৎস, ব্রুক এবং স্টাম্ফ, পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাগারে রূপের ও শব্দের আবেদন সম্বন্ধে মূল্যবান গবেষণা আরম্ভ করেন। গুস্তাফ ফেকনাবের একটি নিবন্ধ Zur Experimentella Aesthetic (1871). বিজ্ঞান গবেষকদের মধ্যে বিলক্ষণ প্রেরণা যোগায় এবং তারই ফলে, কালক্রমে গবেষণাগারে শৈল্পিক অনুভূতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে গবেষণা চলতে থাকে এবং 'পরীক্ষণ-ভিত্তিক শিল্পতত্ত্ব' (একসপেরিমেণ্টাল ঈস্থেটিক) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোট কথা এই যে এই সময়ে অধ্যাত্মবাদী ও ভাববাদী পরাদর্শন এবং অবরোহী চিন্তাপদ্ধতির স্থানে বস্তুবাদী পরাদর্শন এবং আরোহী চিন্তাপদ্ধতি এসে আধিপত্য বিস্তার করে। একদিকে কোম্‌তের পজিটিভিজ্‌ম্‌ এবং ডারুইনের বিবর্তনবাদ [অরিজিন অফ স্পিসিজ (১৮৫৯) এবং ডিসেণ্ট অফ ম্যান (১৮৭২)] অন্যদিকে পদার্থবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান এবং রসায়নশাস্ত্রের নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পের স্বরূপ নির্ধারণে চিন্তাশীলদের প্রেরণা দান করে। জীববিজ্ঞানের সংস্কার নিয়ে যাঁরা শিল্পের উৎপত্তি, স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য আলোচনা করেছেন তাঁরা পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন, আত্মরক্ষা, আত্মক্রম এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কামনার সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির কামনাকে সংযুক্ত রেখেই আলোচনা করেছেন—জীবনযাপনের তথা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল হিসাবেই সৌন্দর্যবোধের স্থান এবং শিল্প সৌন্দর্যের মূল্য নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁরা শিল্প সম্ভোগের আনন্দকে (ঈস্থেটিক প্লেজার) দৈহিক-মানসিক ক্রিয়ার বিশেষ স্ফূর্তি বা বাসনার পরিপূরণজনিত বিভিন্ন আনন্দের সংশ্লেষ হিসাবে গণ্য করেছেন। শৈল্পিক আনন্দকে এঁরা ব্যক্তিবাসনাসম্পৃক্ত বলে মনে করেন—এই হিসাবে তাঁদের 'hedonistic' বলা যেতে পারে।

শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের সংস্কার যাঁদের

মধ্যে প্রবল তাঁদের সিদ্ধান্তও জীববিজ্ঞান-নির্ভরদের সিদ্ধান্ত থেকে খুব দূরবর্তী নয়। সকলেরই মূল স্বীকৃতি এক—জগৎ বিবর্তনশীল। অজৈব জগৎ বিবর্তিত হতে হতে জৈবজগতের সৃষ্টি করেছে। জৈবজগতেও বিবর্তন ক্রিয়াশীল। পশুজগতের পরে মনুষ্যজগতের উদ্ভব ঘটেছে। জীবন মানেই অবিরাম অভিযোজন—জীবকোষের বা অহং-এর আত্মরক্ষার আত্মপ্রজননের এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা—ব্যক্তিগতভাবে এবং গোষ্ঠীগতভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা। বাসনার পরিপূরণে আনন্দ, বাসনার অপূরণে বেদনা। তাই বেদনাকে পরিহার করবার এবং আনন্দকে উপভোগ করবার স্বাভাবিক এবং ঐকান্তিক প্রবৃত্তি রয়েছে জীবনের মর্মমূলে। প্রাণের পক্ষে যা বেদনাদায়ক তা পরিহার্য, যা আনন্দদায়ক তা কাম্য—এই নীতিই প্রাণের মূলনীতি এবং এই নীতিই নিয়ন্ত্রিত করে মানুষের সমস্ত আচরণকে। পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে যেয়েই মানুষের ইন্দ্রিয় এবং মন—শারীরবিজ্ঞানের পরিভাষায়, বিশেষ বিশেষ অঙ্গ বা স্নায়ুতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত (conditioned) হয়েছে—অনুকূল বিষয়ের গ্রহণে ও ধারণে এবং প্রতিকূল বিষয়ের বর্জনে অভ্যস্ত হয়েছে ; এক কথায় আনন্দবন্ধ (pleasure principle) এবং বেদনাবন্ধের (pain principle) অধীনে বা প্রেরণায় আচরণ করতে শিখেছে। শরীর-বিজ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পতত্ত্ব, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ্য মনোভোগ্য এক কথায় রমণীয় বিষয়ের আবেদন নিয়ে গবেষণা করে রমণীয়ের বা সুন্দরের একটা সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছে।

কোন্ জাতীয় তেজনা বা সংবেদনা (sensations) সুখকর, কোন্ জাতীয় প্রতীতি (perception) আনন্দদায়ক—তা পরীক্ষাগারের পরীক্ষাধীন করাই 'একসপেরিমেণ্টাল ঈস্থেটিকসে'র উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির ঐকান্তিক রূপটিই এই সব গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে। তবে বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তির এক ধারা যেমন ঈস্থেটিকসকে পরীক্ষাগারে নিয়ে হাজির করেছে, তেমনি

আরো একাধিক ধারায় ঐ প্রবৃত্তিটি আত্মপ্রকাশ করেছে। একদিকে এই প্রবৃত্তি যেমন হিপ্পোলিতে তেইনে (Hippolyte Taine)-এর মধ্যে এসে 'ঐতিহাসিক ঈস্থেটিক' (Historical Aesthetic) সৃষ্টি করেছে, তেমনি প্রুধোঁ এবং জে. এম. গুইয়েঁ (J. M. Guyan) মধ্যে এসে 'সামাজিক ঈস্থেটিক' (Social Aesthetic) সৃষ্টির প্রেরণায় পর্যবসিত হয়েছে। তেইনে বলতে চেয়েছেন—আমরা যদি বিভিন্ন জাতির এবং বিভিন্ন যুগের শিল্পকলা পর্যালোচনা করে, প্রত্যেকটি শিল্পের উৎপত্তির ইতিহাস এবং স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারি, তা হলেই আমরা শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা সম্যকভাবে করতে পারব—খাঁটি শিল্পতত্ত্বে পৌঁছতে পারব (শিল্পকলাদর্শন ১৮৬৬-১৮৬৯)।*

এইভাবে শিল্পকে এবং শিল্পের স্বরূপকে দেশকালপাত্র সাপেক্ষ করে ধারণা ও বিচার করার প্রবৃত্তি, বলা বাহুল্য, বস্তুবাদী বিশেষত বিবর্তনবাদী সংস্কারেরই ফল—মানুষের আচরণকে—সে যে আচরণই হোক না কেন—সমাজবিবর্তনের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখার চেষ্টা। এই চেষ্টারই আর একটি রূপ—ব্যক্তিজীবনকে সমাজজীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-যোগে-যুক্ত করে দেখা। অর্থাৎ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য দেওয়ার যে প্রবৃত্তি অধ্যাত্মবাদী দর্শনের সংস্কার বা প্রেরণা থেকে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেয়, সেই প্রবৃত্তি ত্যাগ করে, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিকসত্তাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে দেখা। এইভাবে দেখতে যাওয়ার অর্থ—ব্যক্তির আচরণের মূলে সমাজের প্রেরণা স্বীকার করা এবং সমস্ত আচরণকে অভিযোজন-প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে মনে করা।

* "If by studying the art of various peoples and various epochs, we could define the nature and establish the conditions of the existence of each art, we should have arrived at a complete explanation of the fine arts and of art in general, i. e. at what is called an Aesthetic."

"সোসাল ঈস্থেটিক"-এর প্রতিষ্ঠাতা J. M. Guyan** তাঁর "সমসাময়িক শিল্পতত্ত্বের সমস্যা" (১৮৮৪) এবং "শিল্পের সমাজ-বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য" (১৮৮৯) প্রভৃতি গ্রন্থে, খেলাবাদ খণ্ডন করে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে—শিল্প খেলা নয়, জীবনের জন্যই শিল্প এবং এই জীবন 'সামাজিক জীবন'।

শিল্প দুইভাবে আমাদের প্রয়োজন মেটায়—প্রথমতঃ সে আমাদের মধ্যে শব্দ, বর্ণ প্রভৃতি আনন্দজনক সংবিদ জাগিয়ে তোলে, এবং পরোক্ষভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের বা তত্ত্বের কাছাকাছি আমাদের পৌঁছে দেয়। বস্তুত ভাস্কর্য শারীরবিজ্ঞান এবং অস্থি-সংস্থানবিদ্যার উপরে নির্ভরশীল। চিত্র নির্ভর করে অস্থিসংস্থানবিদ্যা, শারীরবিজ্ঞান এবং দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপরে; স্থাপত্য নির্ভর করে দৃষ্টিবিজ্ঞানের উপরে; সংগীত নির্ভর করে শারীরবিজ্ঞান এবং ধ্বনিতত্ত্বের উপরে, কবিতা নির্ভর করে ছন্দোবিজ্ঞান অর্থাৎ ধ্বনিবিজ্ঞান তথা শারীরবিজ্ঞানের উপরে। দ্বিতীয়ত শিল্প আমাদের মধ্যে—

> "Produce the phenomena of 'Psychological induction' which bring to a head ideas and sentiments of most complex nature (sympathy with personages represented, interest, pity, indignation etc.), in short all the social feelings which constitute it 'the expression of life'—"

অর্থাৎ শিল্প আমাদের মনে বিমিশ্র ধরনের ভাবনা ও আবেগ জাগিয়ে তোলে তথা সামাজিক সহানুভূতি বাড়িয়ে দেয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বচিন্তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানেই শেষ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গের মনে এ ধারণা স্পষ্টাকারেই জেগেছে

** ফরাসী সমালোচকেরা বলেন—Guyan শিল্পতত্ত্বে তৃতীয় যুগের প্রবর্তক। প্রথম যুগে—প্লেটোর 'ঈস্থেটিক অফ আইডিয়াল', দ্বিতীয় যুগে কাণ্টের—'ঈস্থেটিক অফ পারসেপশান', তৃতীয় যুগে—Guyan-র—'ঈস্থেটিক অফ সোসাল সিম্প্যাথি'।

যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাবে 'সাবজেকটিভ আইডিয়ালিজম' এবং 'অবজেকটিভ আইডিয়ালিজম' অর্থাৎ ভাববাদী ও অধ্যাত্মবাদী দর্শনের অভ্যুদয় ঘটে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত ঐ দর্শন নানাভাবে শিল্পতত্ত্বচিন্তাকে প্রভাবিত করতে থাকে; কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিজ্ঞানভিত্তিক বস্তুবাদী দর্শন ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করতে থাকে এবং শিল্পতত্ত্বচিন্তা জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়। সুতরাং এখন থেকে এই দুই দার্শনিক শিবিরের দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতেই শিল্পতত্ত্বচিন্তার ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যাঁরা ভাববাদী পরাতত্ত্বে বা অধ্যাত্মবাদী পরাতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা শিল্পকে দেশকালনিরপেক্ষ কোন পারমার্থিক সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত—অতীন্দ্রিয় ভাবের (আইডিয়া) বা সত্যস্বরূপ-শিবস্বরূপ এবং সৌন্দর্যস্বরূপ পরম সত্তার ধ্যানে পরিণত করে গৌরব দান করেছেন (এবং করবেন)। আর যাঁরা বস্তুবাদী পরাতত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা শিল্পের উৎপত্তি, স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে, জৈববৈজ্ঞানিক প্রবণতা, মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা এবং সমাজবৈজ্ঞানিক প্রবণতা দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আবার এমন অনেকে আছেন যাঁরা প্রচ্ছন্ন-অধ্যাত্মবাদী বা প্রচ্ছন্নবস্তুবাদী। এই প্রচ্ছন্নদের নিয়েই মহাসমস্যা। এঁদের ঝোঁক ধরতে খুবই বেগ পেতে হয়।

সে যাই হোক, শিল্পতত্ত্বচিন্তায় আমরা উল্লিখিত প্রবণতাগুলি যেমন দেখতে পাব, তেমনি লক্ষ্য করতে পারব—আত্মকেন্দ্রানুগতা (সাবজেকটিভিটির অতিমাত্রা) এবং বিষয়কেন্দ্রানুগতা (অবজেকটিভিটি)। আমরা দেখতে পাব একদল চিন্তাশীল অধ্যাত্মবাদী দর্শনকে অস্বীকার করবেন বটে কিন্তু চৈতন্যকে অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তির এবং কল্পনাবৃত্তির নিরপেক্ষ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে যেয়ে অতিমাত্রিক আত্মকোটিক হয়ে পড়বেন—বিষয়কোটি বর্জন করে শিল্পকে সত্য ও নীতি থেকে, এক কথায় জীবন-সমালোচনার দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই আমরা এমন একজন দার্শনিককে পাই। তাঁর নাম বেনিডেট্টো ক্রোচে এবং তাঁর গ্রন্থের নাম—"এস্তেতিকা" (Estetica—1900)। ক্রোচে পজিটিভিজমের এবং ন্যাচারালিজম-এর ঘোরতর বিরোধী। তাঁর মতে—শিল্প হচ্ছে কল্পনাত্মক জ্ঞান—প্রাতিভানিক জ্ঞান (intuitive knowledge)—এক কথায় নির্বিকল্পক ধ্যানের প্রকাশ (expression)। ক্রোচের মতবাদ শিল্পতত্ত্বে 'একসপ্রেশানিজম্' নামে খ্যাত। একদিকে যেমন তিনি 'ভাব'বাদের বিরোধী, অন্যদিকে তেমনি তিনি রসবাদের এবং আনন্দবাদের বিরোধী। শিল্পের উদ্দেশ্য—তাঁর মতে, সৌন্দর্যের বা আনন্দের বা ভাবের প্রকাশ নয়, শিল্পের উদ্দেশ্য—প্রতিভানের প্রকাশ (expression, intuition) এই সিদ্ধান্তেরই সহজ অনুসিদ্ধান্ত—সত্য বা শিবকে প্রকাশ করার দায়িত্ব—জীবন-সমালোচনার দায়িত্ব শিল্পের নেই।

শিল্পীর একমাত্র কাজ—চেতনায়-প্রতিভাত রূপরাজি প্রকাশ করা চৈতন্যের কল্পনার দায় মেটানো—প্রতিভানকে প্রকাশ করে মুক্তির আনন্দ পাওয়া। ক্রোচের এই মতবাদটি পরবর্তী বহু চিন্তাশীলের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। আজও অনেকে, বিশেষ করে যাঁরা শিল্পকে অহেতুক আনন্দের সামগ্রী করে রাখতে চান, শিল্পকে সামাজিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে দেখে অর্থাৎ বৈপ্লবিক চিন্তার ও কার্যের বাহন হতে দেখে অস্বস্তিবোধ করেন, তাঁরা ক্রোচের প্রতিভানতত্ত্বের মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে থাকেন। ক্রোচের প্রতিভানতত্ত্ব একদিকে যেমন রহস্যপ্রিয়দের রহস্যবোধকে এবং ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী সংস্কারকে তৃপ্ত করে, অন্যদিকে তেমনি মনস্তাত্ত্বিকদের মনস্তত্ত্বপ্রবণতা চরিতার্থ করে প্রগতিশীল হওয়ার অভিমান পূরণ করে। এই কারণে প্রত্যেক দেশেই প্রচ্ছন্ন-ভাববাদীরা এবং প্রচ্ছন্ন অধ্যাত্মবাদীরা (প্রতিক্রিয়াশীলরা ?) ক্রোচের 'একসপ্রেশানিজম্' বা 'ইনট্যুইশানিজম্'-এর মধ্যে মুখরক্ষার একটা আশ্রয়স্থল খুঁজে পেয়েছেন। বিষয়বস্তুর মর্যাদা নস্যাৎ করে

দিয়ে এবং রূপকল্পনা ব্যাপারটিকে সর্বেসর্বা বলে ঘোষণা করে এঁরা শিল্প ও শিল্পীকে জীবন-সমালোচনার তথা সত্যের ও নীতির দায় থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে চান। অখ্যাতদের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, ই. এফ.' ক্যারিট, আর জি. কলিঙউড্ প্রমুখ বিখ্যাত শিল্পদার্শনিকরাও ক্রোচের মতকেই যথাসাধ্য অনুসরণ করেছেন।*

ক্রোচের মতো অতখানি প্রতিভানবাদী (intuitionist) না হলেও, এমন কেউ কেউ পরে এসেছেন যাঁরা শিল্পকলাকে ক্রোচের মতোই নিছক experience এর প্রকাশ হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন। এঁরা বলেছেন, শিল্পে মানুষ তার স্মরণীয় অভিজ্ঞতাকে আর দশটা সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক করে নিয়ে আস্বাদন করতে চায়—অভিজ্ঞতাকে অক্ষয় করতে চায়। এঁদের মতে শিল্প হচ্ছে—"expression of heightened experience". এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য দার্শনিক John Dowecy-রচিত "Art as Experience" (1934)-গ্রন্থে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। ক্রোচের সঙ্গে এঁদের ঐক্য রয়েছে এখানেই যে এরাও অভিজ্ঞতার নিছক প্রকাশ-এর উপরে বেশি ঝোক দিয়েছেন এবং পার্থক্য এখানেই যে 'experience' শব্দটি তত নিরপেক্ষ বা বিষয়সম্পর্কশূন্য বলে মনে হয় না যত নিরপেক্ষ এবং বিষয়সম্পর্কশূন্য বলে মনে হয়—'intuition' কথাটা। আর 'অভিজ্ঞতার প্রকাশ' ততখানি নির্বিকল্পক ব্যাপার নয়, যতখানি নির্বিকল্পক ক্রোচের প্রতিভান (ইনট্যুইশান) শিল্পের সৃষ্টি ব্যাপারকে প্রাতিভানিক ব্যাপারে পরিণত করায়, ক্রোচের মতবাদ শিল্পীকে কল্পনাবিলাসী দায়মুক্ত ও আত্মকেন্দ্রিক হওয়ার যতখানি সুযোগ দিয়েছে, অন্যান্য মতবাদ ততখানি সুযোগ দেয় নি। পরবর্তীকালে 'কিউবিস্ট' সম্প্রদায় শিল্পকে অভিজ্ঞতার বাস্তব এবং সম্ভাব্য রূপের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন এবং

* ই. এফ. ক্যারিট—দি থিওরি অফ বিউটি—১৯১৪, ফিলোসফিজ অফ বিউটি—১৯৩১; হোয়াট ইজ বিউটি—১৯৩২। কলিঙউড—প্রিন্সিপিলস্ অফ আর্ট—১৯৩৮।

কিম্ভূতকিমাকার রূপকল্পনায় পর্যবসিত করেছিল, তাঁদের মুল প্রেরণার সঙ্গে ক্রোচের মূল প্রেরণার বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। পরে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হবে সুতরাং এখানে শুধু ক্রোচের মতবাদ ও তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই যথেষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বচিন্তায় ক্রোচের নিরপেক্ষ কল্পনাবাদের বা প্রতিভানবাদের প্রভাব বহুব্যাপী হলেও, এই কথাটি বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে যে এই শতাব্দীতেই মনোবিজ্ঞানের এবং সমাজ-বিজ্ঞানের এক কথায় বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পের প্রেরণা স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য বিচার করার প্রবণতা অতিসংলক্ষ্য প্রাধান্য লাভ করেছে। একদিকে ক্রোচেপন্থীরা কল্পনাবৃত্তির নিরপেক্ষ অস্তিত্বকে ভিত্তি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপের জগৎ কল্পনা করেছেন—কল্পনাকৈবল্যবাদ প্রচার করে চলেছেন—রূপের ভাব-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন; অন্যদিকে শিল্পকে জীবনের বাসনা-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত করে জীবনযাপন সাপেক্ষ করে দেখার চেষ্টা দেখা দিয়েছে—বাসনা বা আনন্দ-কামনাকে ভিত্তি করে সৌন্দর্যের বা রূপের মূল্য নিরূপণ করার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম পক্ষের সঙ্গে দ্বিতীয় পক্ষের মৌলিক পার্থক্য মুখ্যত একটি বিষয়ে এবং সেই বিষয়টি এই যে দ্বিতীয় পক্ষ—'Communication' এবং 'Value'-কে শিল্পরচনার মূল প্রয়োজন বলে গণ্য করেন। এঁরা বলতে চান—রিচার্ডের ভাষায়—

> "An experience has to be formed, no doubt, before it is communicated, but it takes the form it does largely because it may have to be communicated"—
>
> (Principles of Literary Criticism—25 page.)

এঁরা বলতে চান—শিল্প মানুষের কল্পনাবৃত্তির নিছক স্বাধীন অনুশীলন নয়, কল্পনার বিলাসমাত্র বা খেলামাত্র নয়, শিল্প সামাজিক মানুষের মূল্যবোধের তথা জীবন সমালোচনার প্রকাশ—

> "The arts are our storehouses of recorded values……

They record the most important judgments we possess as to the values of experience." (ঐ ৩২ পৃষ্ঠা)

বিশেষ লক্ষণীয়—শিল্প হচ্ছে "values of experience" সম্বন্ধে "important judgments" নিছক "experience"-এর প্রকাশ নয় —experience এর মূল্য সম্বন্ধে শিল্পীর বিশেষ সিদ্ধান্তের বা মনোভাবের প্রকাশ। যেহেতু মূল্যবোধ নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়, সেই হেতু এদের কাছে "মূল্য"বোধ (value) সব কিছুর মূলে। আই. এ. রিচার্ড মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত "প্রিন্সিপল্ অফ লিটারারি ক্রিটিসিজম্" গ্রন্থে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে "মূল্য"-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থের "A psychological theory of value"—অধ্যায়ে তিনি মূল্যের এবং মূল্য বিচারের মূলসূত্র নিরূপণ করতে চেষ্টা করেছেন। মূল্যতত্ত্ব গেঁথে তুলতে গিয়ে প্রথমেই তিনি সূত্র তৈরি করেছেন—"Anything is valuable which satisfies an appetancy or seeking after" সূত্রটিকে আরো সুযোগ্য করতে—অব্যাপ্তি-অতিব্যাপ্তি এড়াতে গিয়ে লিখেছেন—

"Anything is valuable which will satisfy an appetancy without involing the frustration of some equal or more important appetancy."

রিচার্ডের মতে—

"The most valuable states of mind then are those which involve the widest and most comprehensive co-ordination of activities and the least curtailment, conflict, starvation and restriction" (৫৯ পৃঃ)

মোটকথা এই যে সেই বস্তুই মূল্যবান বলে গণ্য যা অন্যান্য ঐকান্তিক বাসনাকে বিপর্যস্ত না করে আমাদের বোধ বা বাসনাকে পরিপূরণ করে। মূল্যবান মানসিক অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থা যাতে সব চেয়ে বেশি ব্যাপকভাবে প্রবৃত্তিরাজির সমন্বয় ঘটে এবং যাতে সব চেয়ে কম মাত্রায় প্রবৃত্তির নিরোধ, দ্বন্দ্ব, উপবাস এবং বাধা থাকে।

মূল্যের এই সংজ্ঞা বা সূত্র শিল্পবিচারেও প্রযোজ্য এবং তা প্রয়োগ করতে গেলেই দেখা যাবে শিল্পের বিচারে শুধু কল্পনার স্বমহিমা নামক মহিমার হিসাব করাই যথেষ্ট নয়—শিল্পের "place in the great structure of human life"—অবশ্যই নিরূপণ করতে হবে ; আর তা করতে গেলেই "innumerable ulterior worths"ও হিসাব করতে হবে। বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে, মূল্য-তত্ত্ব সম্পর্কে—বন্ধু-সমালোচক মিঃ কোন্‌রাড্‌ আইকেন মহাশয়ের অভিযোগের উত্তরে রিচার্ড মহাশয় যা লিখেছিলেন, সেই কয়েকটি কথা উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হবে। রিচার্ড লিখছেন—

> "The purpose of the theory is just to enable us to compare different experiences in respect of their value ; and their value, I suggest, is a quantitative matter .... What the theory attempts to provide is a system of measurement by which we can compare not only different experiences belonging to the same personality but different personalities" (২৮৮ পৃঃ)

মোট কথা এই যে রিচার্ড বিভিন্ন উপলব্ধির মূল্য বিচার করবার জন্য একটি পরিমাপ সূত্র তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন এবং এই কথাই বার বার এবং বিশেষভাবে বলতে চেয়েছেন যে মানুষের বাসনা কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মানুষের সৃষ্টির মূল্য বিচার করা সম্ভব নয়।

যেমন আই. এ. রিচার্ড মহাশয় communication এবং value—এই দুটি বিষয়ের উপরে জোর দিয়ে 'কলাকৈবল্যবাদ'-বিরোধী মতবাদকে জোরালো করে তুলেছেন, তেমনি যাঁরা বস্তুবাদী সমাজবিজ্ঞানের আলোকে শিল্পের প্রেরণা বা উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছেন তাঁরাও একটি মূল্যমান নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের এই মূল্যতত্ত্বকে বলা যেতে পারে—"Sociological theory of value"। এঁরাও communication ব্যাপারটিকে মুখ্য প্রেরণা হিসাবে এবং শিল্পকে গোষ্ঠীগত এবং

শ্রেণীগত অভিযোজনের আবেগ তথা সমাজ-চেতনার অভিব্যক্তি হিসাবেই গণ্য করেছেন। এরা মনে করেন—সমাজ-বিবর্তনের সঙ্গে বাসনা-কামনার তথা মূল্য-বোধের বিবর্তন কার্যকারণযোগে যুক্ত; সুতরাং সমাজনীতি বা সামাজিক আদর্শই মূল্যবোধের ভিত্তি-ভূমি। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার পূর্ণ আদর্শের, এক কথায় সোসালিস্ট রিয়েলিজমের আদর্শের দিকে সমাজ বিবর্তিত হয়ে চলেছে, ঐ আদর্শই সব চেয়ে মূল্যবান আদর্শ।

এই সম্প্রদায়ের কাছে প্রগতিশীল শিল্পী তিনিই যিনি সমাজে তথা জীবনে সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সংকল্পিত ও সচেস্ট; যিনি তার সৃষ্টির সাহায্যে সমাজের মধ্যে পরিপূর্ণ সাম্যের, পরিপূর্ণ মৈত্রীর এবং পরিপূর্ণ স্বাধীনতার আবেগ সঞ্চারিত করতে চান এবং চান বলেই সমস্ত রকম অসাম্যের বিরুদ্ধে, এক কথায় পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর। এঁদের চোখে, শিল্পী কল্পনাভুক আকাশস্থ কোন জীব নয়; আর দশজন সামাজিকের মতোই সমাজের বিশেষ শ্রেণীর লোক—সামাজিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি। শিল্প হচ্ছে ঐ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করারই অন্যতম উপায়—জীবন সংগ্রামেরই অন্যতম হাতিয়ার। এঁরাও বলেন শিল্পের জগৎ মুক্তির জগৎ—শিল্প সৃষ্টি করে মানুষ মুক্তির আনন্দই পেয়ে থাকে; অবশ্য এ মুক্তি দায়শূন্যের হাওয়ায়-ভাসার বা যা-খুশি করার মুক্তি নয়—এ মুক্তি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললে—ঋণ-পরিশোধ—সমাজের ঋণ-পরিশোধ—এঙ্গেলসের ভাষায় "recognition of necessity"। অধ্যাত্মবাদীর অথবা প্রতিভানবাদীর বা কল্পনাবাদীর মুক্তির ধারণা থেকে এ ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। অধ্যাত্মবাদী বা কল্পনাবাদী মুক্তি খোঁজেন সংসারের বাইরে—সৌন্দর্যের বা রূপের এক অতীন্দ্রিয় নতুন জগতের মধ্যে আর বস্তুবাদী বা সমাজবাদী মুক্তি খোঁজেন সংসারের ভিতরে জীবনকে বাধামুক্ত করার মধ্যে।

এখানে এই যে দু-রকম প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছে, শিল্পতত্ত্বের ক্রম-

বিকাশ আলোচনা করবার সময় বারবার এই দুটি প্রবণতাকে লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়—একদল শিল্পকে প্রয়োজনের জগৎ থেকে দূরে রাখতে চান—জীবন-সমালোচনা দ্বারা লোকশিক্ষা-নীতিশিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত রাখতে চান এবং অন্য দল শিল্পকে জীবন সাপেক্ষ বা সমাজ সাপেক্ষ করে দেখতে চান। প্রথম দল শিল্পকে একটি নিরপেক্ষ বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের ফল বলে স্বাতন্ত্র্য দান করতে চান—অনুকরণবৃত্তি—কল্পনাবৃত্তি, প্রতিভানবৃত্তি, বীক্ষণ-বৃত্তি প্রভৃতি বৃত্তির কোন একটিকে "কৈবল্য"-মর্যাদা দিয়ে, শিল্পকে কেবলমাত্র ঐ বৃত্তিটিরই নিরপেক্ষ ক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে চান—শিল্পকে ব্যক্তি-সত্তা এবং সমাজ-সত্তার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য করে তুলতে চান; বলতে চান ব্যক্তির বা সমাজের কোন বাসনা প্রকাশ বা চরিতার্থ করতে শিল্পের জন্ম হয়নি। শিল্পীর একমাত্র লক্ষ্য—বৃত্তিকে বিচিত্রভাবে প্রয়োগ করা—বৃত্তির প্রয়োগ কৌশল দেখানো, বিষয় উপলক্ষ্য মাত্র। এই দলই কলাকৈবল্যবাদী নামে পরিচিত। অন্য দল—বৃত্তিকে অতখানি নিরপেক্ষ মর্যাদা দেন না। তাঁরা বৃত্তিকে যেমন বিষয় প্রকাশের উপায় হিসাবেই গণ্য করেন, তেমনি বিষয় প্রকাশকে জীবনের বা সমাজের চাহিদার ফল বা যোগান বলেই মনে করেন। এঁরা বলেন—art for life's sake। শিল্পকে সত্য-শিব-সুন্দরের-প্রকাশ, আনন্দের প্রকাশ, আবেগের প্রকাশ, অবদমিত বাসনার প্রকাশ, অভিজ্ঞতার প্রকাশ—যাই বলা হোক না কেন, বিষয়ের বা মূল্যের উপরে এঁদের ঝোঁক খুবই বেশী।

প্লেটো-এরিস্টটলের সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস—এক নজরে যতটুকু দেখা সম্ভব, ততটুকুই দেখাতে চেষ্টা করলাম। লেখকের এবং গ্রন্থের নাম হয়ত অনেক বাদ পড়েছে, কিন্তু মৌলিক চিন্তা এবং প্রবণতাগুলি যথাসম্ভব এবং যথাসাধ্য উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছি। পাঠকমাত্রে লক্ষ্য করবেন বিংশ শতাব্দীর শিল্পতত্ত্বচিন্তাকে আমি প্রবণতার ভিত্তিতে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করে দেখাতে চেষ্টা করেছি। এক

শ্রেণীতে রেখেছি—কল্পনাবাদী, প্রতিভানবাদী, বীক্ষণবাদী, সংবাদ-বাদী (নতুন মতবাদ) রীতিবাদী প্রভৃতি "রূপ"-কৈবল্যবাদীকে এবং অন্য শ্রেণীতে স্থান দিয়েছি—টলস্টয় প্রমুখ ভাববাদী ও সঞ্চারবাদীদের এবং বস্তুবাদী বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অর্থাৎ যাঁরা communication এবং বিষয়ের valueতে বিশ্বাসী সেই সব বিষয়বাদীদের—দ্বৈতবাদীদের। আশা করি, একটি বিষয়ে আমি পাঠকদের অবহিত করতে পেরেছি এবং সেই বিষয়টি এই যে পরিভাষা যত কিম্ভূতকিমাকার রূপ নিয়েই আসুক, খোসা ছাড়ালে আমরা আমাদের চেনা জানা শাঁসগুলিরই কোন-না-কোন একটিকে দেখতে পাব। একদিকে—imitation, imagination, intuition, expression, criticism, exhibition, configuration, organic unity, information প্রভৃতি 'ব্যাপারের' নামাবলী অন্যদিকে impression, pleasure, emotion, experience, particular, concrete, beauty প্রভৃতি 'বিষয়ের' নামাবলী। মূল সমস্যা কিন্তু দু'একটি প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আশা করি—এতক্ষণে প্রশ্নগুলি পাঠকের মনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই পাঠকের মনে এ প্রশ্ন জেগেছে—তবে কি বিশেষ বৃত্তির উপরে জোর দিয়েই অর্থাৎ মানসিক ক্রিয়ার বিশেষত্বের উপরে ভিত্তি করেই, শিল্পের সংজ্ঞা তৈরি করতে হবে? অথবা বিষয়বস্তুর বিশেষত্বকে বা প্রকৃতিকে ভিত্তি করেই শিল্পের সংজ্ঞা গড়তে হবে? ব্যাপারের প্রকৃতি বিষয়ের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এ কথা স্বীকার করে নিয়েও এ প্রশ্ন উঠবেই—কোন্ দিকে বিশেষ জোর দিয়ে শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে?

শিল্পের বিভিন্ন সংজ্ঞা ও তাদের বিশ্লেষণ

(ক) শিল্পতত্ত্বে—অনুকৃতিবাদ

অনুকৃতিবাদ শিল্পতত্ত্বশাস্ত্রে সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ বলে পরিগণিত। ইউরোপের প্রথম সভ্যদেশ গ্রীসের এবং এশিয়ার অন্যতম প্রথম সভ্যদেশ ভারতের শিল্পতত্ত্বচিন্তা পর্যালোচনা করতে গেলেই দেখা যায়—উভয় দেশেই শিল্পকে অনুকৃতি অর্থাৎ অনুকরণ ব্যাপারের ফল বলে গণ্য করা হয়েছে। প্লেটো-এরিস্টটলের অনেক আগেই গ্রীসে শিল্পকে 'মাইমেসিস' বলা হয়েছে এবং অনেককাল পরেও শিল্প 'মাইমেসিস' বলেই বিবেচিত হয়েছে। এই 'মাইমেসিস' শব্দটিরই ইংরেজি অনুবাদ—'ইমিটেশান' এবং 'ইমিটেশান' শব্দটির বাংলা অনুবাদ—'অনুকরণ'। অবশ্য 'অনুকরণ' শব্দটিকে 'ইমিটেশান' শব্দটির বাংলা অনুবাদ বললে সবটা সত্যি কথা বলা হয় না। কারণ সংস্কৃত-ভাষায়-লেখা ভরত কৃত নাট্যশাস্ত্রে নাট্যকে—'লোকবৃত্তানুকরণ' এবং বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রে শিল্পকে অনুকৃতি বলা হয়েছে এবং সেখানেই 'অনুকরণ' শব্দটিকে এবং পরোক্ষভাবে শিল্পের সংজ্ঞাটিকেও পাওয়া যায়।

'মাইমেসিস' বা 'অনুকরণ' বলতে প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রকাররা ঠিক কি ধারণা করেছিলেন, কিছু কিছু প্রমাণের এবং অনেকখানি অনুমানের সাহায্যেই তা আমাদের গড়ে নিতে হয়। এই কারণে—ঐ ধারণা সম্বন্ধেও কোন ঠিক ধারণা নেই। প্রমাণ ও অনুমান প্রয়োগে সমালোচকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। সুতরাং মতভেদের কথা আপাততঃ স্থগিত রেখেই, অনুকৃতিবাদের ভিত্তি ও

সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। অনুকরণবাদের ভিত্তিটি সহজেই অনুমান করা চলে। মানুষ রয়েছে তার প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে। বাহ্য পরিবেশ থেকে রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের প্রত্যয় আসছে ইন্দ্রিয়পথে, প্রত্যয়গুলি এসে মনে জাগাচ্ছে ভাবের আন্দোলন। অন্তরে রয়েছে ভাব, স্মৃতিতে বিচিত্র প্রত্যয়, চেতনায় প্রকাশশীলতা—প্রকাশ ক্ষমতা এবং বাসনায় প্রকাশের ইচ্ছা—সমাজের সকলের কাছে অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিকে ব্যক্ত করার ব্যাকুলতা। অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে স্বরূপতঃ ব্যক্ত করার এই চেষ্টা, অবশ্যই (অভিজ্ঞতার বা উপলব্ধির) অনুকৃতি (মাইমেসিস) রচনা করার চেষ্টায় পর্যবসিত হবে। অর্থাৎ ভাবাবেগের অনুকৃতি রচনা করতে গেলে ভাবের অভিব্যক্তিকে অনুকরণ করতে হবে এবং প্রাকৃতিক বস্তুর এবং জীবনের রূপের অনুকৃতি নির্মাণ করতে হলে বস্তুসদৃশ বা লৌকিক জীবন-সদৃশ জীবনের রূপ অর্থাৎ অনুরূপ বস্তু বা জীবন নির্মাণ করতে হবে। 'অনুকরণ' শব্দটিকে যে এরূপ ব্যাপক অর্থেই—'অনুরূপ রূপ রচনা'—অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে—তার যথেষ্ট প্রমাণ প্লেটো-এরিস্টটলের লেখা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যথাযথ রূপ এবং অনুরূপ বা সম্ভাব্যরূপ এই দুটি শব্দের তাৎপর্য বুঝতে পারলেই আমাদের পক্ষে অনুকরণবাদের আসল বক্তব্য এবং তার যাথার্থ্যের পরিমাণ উপলব্ধি করা সহজতর হবে। অনুকরণ শব্দটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে, আমরা যদি অনুকরণ বলতে বিশেষের যথাযথ উপস্থাপনা অর্থাৎ যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং ধরনের কিছু বুঝি, তাহলে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে শিল্পসৃষ্টি অনুকরণ ব্যাপার নয়, কারণ শিল্পের ইতিহাসের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত, যথার্থ যথাযথ উপস্থাপনার নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে বেশীর ভাগ সৃষ্টিই প্রতিকৃতি নয়—অনুকৃতি—অনুরূপের উপস্থাপনা। কিন্তু অনুকরণ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে অর্থাৎ অনুরূপ রূপ কল্পনা অর্থে ব্যবহার করলে এবং শিল্পকে অনুকৃতি বা নির্মিতি বললে খুব একটা আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কেন নয়, তা' বলার

আগে এ বিষয়ে অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহাশয়ের মন্তব্যটুকু (Essays and Addresses—1921) মুখবন্ধ হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। অধ্যাপক মারে লিখেছেন—

> "the conception of art as mimesis, though rejected by almost all recent critics, has a justification and may even show real profundity of insight. Mimesis is I suspect, not only an essential elements in all art but also our greatest weapon both for explaining and for understanding the world."

'অর্থাৎ যদিও আধুনিক সমালোকদের প্রায় সকলেই "শিল্প অনুকরণ"—এই ধারণাকে মিথ্যা বলে বর্জন করেছেন, তবু একথা বলতে চাই যে ঐ ধারণার মূলে যথেষ্ট যুক্তি আছে—প্রকৃত এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। আমি মনে করি—অনুকরণ শুধু প্রত্যেক শিল্পেরই অপরিহার্য উপাদান নয়, অনুকরণ জগতের ধারণার ও ব্যাখ্যার পক্ষে প্রধান হাতিয়ার।' বলা বাহুল্য অধ্যাপক গিলবার্ট মারে মহাশয়—শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য উপাদান বলে অনুকরণ ব্যাপারটিকে বহু মর্যাদা দেখিয়েছেন—অনুকরণবাদকে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন। বাস্তবিকই, যে ব্যাপক অর্থে প্লেটো এরিস্টটল এবং ভরত 'অনুকরণ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাতে অনুকরণ শুধু পরিদৃশ্যমান জগতের অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বস্তুর যথাযথ আকরণ—হুবহু নকল মাত্র নয়, অনুকরণ আসলে বিশেষের সম্ভাব্য রূপটির—আদর্শায়িত রূপের উপস্থাপনা। 'টাইমেয়ুস' (Timaeus) সংবাদ নিবন্ধে প্লেটো যেখানে জগতের নিত্য এবং অনিত্য রূপ নিয়ে এবং নিত্যানিত্য সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং শিল্পীদের 'নিত্যের রূপকার' এবং 'অনিত্যের রূপকার' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করতে যেয়ে লিখেছেন—

> "When the Artificer fastens his gaze upon the eternally unchanging and using it as his model reproduces its essential form and power, then everything must turn out beautiful, but when he gazes upon what has taken upon

itself sensory being, using that as his model, his work has not beauty."

সেখানে নিশ্চয়ই অনুকরণ সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি—অনুকরণ সেখানে, ওঁসবোর্ন মহাশয়ের ভাষায়—"super sensible intuition of the realm of Ideas."

—ভাবের ধ্যানধৃত রূপ। অথবা এরিস্টটল যেখানে "সম্ভাব্য" রূপের অনুকরণের কথা বলেছেন বা "স্বকপোলকল্পিত কাহিনী"র সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, সেখানেও অনুকরণকে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া মাত্র বলা চলে না; সেখানে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'র সঙ্গে অনুকরণের বড় কোন পার্থক্য পাওয়া যায় না। সেখানে অনুকরণ—উদ্ভাবনা শক্তি, আরোপণ শক্তি, উৎকলন শক্তি ও সংকলন শক্তি, সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণ শক্তি—সব রকম মানসিক শক্তির সমবায়। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা স্বীকার করা হবে যে শিল্পের উদ্দেশ্য আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা অর্থাৎ রূপের ও ভাবের সংস্কারগুলি নানা আকারে ও উপায়ে প্রকাশিত করা, ততক্ষণ অনুকরণবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হবে না। কারণ প্রকাশ্য বিষয়বস্তু, রূপই হোক আর ভাবই হোক, শেষ পর্যন্ত তা রূপের বা ভাবেরই ধারণা বিশেষ এবং ঐ ধারণা ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অর্থাৎ রূপ-চেতনা ও ভাব-চেতনার ক্ষেত্র থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। এক হিসাবে যা রূপের নব উন্মেষ, অন্য হিসাবে তা' রূপ চেতনারই সম্ভাব্য সম্প্রসারণ। এমন কি যা' দুঃস্বপ্নের মতো কিম্ভূতকিমাকার, তার গঠনও অভিজ্ঞাত প্রত্যয়ের (impression) সংযোগ-সংমিশ্রণ ও সংশ্লেষণের ফলে সম্ভব হয়। তারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের 'অনুরূপ' বা সম্ভাব্য রূপ। এ কথা ঠিক যে নবোদ্ভাবিত রূপটি লৌকিক জগতের কোন বিশেষ 'ব্যক্তি'র যথাযথ রূপ নয়, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে ঐ রূপটি বিশেষ রূপের মর্যাদা লাভ করছে অন্যান্য রূপ থেকে স্বতন্ত্র হয়েই, অর্থাৎ বিশেষের অনুরূপ হয়েই। "তিলোত্তমা" যত অপূর্বই হোক আদর্শ সুন্দরীর অনুকৃতিই বটে।

অন্য দিক থেকেও অনুকৃতিবাদের পক্ষ সমর্থন করে কিছু বলা যেতে পারে। মানুষ যখনি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক হয় তখন অবশ্যই সে প্রকাশ করে তার ধ্যান-জ্ঞানকে—রূপের ধ্যান-ধারণাকে এবং ভাবকে —অর্থাৎ তত্ত্বের ধারণাকে। এই হিসাবে মানুষের প্রকাশ্য বিষয় মোট দুই প্রকার এক, 'রূপ' ; দুই, 'ভাব' (আইডিয়া)। শাস্ত্রকাররা ভাবকে তার স্বধর্মে রেখেই অর্থাৎ নির্বিশেষ রূপে—সূত্রাকারে বা ভাষ্যাকারে, প্রকাশ করতে চান, আর শিল্পীরা প্রকাশ করেন রূপময় করে। শিল্পীর উদ্দেশ্য যেহেতু অনুকৃতি রচনা বা রূপ কল্পনা শিল্পীকে অবশ্যই অরূপ ভাবকে রূপকায়িত করেই প্রকাশ করতে হবে—ভাবব্যঞ্জক ঘটনায় বা কাহিনীতে রূপান্তরিত করতে হবে। এই হিসাবে, শিল্পমাত্রেই বিশেষের রূপ—"concrete"-এর—'particular'-এর উপস্থাপনা।

বিশেষের ধ্যান বা জ্ঞান অবশ্যই বিশেষের প্রত্যয় সাপেক্ষ—সংক্ষেপে, 'বিষয়াকারা প্রতীতি' বিশেষ। অতএব শিল্পী শেষ পর্যন্ত বিশেষেরই অনুরূপ কোন রূপের ধ্যান-ধারণা করতে বাধ্য। সেই রূপের যত অপূর্বতা বা নবত্বই থাক, তা' 'বিশেষের'ই অনুরূপ হতে বাধ্য। এমন কি 'কিউবি'ষ্ট'-নামে খ্যাত যে শিল্পী সম্প্রদায়, তাঁরাও যখন কিম্ভূতকিমাকার রূপ কল্পনা করেন—সম্পূর্ণ অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করতে চেষ্টা করেন, এই সূত্রের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেন না। শিল্পী ব্রাঙ্কুসির (Brancusi) ব্রোঞ্জ নির্মিত "Bird in flight" শিল্পকর্মটি নিয়ে 'ইউনাইটেড স্টেটস্'-এর সঙ্গে যে মামলা হয়েছিল, তাতে বিচারক রায় দিতে যেয়ে লিখেছিলেন বটে—while some difficulty might be encountered in associating it with a bird,······তবু এ কথা মানতেই হবে—ব্রাঙ্কুসির 'উড়ন্ত পাখী' বিশেষ জাতের পাখী না হলেও দেখতে পাখার মতোই বটে ; শিল্পী যে হাতী বা ঘোড়া গড়তে চেষ্টা করেন নি—'Bird in flight' নামকরণেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সুতরাং ব্রাঙ্কুসির উড়ন্ত পাখীকে কেউ যদি উড়ন্ত পাখীর অনুকরণ বলেন, তা হলে নিশ্চয়ই মিথ্যা

কিছু বলেন না। কেউ যদি বলেন—ব্রাঙ্কুসি পাখীর আকৃতিতে যে বিকৃতি ঘটিয়েছেন তা করেছেন উড়ন্ত পাখীর ধারণাকেই বেশী করে ব্যক্ত করবার জন্য, তা হলে তাঁকে যুক্তিহীন বলা চলবে কি? সুতরাং অনুকরণ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করলে, কল্পনা প্রভৃতি অনেক কিছুকেই তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কিন্তু বার বার এই প্রশ্নই উঠেছে—'অনুকরণ'কে এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে কি? এতখানি সূক্ষ্মদর্শিতা আরোপ করলে অনুকরণবাদীদের সত্যের আলোকে দেখা হবে কি? এবং প্রশ্নের উত্তরে এই কথাই নিজেরা বলেছেন—'না'। ব্যাখ্যা বুদ্ধিবল সাপেক্ষ এবং ঐরূপ ব্যাখ্যায় বুদ্ধিবলের বেশ পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু—

> "It makes Aristotle speak with the voice of Arnold and pater and turns the doctrine of mimesis into something it was not and could not have been."—(Aesthetics & criticism).

এঁরা বলতে চান—ঐরূপ ব্যাখ্যা প্লেটো-এরিস্টটলকে সর্বজ্ঞের আসনে বসানো ছাড়া আর কিছুই নয় এবং অন্তর্বর্তী কালের ইতিহাস ও চিন্তার ক্রমবিকাশকে ছোট করে দেখা—বর্তমানের গভীর ও জটিল চিন্তাকে অতীতের সরল চিন্তার উপরে আরোপ করা। এদের কেউ কেউ বলেছেন—প্লেটো এরিস্টটলের সময়ে গ্রীসের চারুকলা উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষের অধিকারী হয়েছিল বটে, কিন্তু শিল্পতত্ত্বচিন্তা ছিল উন্মেষের স্তরে ; শিল্পের স্বরূপ সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি তখনও দেখা দেয় নি এবং শিল্পতত্ত্বকে ও সৌন্দর্যতত্ত্বকে এক বলে স্বীকার করা হয়নি। প্রাচীন চিন্তার সঙ্গে আধুনিক চিন্তার মৌলিক পার্থক্য এখানেই—শিল্পতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বকে এক মনে করায়। আধুনিকদের সকলেই স্বীকার করে থাকেন—শিল্পের উদ্দেশ্য সুন্দর সামগ্রী সৃষ্টি করা—সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। সুন্দরের সংজ্ঞা নিয়ে, যথেষ্ট মতভেদ থাকলেও 'সৌন্দর্য'কেই এরা লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের সকলেই যে এই একই যুক্তি দিয়েছেন বা দিয়ে

থাকেন, তা নয়; কল্পনাবাদীরা ভিন্ন যুক্তি দিয়ে অনুকরণবাদকে খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন। কল্পনাবাদীরা বলেছেন—অনুকরণ নিম্ন স্তরের মানসিক ক্রিয়া—অনেকটা যান্ত্রিক; অনুকরণ বলতে ইন্দ্রিয়গৃহীত প্রতীতিকে যথাযথরূপে প্রকাশ করা বুঝায় এবং তা ছাড়া আরো বেশী কিছু বুঝালে—অনুরূপ প্রতীতির বা সম্ভাব্য (probable) রূপের সৃষ্টি বুঝায়। কিন্তু সৃজনশীল কল্পনাবৃত্তি (creative imagination) বলতে বা প্রতিভা বলতে যে ধরনের নিরপেক্ষ উন্নত ও স্বাধীন মানসিক প্রক্রিয়া বুঝায়, অনুকরণ সেই ধরনের মানসিক ব্যাপার নয়—অনুকরণ ও প্রাতিভানিক জ্ঞানকে (intuitive knowledge) এক ব্যাপার বলা চলে না। আত্মার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় বাসনা বহিরাগত প্রত্যয়সমূহ আশ্রয় ও আত্মসাৎ করে যে বিচিত্র রূপের আকারে আত্মপ্রকাশ করতে চায়, যে বিচিত্র রূপের জগৎ তৈরি করে, তার সঙ্গে অনুরূপ রূপ তৈরি করার চেষ্টার এক কথায় অনুকৃতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অনুকরণ যেখানে মূলতঃ পরিবেশসাপেক্ষ, সৃজনশীল কল্পনা বা প্রতিভা সেখানে নিরপেক্ষ অর্থাৎ—বুদ্ধিনিরপেক্ষ এবং সংকল্প-নিরপেক্ষ আত্মিক ক্রিয়া। শিল্প শেষোক্ত বিশিষ্ট আত্মিক ক্রিয়ার ফল—সৃজনশীল কল্পনার সৃষ্টি—প্রতিভান—অনুকরণ নয়।

বহু লোকে বহু ভাবে অনুকরণবাদকে খণ্ডন করলেও অনুকরণবাদ কিন্তু "মরিয়া না মরে রাম"—নতুন নতুন মতবাদের ছদ্মবেশে আত্মরক্ষা করে আসছে।

'অনুকরণ' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করতে গেলেই এ কথা মোটামুটি মেনে নিতে হবে যে—যেখানেই শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারকে বিষয়-সাপেক্ষ ব্যাপার বলে স্বীকার করা হয়েছে—স্বীকার করা হয়েছে নিছক কল্পনানিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বিষয়কে প্রকাশ করা শিল্পের উদ্দেশ্য সেখানেই সৃষ্টি আসলে অনুকরণাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পের বিষয়বস্তু অনিত্য জগতের রূপরাজিই হোক অথবা প্লেটোর নিত্য ভাববস্তুই হোক, অথবা নব-প্লেটোবাদীদের ও অধ্যাত্মবাদীদের

পারমার্থিক পরম সত্তা—ঈশ্বর সত্তাই বা সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তাই হোক, অথবা মানুষের স্থায়িভাবসমূহই হোক—এর সবক্ষেত্রেই স্বতন্ত্র ও স্থায়ী কোন কিছুকে প্রকাশ করার দায়িত্ব শিল্পকে বহন করতে হয়—শিল্পীকে রূপের অনুরূপ রূপ তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ভাবের সম্ভাব্য রূপকল্প বা সূক্ষ্মরূপকে ব্যক্ত করতে হয়, তৃতীয়ক্ষেত্রে অরূপ পরমসত্তার রূপৈশ্বর্যকে প্রকাশ করতে হয়, চতুর্থক্ষেত্রে স্থায়িভাব-ব্যঞ্জক বা ভাবানুগত রূপ কল্পনা করতে হয়,—মোট কথা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুরূপ রূপ সৃষ্টি করার তথা অনুকৃতি নির্মাণের চেষ্টা থাকে। যে বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব শুধু শিল্পীর মনেই আছে অন্য কোথাও অর্থাৎ পরিবেশে নেই—অর্থাৎ যার শিল্পিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই, সেই বস্তুর প্রকাশ ছাড়া অন্য যে-কোন বস্তুর প্রকাশে অনুকরণ-ধর্মিতা খানিকটা থাকবেই।

এই কারণে, যে সব মতবাদে বিষয়ী, বিষয় এবং প্রকাশ ব্যাপারকে পরস্পরসাপেক্ষ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনুকরণবাদ এখনও আত্মগোপন করে বেঁচে আছে। যতক্ষণ শিল্পকে আমরা কোন একটা কিছুর প্রকাশ বলে মনে করব, ততক্ষণ অনুকরণবাদের ভূত আমাদের ঘাড়ে চেপেই থাকবে। আমরা দেখতে পাই—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, রিয়েলিজ্‌ম্ নামে পরিচিত যে বিশেষ প্রবণতাটি দেখা দিয়েছে, তাতে অনুকরণবাদই পুনর্জীবিত হয়েছে। চিত্রশিল্পী Gustave Courbet, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে চিত্রশিল্পীর উদ্দেশ্য কর্তব্য নির্দেশ করতে যেয়ে লিখেছেন—

> 'The art of painting should consist solely of the representation of objects visible and tangible to the artist ......I also hold that painting is essentially a concrete art and consists only of the representation of things real and existing. ···An abstract object, one which is invisible, non existent is outside the domain of painting.'

অর্থাৎ চিত্রশিল্পের উদ্দেশ্য যে বস্তু দেখা যায় এবং ধরা ছোঁয়া যায় সেই বস্তুর উপস্থাপনা, যে বস্তু সত্য ও বাস্তব সেই বস্তুর

উপস্থাপনা। অরূপ বস্তু, অদৃশ্য বস্তু এবং অবাস্তব বস্তু চিত্রশিল্পের আওতার বাইরে।

রিয়েলিস্ট পজিটিভিস্টরা শিল্পকে শুধু 'সমাজের দলিল' (social documentation) বলেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা বলেছেন—প্রুধোঁ প্রমুখ তত্ত্ববিদ্‌রা বলেছেন—শিল্পের মাধ্যমে সমাজের দলিল তৈরি করতে হবে সমাজের সমালোচনার জন্য—বর্তমান সমাজের ত্রুটিবিচ্যুতি সংশোধন করে নতুন ও আদর্শ সমাজ গঠন করবার জন্য। শুধু এখানেই নয় এই রিয়েলিজম্‌-এর আবেগ ঐকান্তিক হয়ে উনবিংশ শতাব্দীতেই চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে 'ইম্প্রেশানিজম্' (Impressionism) নামে যে নতুন এক 'ইজম্'-রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতেও অনুকরণবাদ একেবারে খণ্ডিত হয় নি। বাস্তবকে স্বরূপে প্রত্যক্ষ করতে যেয়ে এঁদের কেউ কেউ দেখলেন—বস্তুর ধরা বাঁধা রূপটি যথাযথভাবে আঁকতে পারলেই সৃষ্টি বাস্তব হয় না, আসল বাস্তবতা নিহিত থাকে বিষয়ীর চোখে বিষয়টি যেভাবে গৃহীত বা প্রতীয়মান হচ্ছে সেই ভাবটির মধ্যে—এক কথায় প্রতীতিরাজির (sense impression) মধ্যে—"the specific pattern of coloured surface shapes which is given fleetingly and never remains the same."—(ওস্‌বোর্ণ) এককথায় শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রতীতির (vision) মধ্যে। এঁদের সিদ্ধান্ত দাঁড়াল—যা দেখি তার চেয়ে যে-ভাবে দেখি সেই দেখার ভাবটিই বড় কথা এবং তার মধ্যেই আসল বাস্তবতা নিহিত। কিন্তু বস্তুর প্রতীতি এবং বস্তুর ধারণার উপরে বেশী ঝোঁক দেওয়ার ফল ফলতে দেরি হয় নি—বাস্তব হতে গিয়ে শিল্পীরা প্রতীতি-ধারণার তলে বস্তুরূপ হারিয়ে ফেললেন। বাস্তবতা-অবাস্তবতার সীমা-রেখা মুছে গেল। কারণ তখন বাস্তব হওয়ার লক্ষণই হোল রূপে অবাস্তব হয়ে উঠা। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে অবশ্যই একে অনুকরণবাদের পরাভব বলতে হবে—কিন্তু তলিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে—এ সব ক্ষেত্রেও অনুকরণ ব্যাপারটি একেবারে লোপ পায়নি। Pablo Picasso-র মতো শিল্পীরাও স্বীকার করেছেন—

"There is no abstract art, you must always start with something. Afterwards you can remove all traces of reality There is no danger then, anyway because the idea of the object will have left an indelible mark. It is what started the artist off, excited his ideas, and stirred up his emotions."

অর্থাৎ "নির্বিষয় শিল্প বলে কোন কিছু নেই ; নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আরম্ভ করতেই হবে। পরে অবশ্য বিষয় থেকে বাস্তবতার লক্ষণগুলি অপসারণ করতে পার। তখন আর কোন ভয় নেই, কারণ ততক্ষণে বিষয়ের ধারণা মনে স্থায়ী হয়ে বসে গেছে। বিষয়ই শিল্পীকে সৃষ্টি করার প্ররোচনা দেয়, তাঁর মনে ভাব ও আবেগ উদ্দীপিত করে।" লক্ষ্য করবার বিষয়—"idea of the object"-কে রেখা ও বর্ণের সাহায্যে ব্যক্ত করা চিত্রশিল্পীর কাজ—এই কথাই পিকাসো বলেছেন এবং এই কথার তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে বস্তুর ধারণা (আইডিয়া) "অনুরূপ বস্তু রূপ" সৃষ্টি শিল্পীর উদ্দেশ্য। Piet Mondrian-এর ভাষায় "Abstract art is therefore opposed to a natural representation of things. But it is not opposed to nature, as is generally thought."

এখন, বস্তুর প্রকৃতিকে বা ধারণাকে রূপ দেওয়া বা ব্যক্ত করাই যদি শিল্পীর উদ্দেশ্য হয়, তাহলে নিশ্চয়ই একথা বলা যায় যে শিল্পে প্রকাশ্য বিষয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য যতই মুছে ফেলার চেষ্টা করা হোক—যতই রূপকে কিম্ভূতকিমাকার করার চেষ্টা করা হোক বিষয়ের প্রকৃতি বা ধারণার সঙ্গে শিল্পিত রূপের আনুরূপ্য বা সঙ্গতি রাখতেই হবে। এই আনুরূপ্য রক্ষা বা সঙ্গতি রক্ষা ব্যাপারটি আর যাই হোক মূলতঃ অনুকরণাত্মক ক্রিয়াই। তারপর "সংকেতবাদ" গ্রহণ করলেও—অর্থাৎ শিল্পকে ভাবসঞ্চারের সংকেত (a form of symbolism used in the interest of communication between man and man) রূপে গণ্য করলেও অনুকরণবাদের আওতা থেকে একেবারে মুক্ত হওয়া যায় না। কারণ সহজেই

অনুমেয়। সংকেতের নিজের কোন মূল্য নেই। সংকেত প্রকাশের উপায়-বিশেষ। যে উদ্দেশ্যে সংকেত প্রযুক্ত হয় সেই উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সিদ্ধ হয়, সেই পরিমাণেই সংকেতের সার্থকতা। উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে সংকেতিত করতে পারা এবং স্বতন্ত্র কোন বিষয়কে রূপ দিতে বা অনুকৃত করতে পারা—মোটামুটি একই ব্যাপার। হ্যারলড ওসবোর্ণ মহাশয়ের ভাষায় বললে বলা যেতে পারে—

"In the context of a general theory of semantics it does then seem moderately sensible to say that both literary art and representational visual art are *mimetic*, both communicate experienced situations real or imaginal by means of symbols, literature mainly by means of conventional symbols and visual art mainly by natural symbols" Aesthetics & Criticism (Realism in Modern Dress—Art as Semantic—73).

কিন্তু আধুনিক সমালোচকদের কেউ কেউ অনুকরণবাদের অব্যাপ্তিদোষ দেখাতে যেয়ে, এই কথা বলেছেন যে, চিত্রের ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে অনুকরণবাদকে যদিও বা মানা যায়, এমন কি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যদিও বা সাধারণ অর্থে অনুকরণবাদকে স্বীকার করে নেওয়া যায়—দুটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সঙ্গীত ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে, বাস্তববাদ তথা অনুকরণবাদ অচল। বাস্তবিকই অনুকরণবাদকে যদি শিল্পের সব ক্ষেত্রে গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে 'বাদ' হিসাবে বাদ দেওয়াই উচিত। কারণ যে "বাদ" অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট, তা' কোনমতেই সংজ্ঞার মর্যাদা দাবী করতে পারে না। সুতরাং সঙ্গীত ও স্থাপত্যও অনুকরণাত্মক ব্যাপারের ফল—এ কথা প্রমাণ করতে না পারলে অনুকরণবাদকে ত্যাগ করা ছাড়া উপায় নেই। এঁরা যেমন বলতে চান—

"But neither music nor architecture is realistic either in the older or in the modern sense of the word."

তেমনি এ কথাও স্বীকার করতে চান না যে—

"music is a natural language of the emotions,

representing by natural symbols of sound that affective element in human experience…"

স্বর বা ধ্বনি দ্বারা আবেগের অনুকরণ করা বা আবেগের রূপকে সঙ্কেতিত করা সঙ্গীতের উদ্দেশ্য এই প্রাচীন ও প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে এঁদের বক্তব্য এই যে, প্রথমতঃ সঙ্গীতকে সাংকেতিক প্রকাশ বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ—"Music does not, except accidentally and incidentally, represent any actuality other than itself, either by natural or by conventional symbolism." অর্থাৎ সঙ্গীত নিজেকে ছাড়া অন্য কোন কিছুকে (ভাবাবেগকে) উপস্থাপিত করে না—বিশেষতঃ আধুনিক ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের অতিকৃত্রিম প্রথাসর্বস্ব জটিল গঠনের দিকে চেয়ে এ সিদ্ধান্ত খুবই স্বাভাবিক যে সঙ্গীতকে হৃদয়াবেগের সাংকেতিক প্রকাশ বা অনুকরণ বলা চলে না—সঙ্গীত অতি জটিল গঠন "abstract art" এবং তার একমাত্র আবেদন তার রূপের অন্তর্নিহিত নিরপেক্ষ সুষমা বা সৌন্দর্য। তারপর স্থাপত্যকে শিল্প বলে স্বীকার করলে—এ কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে স্থাপত্য বিশেষ ধরনের নির্মিতি বটে, কিন্তু কোন বাহ্য পদার্থের অনুকৃতি নয়—প্রত্যেকটি কর্মই নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির ফল—রূপকরণ বা অলংকরণ বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলন। সুতরাং স্থাপত্যে বা সঙ্গীতে বাস্তবতা খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল পরিশ্রম মাত্র। কারণ বাস্তবতা বিচার তখনই সম্ভব যখন শিল্পকে কোন বাস্তব বস্তুর—সে বস্তু অন্তরের বা বাইরের—অথবা সরূপ বা অরূপ যা ই হোক না কেন—অনুকরণ বলে স্বীকার করা হয়। যা তেমন কোন কিছুরই সাপেক্ষ নয়, যা প্রতিরূপ বা অনুরূপ কোন কিছুই নয়—সম্পূর্ণ নতুন রূপ তার আবার বাস্তবতা কি ?

আসলে, অনুকরণবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ আসছে তাঁদের কাছ থেকেই, যাঁরা নতুন নতুন রূপ উদ্ভাবনা করে কল্পনাবৃত্তির চাহিদা মেটানোকেই শিল্পের একমাত্র প্রেরণা বলে মনে

করেছেন এবং রূপের বিষয় নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার করেছেন—শিল্পকে পরিবেশ নিরপেক্ষ 'অবস্তু বস্তু' কিঞ্চন'—হিসাবে গণ্য করেছেন। এই সম্প্রদায়ই কলাকৈবল্যবাদের পৃষ্ঠপোষক এবং বাস্তবতাবাদ বা "যথাস্থিতবাদের" (Realism) বিরোধী। বলা বাহুল্য হলেও এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে চাই যে, 'কলাকৈবল্যবাদ' এবং বাস্তবতাবাদ উল্লিখিত দু'টি প্রবৃত্তিরই বিশেষ চাহিদা রূপে প্রচলিত হয়েছে। যাঁরা শিল্পকে পরিস্থিত বিষয়ের প্রকাশ অর্থাৎ প্রতিরূপ বা অনুরূপ রচনা বলে মনে করেন, তাঁরা শিল্পের রূপোৎকর্ষ বিচারের কালে বাস্তবতা দাবী করে থাকেন আর যাঁরা নিছক কল্পনাবাদী—নিছক রীতিবাদী, তাঁরা শিল্প বিচারে রূপের কলাকৌশল ছাড়া অন্য কিছুরই মূল্য স্বীকার করেন না—তাঁরাই কলাকৈবল্যবাদী। এও লক্ষণীয় প্রথম মনোভঙ্গীর সঙ্গে অনুকরণবাদের নিগূঢ় যোগ রয়েছে এবং অনুকরণবাদের সংস্কার থেকেই বাস্তবতার বা বাস্তবিকতার চাহিদা দেখা দিয়ে থাকে।

অনুকরণবাদের পক্ষে এবং বিপক্ষে কি কি বলার আছে—এখানে বলা হল। অনুকরণের ব্যাপক অর্থের গণ্ডী কতদূর সম্প্রসারিত, তার দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। এখন অনুকরণবাদের সমালোচনা করতে ক্রোচে যা' লিখেছেন সেইটুকু উদ্ধৃত করেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি—

> "One of the scientifically legitimate meanings occurs when 'imitation' is understood as representation or intuition of nature—a form of knowledge. And when the phrase is used with this intention, and in order to emphasize the spiritual character of the process, another proposition becomes legitimate also: namely that art is the idealization or idealizing imitation of nature."
>
> (Theory of Aesthetics p. 16)

প্লেটো অ্যারিস্টটলের গ্রন্থরাজি মনোযোগসহকারে পাঠ করলে—অবশ্যই এই ধরনের কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে, দেখা যাবে

'অনুকরণ' শব্দটিকে তাঁরা 'idealizing imitation of nature' অর্থেই ব্যবহার করেছিলেন। অ্যারিস্টটলের 'পোয়েটিকস্'-গ্রন্থে এমন একাধিক মন্তব্য পাওয়া যায়, যাদের উপরে নির্ভর করে অবাধেই এ কথা বলা চলে যে—প্লেটো বা তাঁর শিষ্য অ্যারিস্টটল 'অনুকরণ' বলতে বিষয়ের যান্ত্রিক উপস্থাপনা বুঝেন নি, নতুন কিছু উদ্ভাবনা ও পরিকল্পনা করতে যে মানসিক প্রক্রিয়া আবশ্যক, 'অনুকরণ'-শব্দটির তাৎপর্য সেই পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত। আগেই বলা হয়েছে—যে পর্যন্ত আমরা জ্ঞানকে বিষয়সাপেক্ষ বলে স্বীকার করব—প্রকাশ-ব্যাপারকে প্রকাশ্য-বিষয়বস্তুর অধীন বলে মনে করব,—যে পর্যন্ত বিষয় নিরপেক্ষ রূপ বা নির্বিষয় রূপের স্বয়ংসিদ্ধ মহিমা বা মূল্য স্বীকার না করব—শিল্পসৃষ্টি ব্যাপারটিকে 'কল্পনার খেলা' ছাড়া অন্য কিছু মনে করব, সে-পর্যন্ত অনুকরণবাদের গণ্ডী অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

শিল্পে—'সৌন্দর্যবাদ'

শিল্পতত্ত্বে সৌন্দর্যবাদের প্রতিষ্ঠা যে কতখানি, সামান্য একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বুঝতে পারা যায়—দৃষ্টান্ত স্বয়ং শিল্পতত্ত্বের সংজ্ঞাটিই। 'ঈস্থেটিক'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে অধিকাংশ শিল্পদার্শনিকই বলেছেন—ঈস্থেটিক হচ্ছে—'science of beauty'—সৌন্দর্য-বিজ্ঞান। এই সিদ্ধান্তকে সত্য বলে স্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই স্বীকার করতে হয়—শিল্পের স্বরূপ-লক্ষণ হচ্ছে 'সৌন্দর্য'—শিল্পীর উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি করা—সুন্দর সুন্দর রূপ রচনা করা। স্বীকার করতে হয়—পদার্থহিসাবে সৌন্দর্যের স্বতন্ত্র বা পরমার্থিক কোনো সত্তা আছে। এবং সৌন্দর্যবোধ বলে স্বতন্ত্র একটি বোধ বা বৃত্তি মানুষের মধ্যে বর্তমান। যেমন এ কথা সত্য—এতগুলি স্বীকৃতির উপরেই সৌন্দর্যবাদ দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি এও সত্য—অনেকেই সৌন্দর্যবাদকে সম্মান ও সমাদর করে থাকেন; কিন্তু আরো সত্য এই কথাটি যে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বা স্বরূপ নির্ধারণে আজও কোনোরূপ ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। আর তা হয় নি বলেই সৌন্দর্যবাদ অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ ও খণ্ডিত। একাধিক প্রবণতায় অপরিচ্ছিন্ন। এ কারণেই, শিল্পীর কাজ 'সৌন্দর্য'-সৃষ্টি করা—এ কথা বললে নির্দিষ্টভাবে কিছুই বুঝায় না—ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন কথা বুঝে থাকেন। তাই—১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে-লেখা সৌন্দর্যতত্ত্বের গ্রন্থের ভূমিকাতেও লেখা হয়—

…"Understanding of what beauty is has not advanced. We have a voluminous and growing literature of aesthetics to day but no more sound sense and certainly much more nonsense is spoken and written about the beautiful than in the age when Plato lived."

(Theory of Beauty—Osborne.)

যাঁরাই সৌন্দর্যের স্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাঁরাই এই ধরনের কথা বলেছেন এবং এখনও কেউ "এহ বাহ্যের" গণ্ডি ছাড়িয়ে "আগে কহ"-র উত্তর দিতে—আর কিছু বলতে এগিয়ে আসছেন না। সকলেরই মুখে এক কথা—সৌন্দর্যের সংজ্ঞা সুনির্ধারিত হয় নি; সৌন্দর্যের স্বরূপ নিয়ে বাদবিসংবাদের অন্ত নেই।

অন্ত নেই-ই বটে। "দি ফাউণ্ডেশানস্ অফ ঈস্থেটিকস্"-গ্রন্থে (১৯২২), (সি. কে. ওগডেন, আই. এ. রিচার্ড এবং জেমস্ উড-রচিত) সৌন্দর্যের ১৬ প্রকার সংজ্ঞার যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে তার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেই সৌন্দর্যের নানা বাদ-বিসংবাদের স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারা যাবে। তাদের অনুসরণে হ্যারোল্ড ওসবোর্ন মহাশয়ও সংজ্ঞাগুলির নৈয়ায়িক শ্রেণীবিভাগ (logical classification) করতে চেস্টা করেছেন। সেই শ্রেণী-বিভাগের তালিকাটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি এবং যে অভিপ্রায়ে করছি তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই।

1. Metaphysical
2. Mixed Metaphysical
3. Objective Non-Relational—(I & II) Subdivisions
4. Subjective Relational— (I & II) ,,
5. Combined Subjective Objective
6. Objective Relational—(I—VI) ,,

এবার উল্লিখিত শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক। আশা করি, শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়ার পরে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিরূপণের মূল সমস্যাটি পাঠকরা নিজেরাই উপলব্ধি করতে পারবেন।

(১) সৌন্দর্যের পরাতত্ত্ব-ভিত্তিক সংজ্ঞা

এই শ্রেণীর মধ্যে সেই সব সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যাদের মধ্যে পরম কোনো দৈবসত্তার স্বরূপের ভিত্তিতে সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। এ পরম সত্তাকে ঈশ্বরই বলা হোক আর

ব্রহ্মই বলা হোক, সৌন্দর্যকে যেখানেই ঐ অনির্বচনীয়স্বরূপ পরম সত্তার বিশেষ অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে, সেখানেই এই শ্রেণীর সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে। যেমন, প্লটিনাস যখন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে বলেন—"A beautiful material thing is produced by participation in reason issuing from the divine," বোমগার্টেন যখন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে—'পরমসত্তাকে (Absolute) ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা'—এই মন্তব্য করেন, হেগেল বলেন—"Absolute in sensuous existence"—সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ, বা কেউ কেউ যখন বলেন সৌন্দয হচ্ছে পরম সত্য-শিব-সুন্দরের সাকার প্রকাশ, রস-রূপ, তখন তাঁরা সৌন্দর্যের সংজ্ঞা পরাতত্ত্বের ভিত্তিতেই নিরূপণ করে থাকেন—সৌন্দযকে কোনো পরম ও নিত্য সত্তার অন্যতম স্বরূপ বলেই গণ্য করেন।

(২) মিশ্র-পরাতত্ত্ব-ভিত্তিক সংজ্ঞা

এই সব সংজ্ঞা আপাতদৃষ্টিতে মনস্তত্ত্বমূলক বা বিষয়-কেন্দ্রিক বলে মনে হলেও পরাতত্ত্বের ধারণা এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে।

এদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে—(ক) একশ্রেণীর সংজ্ঞায় পারমার্থিক কোনো নৈতিক মূল্যের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। (খ) অন্য শ্রেণীর সংজ্ঞায় এই কথাই বলা হয় যে, কোনো বস্তু সেই অনুপাতেই সুন্দর হয় যে পরিমাণে সে বস্তুরূপের অতীত কোনো পারমার্থিক সত্তাকে অনুকরণ বা প্রকাশ করে।

প্রথম শ্রেণী সৌন্দর্যকে পারমার্থিক সত্তাসম্পন্ন কোনো মহামূল্য অর্থাৎ সত্য-শিব-সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত করে দেখে থাকে। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে—এরা সৌন্দর্যের যে সংজ্ঞা দিচ্ছেন সেই সংজ্ঞাটি হয়ত মনস্তত্ত্বভিত্তিক, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে তার সঙ্গে পারমার্থিক মূল্যের চেতনা জড়িয়ে আছে। সুন্দরের সংজ্ঞা দিতে যখন এ কথা বলা হয় যে—সুন্দর হচ্ছে তাই যা

আমাদের মধ্যে 'lofty emotion'—'মহৎ আবেগ' জাগিয়ে দেয় অথবা এ কথা বলা হয় যে—মহৎ মূল্যের প্রতিভান না হলে, সৌন্দর্য নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তখন 'মহৎ আবেগ' এবং 'মহৎ মূল্য' প্রভৃতিকে পারমার্থিক বলেই মনে করা হয়। "Ozenfant"—যখন সৌন্দর্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লেখেন—

> "Beauty, one of man's essential yearnings, is the feeling of being raised up." (Foundations of Modern Art.)

তখন 'lofty emotion'-কে পরমার্থতঃ সত্য বলেই স্বীকার করেন। Clutton-Brock যখন লেখেন—"Art is the expression of a certain attitude towards reality, an attitude of wonder and value, a recognition of something greater than man…" তখনও নৈর্ব্যক্তিক 'greater than man'—নামক পারমার্থিক পদার্থকে স্বীকার করেন। তারপর —শিল্পকে যাঁরা অলৌকিক প্রতিভার দান বা সৃষ্টি বলে মনে করেন, মনে করেন—প্রতিভা হচ্ছে "exceptional sensitivity to values"—মহামূল্য বিষয়ে অসাধারণ স্পর্শকাতরতা, মনে করেন শিল্পীর উদ্দেশ্য শিল্পের সাহায্যে মানুষের কাছে মহৎ মূল্য-চেতনাকে প্রকাশ করা, তাঁরাও মূলতঃ পরাতত্ত্বের রহস্যলোকের নাগরিক।

(৩) বিষয়ী-নিরপেক্ষ, বিষয়নিষ্ঠ সংজ্ঞা
(Non-relational objective)

(ক) যে বস্তুতে 'সৌন্দর্য' নামক অবিশ্লেষনীয় গুণ বা ধর্ম থাকে সেই বস্তুই সুন্দর। বলা বাহুল্য এই সংজ্ঞাকে সংজ্ঞার মর্যাদা দিলে সংজ্ঞা নিরূপণের চেয়ে সহজ কাজ আর কিছুই থাকে না। সৌন্দর্য থাকলে বস্তু সুন্দর হয়—একথা শুনে আমাদের সৌন্দর্য জ্ঞান এক বিন্দুও বৃদ্ধি পায় না। যা অনির্বচনীয় ধর্ম তা' শুধুমাত্র অনুভবগম্যই, তা' বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

(খ) যে বস্তুর বিশিষ্ট আকৃতি (specific objective

structure) বা রূপ আছে সেই বস্তুই সুন্দর। এই সংজ্ঞায় রূপ-বৈশিষ্ট্যকে অর্থাৎ আকৃতিগত বিশিষ্ট বিন্যাসকে সৌন্দর্যের বৈশেষিক লক্ষণ বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু বিন্যাস কিরূপ হলে সুন্দর হবে, কিরূপ হলে অসুন্দর হবে এবং কেনই বা তা' হবে এ সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। যাঁরা এই মত পোষণ করেন—আকৃতির রূপের নিরপেক্ষ আবেদন-মূল্য স্বীকার করেন—যাঁদের কাছে—"Art is configuration"—তাঁরা ঐ সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না। এখানেও সৌন্দর্য অনির্বচনীয়।

(৪) সাপেক্ষ বিষয়ী-আশ্রয়ী সংজ্ঞা
(Subjective Relational)

(ক) বিষয়ীর মনে যে বিষয় আনন্দ বা আবেগ উদ্রেক করে তাই সুন্দর। এখানে সৌন্দর্য বিষয়ীর আনন্দবোধ বা ভাবাবেগের উপরে নির্ভরশীল, অর্থাৎ সৌন্দর্যের আনন্দ বা আবেগ নিরপেক্ষ কোন সত্তা নেই।

(খ) যে বস্তু আমাদের মনে বিলক্ষণ একটি ভাব জাগায়—unique 'aesthetic emotion', empathy, synaesthesis—প্রভৃতি সৃষ্টি করে, সেই বস্তুই সুন্দর। এখানেও সৌন্দর্য ভাবাবেগ সাপেক্ষ। তবে 'ক' থেকে 'খ'-এর পার্থক্য এই যে 'খ'-এ যে ভাবাবেগের কথা বলা হয়েছে তা' সাধারণ ভাবাবেগ বা আনন্দ নয়, তা' সাধারণ ভাবাবেগ থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র আবেগ—শৈল্পিক আবেগ,—তন্ময়ীভবনের আবেগ।

(৫) বিষয়ী ও বিষয়-সাপেক্ষ সংজ্ঞা

যে বস্তু বিষয়ীর মনে বিলক্ষণ একটি মানসিক অবস্থা বা ভাব জাগাতে সক্ষম এবং নিজেও বিশিষ্ট রূপের অধিকারী সেই বস্তুই সুন্দর। সংজ্ঞার প্রথমাংশে সৌন্দর্যের বিষয়িসাপেক্ষত্ব এবং দ্বিতীয়াংশে বিষয়নিহিতত্ব—অর্থাৎ যুগপৎ বিষয়ী—বিষয় সাপেক্ষত্ব

নির্দেশ করা হয়েছে। আসল কথা এই সৌন্দর্য একদিকে যেমন ভাবসাপেক্ষ, অন্য দিকে তেমনি রূপবৈশিষ্ট্য নির্ভর।

(২) সাপেক্ষ বিষয়নির্ভর সংজ্ঞা

(ক) যা' সুনীতি-বর্ধক তা'ই সুন্দর।

(খ) যা' সামাজিক হিত সাধন করে তা'ই সুন্দর।

(গ) যা' বিশেষ উপায়ে প্রকাশের বা ভাব-বিনিময়ের প্রয়োজন সিদ্ধ করে তা'ই সুন্দর।

(ঘ) যা' প্রতিভার প্রকাশ তা'ই সুন্দর।

(ঙ) যা' প্রকৃতির অনুকরণ তা'ই সুন্দর।

(চ) যা' প্রকাশ মাধ্যমের বা উপাদানের সুপ্রয়োগের ফল তা'ই সুন্দর।

উল্লিখিত মতবাদগুলির দিকে চেয়ে নিশ্চয়ই আমাদের মনে এ কথাটি জাগছে—'শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দয সৃষ্টি করা' এ কথা বললে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলা হয় না। কারণ, বক্তা সৌন্দর্যের কোন সংজ্ঞাটি মানছেন তা না জানা পর্যন্ত কিছুই বিশেষভাবে জানা হয় না।

বক্তা অধ্যাত্মবাদীই হোন আর বস্তুবাদীই হোন, যতক্ষণ না তিনি তাঁর দার্শনিক সংস্কার এবং তার ধারণা আমাদের জানাচ্ছেন ততক্ষণ আমরা কোন লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারিনে। অর্থাৎ 'সৌন্দর্য' শব্দটি আমাদের মনে তদনুপাতী কোন বিশেষ বস্তুর ধারণা জাগায় না। এ এক মহা সমস্যা এবং আজও এ সমস্যার কোন অবিসংবাদিত সমাধান ঘটে নি। আজও অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টিকোণের বিলোপ ঘটে নি এবং অধ্যাত্মবাদী ও বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণের মধ্যে সমান ব্যবধান বর্তমান। আজও অধ্যাত্মবাদীরা 'সৌন্দর্য'কে পরম সত্তার কান্তি বা বিভা রূপেই গণ্য করে থাকেন—বলেন 'তস্য ভাসা অনুভাতি সর্ব্বম্'। সৌন্দর্য—পরম সত্তারই অনুভা, দিব্য বিভা। কিন্তু যাঁরা

সৌন্দর্যকে এই ধরনের দিব্য বিভা বা পরম সত্তার অনুভা বলে মনে করেন না, তাঁরাও সৌন্দর্যের স্বরূপ সম্বন্ধে একমত হতে পারেন নি। সেখানেও বহু বাদ-বিসংবাদ রয়েছে। সেই সব বাদ-বিসংবাদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই বলে এখানে আমি শুধু তাদের মুখ্য প্রবৃত্তিগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এদের মধ্যে এমন একদল আছেন যারা মনে করেন—সৌন্দর্য আনন্দেরই সাকার মূর্তি—মূর্তিমান আনন্দ।—'যাহা আনন্দ দেয় তাহাই সুন্দর' —"anything is beautiful which causes pleasure"। শেষোক্ত ইংরাজিতে-লেখা বাক্যটিকে, কোন কোন সমালোচক বলতে চেয়েছেন—তিনটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রথম অর্থ এই—যা' আনন্দদায়ক তা'ই সুন্দর, অর্থাৎ আনন্দ ও সৌন্দর্য সমার্থক।

দ্বিতীয়তঃ, 'যা আনন্দদায়ক তা'ই সুন্দর'—এ কথাটির অর্থ এই যে উভয়ের মধ্যে একটা অবিনাভাব সম্বন্ধ রয়েছে—প্রত্যেক আনন্দদায়ক বস্তু সেই পরিমাণেই সুন্দর হয় যে পরিমাণে তা আনন্দদায়ক হয় এবং প্রত্যেক সুন্দর বস্তু সেই পরিমাণেই আনন্দদায়ক যে পরিমাণে তা সুন্দর হয়। এখানে আনন্দ ও সৌন্দর্য সমার্থক না হলেও আনন্দের মাত্রার উপরেই যে সৌন্দর্যের মাত্রা নির্ভর করছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হলেও আনন্দ ও সৌন্দর্য দুটি ভিন্ন সামগ্রী। আনন্দকে জানলেই সৌন্দর্যকে চেনা হয় না।

তৃতীয়তঃ—'যা আনন্দ দেয় তা সুন্দর' বলতে এ অর্থ বুঝায় না যে আনন্দদায়ক বস্তু মাত্রই সুন্দর,—বরং এই অর্থ-ই বুঝায় যে যা সুন্দর তা আনন্দদায়ক হতে বাধ্য। বলা বাহুল্য, এই অর্থের সঙ্গে প্রথম অর্থের কোন সঙ্গতি নেই এবং এতে সৌন্দর্যের সংজ্ঞা বা স্বরূপ কোনটিই ধরা পড়ে না।

'আনন্দ'কে বিশেষিত করতে, কেউ কেউ বলে থাকেন সৌন্দর্য হচ্ছে বিশেষ জাতের আনন্দ রূপ-কামনাজনিত আনন্দ-রূপসম্ভোগ-

জনিত আবেগ। যে বস্তুর রূপের মধ্যে ঐ বিশেষ আবেগ বা আনন্দ জাগানোর ক্ষমতা থাকে তাকে আমরা সুন্দর বলে থাকি। এই আনন্দের মানসিক ভিত্তি হচ্ছে রূপ-সম্ভোগের স্বতন্ত্র বাসনা-বন্ধ। এ বাসনা যে পরিমাণে চরিতার্থ হয় সেই পরিমাণে ঐ বিশেষ জাতীয় আনন্দ জাগে এবং যে রূপ সত্য এরূপ আনন্দ জাগাতে পারে সেই রূপ তত সুন্দর। সৌন্দর্য এখানে রূপজ-আনন্দেরই বিশেষাকার অভিব্যক্তি।

এখানেও সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত আনন্দবোধ সাপেক্ষ—যদি'ও এ আনন্দ কোন জৈবিক বা সামাজিক বাসনার পরিপূরণজনিত আনন্দ নয়, এ আনন্দ—রূপ সম্ভোগজনিত সংবিদ আনন্দ—শৈল্পিক আনন্দ এখানেও স্বীকার করা হচ্ছে সৌন্দযের পরিমাণ আনন্দেব পরিমাণের উপর নির্ভরশীল এবং আনন্দ উপেয় আর রূপ সমর্থ উপায় হযেই সুন্দর আখ্যা পেযে থাকে।

এই মতবাদ থেকে এক ধাপ এগিয়ে গেলেই আমরা রূপবাদীদের কল্পনাবাদ বা প্রতিভানবাদেব এলেকায় উপস্থিত হব। এই সম্প্রদায় পূর্বোক্ত আনন্দ-বন্ধ একেবারে অস্বীকার না করলেও, আনন্দ আবেগকেই সৌন্দর্যের মান হিসাবে গ্রহণ করেন না। সৌন্দর্যকে এঁরা কল্পনারই উৎকর্ষ-লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেন। সৌন্দর্য এঁদের কাছে ভোগ্য বস্তু নয়, ভাব্য বস্তু।—রূপ-কল্পনারই উৎকর্ষ। এঁদের মতে, সৌন্দর্যের পবিমাণ বিচার আনন্দের পরিমাণ বিচারের দ্বারা সম্ভব নয়, একমাত্র কল্পিত রূপের পরাদর্শের প্রতিভান বা ধ্যানের দ্বারাই সৌন্দর্যবিচার সম্ভব। যা যত রূপায়িত তা তত সুন্দব। বলা বাহুল্য রূপের পরাদর্শের (আরকিটাইপ) অনুসারে সৌন্দর্য বিচার করতে যাওয়া, আসলে কল্পনাবাদের বা প্রতিভানবাদের আবরণে গা-ঢাকা দিয়ে ভাববাদী শিবিরেরই অন্যতম একটি কক্ষে প্রবেশ করা। যেখানে পরারূপের প্রতিভান ছাড়া সৌন্দর্যের বিচার সম্ভব নয়, সেখান থেকে ভাবের পরাদর্শের স্তর সামান্য একটু উপরেই—বোধির বা প্রতিভানের স্তর পেরিয়ে গেলেই বুদ্ধির স্তর—আইডিয়ার স্তর।

সৌন্দর্যকে আনন্দের ভিত্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে নিছক ভাবনার ভিত্তির উপরে যাঁরা দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা শেষ পর্যন্ত আদর্শ কল্পরূপের ভাবনাকে অথবা ভাবের আদর্শরূপের ভাবনাকে (আইডিয়া) ভিত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন। শিল্পতত্ত্বশাস্ত্রে প্রথমটি আখ্যা পেয়েছে—"Expressionist theory of beauty" দ্বিতীয়টির আখ্যা হয়েছে—"Intellectualist theory of beauty"। প্রথমটি শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ নিরূপণ করতে, রূপকল্পনাকেই কৈবল্য বলে মনে করেন এবং রূপের সৌন্দয নির্ধারণে "রূপের পরাদর্শ"কে মান হিসাবে গ্রহণ করেন। এঁদের কাছে একটি শিল্পধর্ম সেই অনুপাতেই সুন্দর যে অনুপাতে তা প্রকাশিত (expressed), যে অনুপাতে ঐ প্রকাশে বা রূপে রূপের সার্বজনীন আদর্শটি উদভাসিত। 'রূপের সার্বজনীন আদর্শ'টি মনের মধ্যে অভিজ্ঞতার ফলে গড়ে উঠে অথবা সহজ সংস্কার রূপেই চৈতন্যের মধ্যে থাকে?—এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে যাঁরা অভিজ্ঞতাকেই নিমিত্ত কারণ হিসাবে গণ্য করেন তাঁরা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই "সার্বজনান আদর্শ"-এর ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন; আর যাঁরা আত্মার রহস্যময় স্বভাবকে ঐ আদর্শের উৎস বলে মনে করেন তাঁরা বাহ্যতঃ কল্পনাবাদী হলেও শেষ পযন্ত অধ্যাত্মবাদী পরাতত্ত্বেরই পৃষ্ঠপোষক। দ্বিতীয়টি সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মতে—প্রত্যেকটি বিশেষ বিশেষ রূপ অর্থাৎ শিল্পকর্ম বিশেষ বিশেষ আইডিয়ারই আকৃতি। রূপকর্ম সেই পরিমাণে সুন্দর যে অনুপাতে তা ঐ আইডিয়াকে আকৃতি দান করতে পারে। 'আইডিয়া'কে যাঁরা "a priori" বলে মনে করেন—অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ এবং পারমার্থিক সত্তা হিসাবে স্বীকার করেন, তাঁরা পরাতত্ত্ববাদী আর যারা 'আইডিয়া'কে 'a posteriori' অর্থাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয় বলে মনে করেন, মনে করেন বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ ঘটার ফলে বিষয়ীর মনে বিষয়াকারা প্রতীতি (percept) জন্মে এবং সেই সব প্রতীতি থেকে বুদ্ধির যোগে সংজ্ঞার (concept) সৃষ্টি হয় তাঁরা শিল্পতত্ত্ব শাস্ত্রে বুদ্ধিবাদী বটে, কিন্তু মূলে পরাতত্ত্ব

বিরোধী। কারণ চিন্তা, কল্পনা, আনন্দ, সৌন্দর্য সব কিছুকেই এঁরা বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কের ফল রূপে ব্যাখ্যা করতে চান—কোন মূল্যকেই (values) এরা পারমার্থিক সত্তা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সে যাই হোক—আসল কথা দাঁড়াচ্ছে এই যে (ক) বুদ্ধিবাদীদের কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে আইডিয়া নির্ভর। (খ) কল্পনা বা প্রতিভানবাদীর কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে—রূপের পূর্ণ আদর্শ-সাপেক্ষ এবং (গ) আনন্দবাদীর কাছে সৌন্দর্য হচ্ছে আনন্দ-ভিত্তিক। তবে এই কয়েকটি মতবাদেই বৃত্তটি পরিসমাপ্ত নয়। শিল্পকে তো শুধু আইডিয়ার অনুকরণ বা আদর্শ রূপের প্রতিভান বা আনন্দের রূপ রচনা বলেই মনে করা হয় নি। আইডিয়া বা বুদ্ধিবাদ, কল্পনাবাদ এবং আনন্দবাদের পাশেই—ভাববাদ বা আবেগবাদ (feelings or emotions) দাঁড়িয়ে আছে। এই সম্প্রদায়ের মতে শিল্প হচ্ছে 'ভাবের রূপ' (expression of feelings or emotions)—এবং সৌন্দর্য হচ্ছে ভাবেরই সার্থক অভিব্যক্তি, এক কথায় ভাবাবেগ-সাপেক্ষ একটি বিশেষ বোধ।

এঁদের মতে, যেহেতু ভাবই রূপের মধ্যে অঙ্গ লাভ করে—সেই রূপটিই বেশী সুন্দর যে রূপটির মধ্যে বেশী মাত্রায় এবং সুষ্ঠু রূপে আবেগ প্রকাশিত হয়। যা যত বেশী আবেগ-ব্যঞ্জক তা তত বেশী সুন্দর। আবেগই রূপের আকারে আত্মপ্রকাশ করে—সুতরাং আবেগের প্রকাশ ও সৌন্দর্য "not two ideas but one"—অভিন্ন। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও সৌন্দর্য নিরপেক্ষ কোন কিছু নয় সৌন্দর্য ভাবাবেগ-সাপেক্ষ।

আমরা দেখলাম, কোনক্ষেত্রে সৌন্দর্য আইডিয়া-সাপেক্ষ, কোন ক্ষেত্রে রূপের পরাদর্শ-সাপেক্ষ, কোন ক্ষেত্রে আনন্দ-সাপেক্ষ, কোন ক্ষেত্রে ভাবাবেগ-সাপেক্ষ এবং কোন ক্ষেত্রেই—শুধু দ্বিতীয়টি ছাড়া—ব্যক্তির ভাব-ভাবনা নিরপেক্ষ নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সৌন্দর্যকে রূপ-সাপেক্ষ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা করার অর্থ—রূপকে রূপ-সাপেক্ষ করা—অর্থাৎ সৌন্দর্যকে ব্যক্তিনিরপেক্ষ করবার চেষ্টা

করা। সৌন্দর্যকে এইভাবে রূপ-বিশিষ্টতায় (significant form) পরিণত করবার চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁরা 'বিশিষ্টতা'র কারণ সম্যক ব্যাখ্যা করতে না পারলেও, উপাদান বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ বিশেষ ধরনের 'configuration' ছাড়া অন্য কোন মান স্বীকার করেন না—সৌন্দর্য এঁদের কাছে রূপের—"রিদম্" এবং "হারমনি"—রূপের অন্তর্নিহিত সুষমা বা স্বকীয় ব্যঞ্জনা শক্তি। এঁরা বলেন—আইডিয়ার সৃষ্ঠু আধার বা বাহন হয় বলেই, অথবা রূপের সার্বজনীন আদর্শকে ধারণ করে বলেই, অথবা আনন্দকে ব্যক্ত করে বলেই অথবা আবেগকে রূপ দান করে বলেই যে বস্তুরূপ সুন্দর হয় তা নয়, সৌন্দর্য রূপেরই স্বকীয় ধর্ম এবং নিরপেক্ষ ধর্ম। উপাদানের বিশিষ্ট বিন্যাস ঘটলেই সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। শিল্পীর কাজ—এঁরা বলেন—উপাদানকে বিচিত্রভাবে বিন্যাস করা তথা সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলা এবং যে শিল্পী যত বিচিত্র বিন্যাস বা ভঙ্গিমা সৃষ্টি করতে পারেন তিনি তত কুশলী। এঁদের কাছে শিল্পের বিচার কেবল মাত্র রূপ-বিশিষ্টতারই বিচার।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা এ কথাটি বলতে পারি যে—সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিয়ে যেখানে এত বাদবিসংবাদ সেখানে সৌন্দর্যকে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বললে নিশ্চয়ই নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয় না। শব্দটি এত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে আজ প্রায় অর্থহারা হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ—সৌন্দর্য কথাটা বললে এক এক জনে এক এক রকম অর্থ বুঝেন। এই কারণে শিল্পতত্ত্বশাস্ত্রীরা শব্দটির উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছেন এবং কেউ কেউ বর্জন করার প্রস্তাবও উত্থাপন করেছেন—গোড়াতেই বলেছি শিল্পতত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব নামে বহু প্রচলিত হলেও অনেকেই শিল্পতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্বকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন নি। ক্রোচে প্রভৃতির কাছে শিল্পতত্ত্ব হচ্ছে—প্রতিভানতত্ত্ব—প্রকাশতত্ত্ব (Science of Expression)। এরা বলতে চান যে 'সৌন্দর্য' যেহেতু অনির্দিষ্টার্থক নির্দিষ্ট লক্ষণ বা ধর্ম উল্লেখ করেই শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করা উচিত। যেমন প্লেটো এরিস্টটল—শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ

করেছেন "মাইমেসিস" বা রূপরচনা, কেউ করেছেন "আনন্দ" (আনন্দ ও সৌন্দর্যের মত অনির্দিষ্টার্থক), কেউ করেছেন—"ভাবাবেগ" (feeling) ক্রোচে করেছেন প্রতিভান বা প্রকাশ (intuition or expression)। বাস্তবিকই, সৌন্দর্যকে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ করলে কথা উঠবে না শুধু তখনই যখন সৌন্দর্যের একটি অবিসংবাদিত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হবে।

শিল্পতত্ত্বে—আনন্দবাদ

সৌন্দর্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে প্রসঙ্গতঃ আনন্দবাদ সম্বন্ধেও সামান্য আলোচনা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে দেখানো হয়েছে যে, যা আনন্দ দেয় তাই সুন্দর—এই সংজ্ঞা মানলে অর্থাৎ সৌন্দর্য ও আনন্দকে সমার্থক বলে মনে করলে—শিল্পের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করা—এ সিদ্ধান্ত করার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই বলা হয় যে শিল্পের উদ্দেশ্য আনন্দ সৃষ্টি করা—আনন্দজনক রূপ রচনা করা। যা' আনন্দ দেয় তাই সুন্দর—এ কথা বললে আসলে এই কথাই স্বীকার করা হয় যে মানুষের স্বভাবে আনন্দ হচ্ছে অন্যতম মৌলিক প্রবৃত্তি এবং ঐ প্রবৃত্তির প্রেরণাতেই মানুষ যা সৃষ্টি করে তার নাম শিল্প এবং ঐ প্রবৃত্তিকেই যা চরিতার্থ করে তাকেই আমরা সুন্দর বলি। আনন্দবাদী বলেন—আনন্দ দেওয়ার এবং আনন্দ পাওয়ার জন্য মানুষের মধ্যে একটা সহজ বাসনা রয়েছে। এই বাসনারই প্রেরণাতে মানুষ শিল্প সৃষ্টি করে এবং সামাজিকের ঐ বাসনা চরিতার্থ করেই শিল্প সার্থক ও সুন্দর বলে সম্মানিত হয়। শিল্প বাহ্যত রচনা বিশেষ বটে কিন্তু স্বরূপতঃ আনন্দজনক সংকেত। রচনা তার শরীর আনন্দজনকত্ব তার প্রাণ। আপাতদৃষ্টিতে শিল্প সৃষ্টি প্রকাশ ব্যাপার বলে মনে হলেও, আসলে তা সাধারণ প্রকাশ ব্যাপার নয়—আনন্দকেই প্রকাশ করার চেষ্টা। প্রকাশের ইচ্ছার পিছনে রয়েছে আনন্দকে প্রকাশ করার ইচ্ছা, আনন্দকে সঞ্চার করার কামনা এবং শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য সামাজিকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করা।

আনন্দবাদ সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করার আগে এই কথাটি পাঠককে স্মরণ করাতে চাই যে—শিল্পতত্ত্বে আনন্দবাদ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তা অকারণে নয়। সব 'বাদ' বাদ দিয়েই দেখা যায়—

প্রথমতঃ শিল্প একটি বিশিষ্ট কৃতি বা নির্মিতি, দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক নির্মিতিরই বিশিষ্ট রূপ থাকে বলে, শিল্পের রূপগত উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অর্থাৎ শিল্পের উৎকর্ষ-লক্ষণ বা সৌন্দর্য বিচার করার কথা উঠে, এবং তৃতীয়তঃ শিল্প যেহেতু সামাজিক মানুষেরই নির্মিতি, সামাজিকেরই কাছে শিল্পের সমাদর বা অনাদর হয়। সামাজিক যে শিল্পকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন, যে শিল্পকে আস্বাদন করে আনন্দিত হন, সেই শিল্পই সার্থক শিল্প বলে সুখ্যাত হয়। এই কারণেই আনন্দ সৃষ্টির ক্ষমতাকে শিল্পের স্বরূপলক্ষণ বলে মনে করা হয়ে থাকে এমন কি সৌন্দর্যকেও আনন্দের মূল ভিত্তির উপরেই দাঁড় করানো হয়ে থাকে। বাস্তবিকই, এমন শিল্পী কখনই কেউ হবেন না যিনি নির্মাণ করবেন অথচ 'রূপ' কল্পনা করবেন না, রূপ রচনা করবেন অথচ রূপের উৎকর্ষ-অপকর্ষ কিছু থাকবে না এবং সামাজিকের জন্য শিল্প রচনা করবেন, অথচ সামাজিক তা দেখে শুনে আনন্দ লাভ বা ক্ষোভ প্রকাশ করবে না। আনন্দবাদের জোর এখানেই। শিল্প সম্ভোগ করে মানুষ আনন্দ পায়—এই সার্বজনীন সত্যের উপর নির্ভর করেই অর্থাৎ শিল্পের সঙ্গে আনন্দের অপরিহার্য যোগ দেখেই আনন্দকে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ করার ঝোঁক এসেছে। কাণ্ট যখন বলেন— শিল্পের উদ্দেশ্য "disinterested pleasure"—অহেতুক আনন্দ সৃষ্টি করা. কোলরিজ যখন বলেন—চারুকলার উদ্দেশ্য আনন্দ দেওয়ার জন্য আবেগ উদ্দীপিত করা অথবা Hulme যখন বলেন—শিল্প হচ্ছে— objectification of our own pleasures in activity and vitality, তখন অহেতুক আনন্দকেই বৈশেষিক লক্ষণ করার ঝোক প্রকাশ পায়! এবং সে কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানেও দার্শনিক সংস্কার গোপনে গোপনে কাজ করে—আনন্দের স্বরূপ ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মবাদী ও বস্তুবাদী দুইজন দুই শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধ্যাত্মবাদীদের—বিশেষতঃ ব্রহ্মবাদীদের অন্যতম প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ আনন্দকে ব্রহ্মের অন্যতম স্বরূপ বলে স্বীকার করেন—তাঁদের মূল স্বীকৃতি ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্ম সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ এবং আনন্দ স্বরূপ।

এই আনন্দ স্বরূপেই তিনি অনন্তস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপেই তিনি প্রকাশশীল।। মানুষের মধ্যেও ব্রহ্মের ঐ তিন বৃত্তি বর্তমান। সৎ-স্বরূপের প্রেরণায় মানুষ টিঁকে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে, চিৎ-স্বরূপের প্রেরণায় মানুষ সব কিছু জানবার চেষ্টা করছে এবং আনন্দ বা অনন্ত-স্বরূপের প্রেরণায় মানুষ আপনাকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে। ব্রহ্ম যেমন নিজের আনন্দস্বরূপ বা অনন্তস্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য অহেতুক লীলা করতে আপনাকে বিবর্তিত করেছেন, মানুষও তেমনি তার আনন্দস্বরূপকে উপলব্ধি করতে কল্পনায় নিজেকে 'নানাখানা' করতে চেষ্টা করছে। মানুষের সমস্ত প্রকাশ চেষ্টার মধ্যে তার আনন্দস্বরূপ ব্যক্ত হচ্ছে এবং তা হচ্ছে বলেই অর্থাৎ আনন্দের মধ্যেই প্রকাশের তত্ত্ব নিহিত বলে, আনন্দ সৃষ্টি করা ছাড়া শিল্পের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই—আনন্দের প্রয়োজন ছাড়া শিল্প অন্য কোন প্রয়োজন (লোকশিক্ষা + নীতিশিক্ষা ইত্যাদি = প্রয়োজন) মেটায় না।

কিন্তু এই অধ্যাত্মবাদী দৃষ্টি দিয়ে আনন্দতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে আধুনিক চিন্তাশীলরা প্রস্তুত নন। আধুনিকদের মতে,। আনন্দ হচ্ছে বিশেষ বিশেষ বাসনার পরিপূরণ হওয়ার ফলে বিশেষ একটি সুখদায়ক আবেগময় মানসিক অবস্থা—এক কথায় আনন্দ বাসনা সাপেক্ষ—নিরপেক্ষ কোন বৃত্তি নয়। এখানেই প্রশ্ন উঠে, শিল্পী যে আনন্দকে ব্যক্ত করতে চান সে কি বিশেষ কোন আনন্দ? না সাধারণ আনন্দ? বিশিষ্ট বাসনার পরিপূরণ থেকে যদি ঐ আনন্দ জন্মে, আনন্দ যদি হয় রূপসম্ভোগ-বাসনার পরিপূরণজনিত আনন্দ, তাহলে নিশ্চয়ই এ সংজ্ঞা করা চলে না,—আনন্দকে প্রকাশ করাই শিল্পের উদ্দেশ্য। কারণ তা করলে সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হতে বাধ্য এবং আনন্দ মাত্রকেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে স্বীকার করা হয়—ঘোড়দৌড়, দাবাখেলা, সন্দেশ খাওয়া প্রভৃতি প্রত্যেক আনন্দজনক ব্যাপারকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হবে।

সুতরাং সংজ্ঞাটিকে অতিব্যাপ্তি দোষ থেকে মুক্ত করতে যেয়ে যদি

এই কথাই বলতে হয় যে শিল্প হচ্ছে বিশেষ শ্রেণীর আনন্দের প্রকাশ, তাহলে আনন্দের চেয়ে ঐ বিশেষ শ্রেণীর বিশেষত্বকেই বৈশেষিক লক্ষণ হিসাবে সংজ্ঞায় স্থান দেওয়া উচিত। তারপর একথা ঠিক বটে যে মানুষ শিল্প সম্ভোগ করে আনন্দিত হয়ে থাকে কিন্তু সেই আনন্দ তো সাধারণ আনন্দ নয়,—শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ বা চমৎকারিত্ব দেখে মুগ্ধ হওয়ার যে আনন্দ তা' সেই আনন্দ। এই বিশিষ্ট আনন্দকেও যদি বৈশেষিক লক্ষণ বলে মনে করা যায় তাহলে শিল্পের স্বরূপ লক্ষণে পৌঁছানো যায় না। কারণ, তখনও শিল্পের সংজ্ঞা করতে হয় এইভাবে—শিল্পীর হাতে গড়া যে বস্তু শুধু তাব রূপ-চমৎকারিত্ব দিয়েই সামাজিকের মনে আনন্দ সৃষ্টি করে সেই বস্তুরই নাম শিল্প এবং তা করার অর্থ রূপ চমৎকারিত্বকেই বৈশেষিক লক্ষণের মর্যাদা দেওয়া।

শিল্পতত্ত্বে—রসবাদ (Expression of feelings or emotions)

শিল্প সম্ভোগ করার সময়ে মানুষ একদিকে যেমন আনন্দ লাভ করে অন্যদিকে তেমনি ভাবাবেগও উপলব্ধি করে থাকে। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে বলা যায়, শিল্প সম্ভোগের অবস্থাটি—বোধ আবেগ ও অনুভূতির এক অপূর্ব সংশ্লেষের ফল—বোধ আবেগ ও বেদনা-বন্ধের যুগপৎ ক্রিয়ার মুহূর্তপরম্পরা। এই অবস্থার সঙ্গে বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যাপারের পার্থক্য এই যে, বিশুদ্ধ জ্ঞানে আবেগবন্ধের এবং বেদনাবন্ধের ক্রিয়া থাকলেও তা অসংলক্ষ্য থাকে ; বিশুদ্ধ জ্ঞানের ব্যাপারটি আসলে বোধমুখ্য ব্যাপার। অন্যপক্ষে শিল্পসম্ভোগ ব্যাপারটি —বোধক্রিয়া আবেগ ও বেদনার এক সমন্বয়—বিশেষতঃ অনুভব—মুখ্য ব্যাপার। শিল্প মুখ্যতঃ আবেগ ও বেদনা (সুখ-দুঃখাদি) জাগায়—এই বিষয়টি প্রথম থেকেই সকলেরই চোখে পড়ে আসছে এবং তা আসছে বলেই তত্ত্বদর্শীদের অনেকেই শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে ভাবাবেগকেই শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ বলে চিহ্নিত করেছেন, সংজ্ঞা করেছেন—Art is the expression of feelings or

emotions—শিল্প ভাবের প্রকাশ এবং সাহিত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে—এই সম্প্রদায়ই বলে থাকেন—সাহিত্য হচ্ছে "ভাবের কথা" আর শাস্ত্র হচ্ছে "জ্ঞানের কথা"। এই সম্প্রদায়ের মুখ্য বক্তব্য এই যে শিল্পী বাহ্যতঃ যাই করুন, আসলে ভাবাবেগকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন—ভাবোদ্দীপকতাই শিল্পের বিলক্ষণ লক্ষণ।

এই মতবাদটি বহুদিনের প্রাচীন এবং বহুজন স্বীকৃত। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে রসবাদ নামে যে মতবাদটি প্রচলিত, তার মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে, Art is the expression of feelings or emotions—এই সিদ্ধান্তের যথেষ্ট ঐক্য রয়েছে। পারিভাষিক জটিলতা বাদ দিয়ে বলতে গেলে বলা যায়—রসবাদের মুখ্য বক্তব্য এই যে শিল্পীর প্রকাশ্য বস্তু হচ্ছে 'ভাব'। বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারি-সংযোগে ভাব রসে পরিণত হয় এবং তা হয় বলেই শিল্পীর কাজ উপযুক্ত বিভাব-অনুভাব-সঞ্চারিভাবের সংযোগ পরিকল্পনা করে বিশেষ ভাবের রসমূর্তি নির্মাণ করা ভাবের সম্পূর্ণ রূপটি ব্যক্ত করে পাঠকের বা দর্শকের কাছে ভাবটিকে রসনীয় করে তোলা—

শিল্পী যেমন ভাবের বৈচিত্রময় রূপটিকেই বিশেষ বিশেষ উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন, পাঠক-দর্শক তেমনি শিল্পের রূপকর্মের ভিতর থেকে বিশেষ একটি ভাবেরই বিচিত্র রূপ আস্বাদন করে থাকেন। অর্থাৎ শিল্পকর্মগুলিকে বাইরের দিক থেকে দেখলে রূপ-কর্ম বলেই মনে হয় বটে কিন্তু আসলে তারা ভাবেরই অভিব্যক্তি—ভাবেরই সংকেত। অন্যভাবে বললে বলতে পারা যায়—যে রূপ ভাবকে ব্যক্ত করে না—পাঠক-দর্শকের মনে ভাবের বিচিত্র রূপকে আস্বাদযোগ্য করে তোলে না। তা' আর যাই হোক শিল্প-পদবাচ্য নয়। শিল্প যে-সে রূপ নয়, শিল্প রসাত্মক রূপ—ভাবের রসনীয় রূপ। রসনীয় শব্দটির তাৎপর্য খুবই অনুধাবনযোগ্য 'রসন' ব্যাপার যে নিছক খানিকটা ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস নয়, এ কথাটা বিশেষভাবেই মনে রাখা দরকার। মনে রাখতে হবে—'রসনা চ বোধরূপা'—রসনা আস্বাদন বটে কিন্তু আসলে তা' ভাবের বোধ

(contemplation) স্বসংবিদানন্দ চর্বণা। মূলতঃ an attitude of contemplation—যদিও সেই ভাবনা বিশুদ্ধ ভাবনা নয়—ভাবের ভাবনা—অনুভব-আশ্রয়ী ভাবনা।

শ্রদ্ধেয় ই. এফ. ক্যারিট মহাশয়ের "এ্যান ইনট্রোডাকশন টু এস্থেটিকস" গ্রন্থের পরিশিষ্টে—"বিউটি এ্যাজ দি এক্সপ্রেশান অফ ইমোশান" নামক যে পরিচ্ছেদটি আছে তাতে প্লেটো থেকে আরম্ভ করে জেন্টাইল পর্যন্ত, মোট ৪২ জনের অভিমত সংগৃহীত হয়েছে। এই সব অভিমতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যাবে—ভাববাদ কতদিন থেকে কতজনের মনের মধ্যে এবং কতখানি স্থান অধিকার করে বসে আছে। সকলের অভিমত সংগ্রহ করার অবকাশ এবং প্রয়োজন নেই, দু'চারজনের অভিমত (আক্ষরিক উদ্ধৃতি নয়, ক্যারিটের দ্বারা সংক্ষেপিত) উদ্ধৃত করলেই ভাবাবেগবাদের প্রতিষ্ঠার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। এরিস্টটল—(ক) (প্রবলেমস্—১৯ পরিচ্ছেদ—৩৮ পৃঃ) সুর শুনে আমাদের আনন্দ হয়, কারণ সুর আমাদের ভাবকেই প্রকাশ করে।

(খ) (পলিটিকস—৫ম···) যখন আমরা অনুকৃতি (ইমিটেশন) দেখি বা শুনি তখন আমাদের মধ্যে সহানুভূতি (সিম্প্যাথেটিক-ফিলিংগস্) জাগে।

২। জে ডেনিস—(দি এ্যাডভান্সমেন্ট অফ মডার্ণ পোয়েট্রি) "কি কবিতা, কি চিত্র সর্বত্রই আবেগ থাকা চাই," আবেগের প্রকাশ বলেই শিল্প আমাদের আনন্দ দেয়।

৩। ভিকো—(দি নিউ সায়েন্স্) কাব্য আবেগাত্মক বাক্য।

৪। বোম্গার্টেন—(পোয়েট্রি) আবেগ থেকেই কাব্যের জন্ম আবেগ উদ্রেক করাই কাব্যের উদ্দেশ্য।

৫। রেনোল্ড্স্—(লেকচারস—৯) বিষয় যত তুচ্ছই হোক না কেন প্রতিভাবানের হাতের স্পর্শে তাই ভাবোদ্দীপক হয়ে উঠে।

৬। এলিসন—(নেচার অফ টেস্ট—ভূমিকা) বিষয়বস্তু স্বরূপে

সুন্দর বা মহীয়ান—কোন কিছুই নয়, তারা আঁবেগ-উদ্দীপক সংকেত মাত্র।……রসের বস্তু অথচ তা আবেগের বস্তু নয়—এ কথা ভাবা যায় না।

৭। **কাণ্ট**—(ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট) আলোকের ও শব্দের যে বিচিত্র রূপ তার প্রত্যেকেরই ভাষা বা তাৎপর্য রয়েছে।…আমরা বৃক্ষকে বা প্রাসাদকে 'রাজমহিমান্বিত' (ম্যাজেস্‌টিক) বা 'গাম্ভীর্যপূর্ণ' বলি, প্রান্তরকে হাস্যমুখর বা আনন্দিত বলি……এমন কি বর্ণগুলিকে আমরা বিশুদ্ধ, পবিত্র, কোমল বলি কারণ তারা আবেগ উদ্রেক করে।

৮। **ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ**—(প্রিফেস্ টু লিরিকাল ব্যালাডস্) সমস্ত ভাল কাব্যই প্রবল আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। কবিদের আবেগ প্রকাশের বিশেষ দক্ষতা থাকে। শান্ত মুহূর্তে-অনুভূত আবেগকে পুনরুদ্বোধিত করেই কবিতা সৃষ্টি করা হয়ে থাকে।

৯। **কোল্‌রিজ**—(সাউণ্ড ক্রিটিসিজম্) সব রকম চারুকলার উদ্দেশ্য—নিছক আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই আবেগ উদ্দীপিত করা।

১০। **হেগেল**—শিল্পের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়কে, অনুভবকে এবং আবেগকে উদ্দীপিত করা।

১১। **টলষ্টয়**—শিল্পীর কাজ অনুভূত আবেগকে পুনরুদ্বোধিত করে, রেখা, বর্ণ, শব্দ, ভাষা প্রভৃতির সাহায্যে দর্শের কাছে সঞ্চার করা—তারই নাম কলা।

১২। **ক্রোচে** (ক)—(ব্রিভিয়ারী অফ এস্থেটিক্স্)—শ্রেষ্ঠ শিল্পে, আবেগ ও রূপকল্পনার সম্পূর্ণএকাত্মতা ঘটে।

(খ) (নিউ এসেস্ ইন্ এস্থেটিক্স্)—শিল্পের প্রত্যেকটি রেখা, বর্ণ, সুর, ভাবাবেগেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

(গ) (প্রবলেম্স্ অফ এস্থেটিক)—শিল্প যে কারণে আমাদের মনে উদ্দীপনা ও বিস্ময় জাগায়, তা হচ্ছে আবেগ-আগুন—শিল্পীর ভাবাবেগ। এই আগুনের অভাব আর কিছুতেই মেটাতে পারে না।

এই পর্যন্তই যথেষ্ট। এতেই বুঝা যাচ্ছে ভাববাদ বা রসবাদ শিল্পতত্ত্বের কতখানি প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বিরাজ করছে। সব

চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যারা আবেগবাদের বিরোধী বলে নিজেদের জাহির করেছেন, তাঁরাও শেষ পর্যন্ত ভাবাবেগকেই মৌলিক বৈশিষ্ট্য বলে নির্দেশ করেছেন। যেমন ক্রোচের কথাই প্রথম ধরা যাক। ক্রোচের মতে, আগেই বলা হয়েছে, শিল্প হচ্ছে প্রাতিভানিক জ্ঞান—কল্পনাত্মক জ্ঞান। 'শিল্প আবেগের প্রকাশ'—এ কথা ক্রোচে জ্ঞাতসারে কোথাও বলতে চান নি। তাঁর মতে শিল্প কল্পরূপ রচনা (ইমেজ-মেকিঙ্) প্রতিভান। কিন্তু প্রতিভানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যেয়ে তিনি যা বলেছেন তার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে সংজ্ঞা (কন্‌সেপ্‌ট্) হচ্ছে বুদ্ধিসাধ্য (ইনটেলেক্‌ট্) জ্ঞান আর প্রতিভান (ইন্‌টুইশান) হচ্ছে অনুভবসাধ্য জ্ঞান—তেমন জ্ঞান যা' প্রত্যক্ষতঃ অনুভবে (feeling) প্রতিভাত হয়—যা 'ভাবে-জানা'। বলা বাহুল্য, কল্পনা ও প্রতিভান যদি একই ব্যাপার হয় এবং প্রতিভান যদি হয় অনুভবে-গৃহীত রূপকল্প, তাহলে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না—কল্পনার মূল উৎস হচ্ছে অনুভব বা ভাবাবেগ। ক্রোচের ভাষায় "feeling"। মোট কথা এই কল্পনার মূলে যদি ভাবাবেগই কারণ হিসাবে কাজ করে, তবে শিল্পকে কল্পনার সৃষ্টি বললে মূলতঃ ভাববাদ বা রসবাদকেই স্বীকার করা হয় এবং স্বীকার করা হয় এইভাবেই যে শিল্প হচ্ছে 'ভাবের রূপাত্মক প্রকাশ'। প্রতিভানতত্ত্ব আলোচনা করার সময়ে এ বিষয়ে আরো অনেক কথা বলতে হবে সুতরাং এ প্রসঙ্গের এখানেই শেষ।

রসবাদের বিরুদ্ধে প্রধানতঃ দুটি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। প্রথম আপত্তি তোলেন—রূপবাদীরা এবং দ্বিতীয় আপত্তি তোলেন—রীতিবাদীরা। রূপবাদীরা বলেন—শিল্পকে 'ভাবাবেগের প্রকাশ' বললে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে, কারণ এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যার শিল্পত্ব স্বীকার্য বটে কিন্তু যাকে ঠিক ভাবের প্রকাশ বলা যায় না। সেখানে রূপচমৎকারিত্বের মধ্যেই শিল্পত্ব নিহিত। যেমন নিসর্গ কবিতাদির ক্ষেত্রে। নিসর্গ কবিতায় ভাষা দিয়ে নিসর্গের যে ছবি আঁকা হয় তা' দেখে আমরা আনন্দ পাই আবেগ উদ্দীপনার জন্য নয়,

আনন্দ পাই এই কারণেই যে ছবিটি অভিজ্ঞতার বা ধারণার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। রীতিবাদীরা অন্য দিক থেকে আপত্তি তুলেছেন তাঁদের মতে—শিল্পের আত্মা রীতি (style বা technique)। শিল্পের শিল্পত্ব আবেগোদ্দীপকতার বা রূপপ্রতিরূপ কল্পনার মধ্যে নিহিত থাকে না—শিল্পত্ব নিহিত থাকে রীতির মধ্যে—উপাদান-বিন্যাসের বা সংঘটনার (configuration) মধ্যে। অর্থাৎ যাকে প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে নয়, যে-ভাবে প্রকাশ করা হয় সেই ভাবটির বা রীতিটির মধ্যে। এঁরা বলেছেন, রসবাদ এই কারণেই অব্যাপ্ত যে, যে সব স্থলে শুধু রীতির জন্যই আনন্দ হয়, সেই সব স্থলগুলি শিল্পের গণ্ডী থেকে বাদ প'ড়ে যায়। রীতিবাদ-আলোচনার সময় এ বিষয়ে অনেক কথা বলতে হবে। অতএব এখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ করা যাক।

শিল্পতত্ত্বে—কল্পনাবাদ ও প্রতিভানবাদ

প্লেটো-এরিস্টটলের 'অনুকৃতি'বাদ যে মূলতঃ রূপবাদ, আশা করি এ কথা ব্যাখ্যা করে বুঝানোর কোন প্রয়োজন নেই ; আর এ কথাও অনেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সৌন্দর্যবাদ মূলতঃ রূপবাদকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে—রূপের সুষমাই সৌন্দর্য নামে অভিহিত হয়েছে যার নাম 'formal beauty' সে হচ্ছে রূপের আকৃতিগত সুষমা (harmony) এবং যার নাম 'beauty of expression' তা' হচ্ছে আসলে রূপের সম্পূর্ণতা—ভাবের পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্তির আদর্শ রূপটি—perfect embodiment of the universal, *i.e.*, idea. আর আনন্দবাদ গড়ে উঠেছে—শিল্পের রূপগত সুষমা ও সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করার পরে যে আনন্দ হয়, সেই আনন্দকে ভিত্তি করে।

কল্পনাবাদকে আমরা যদি অনুকরণবাদ থেকে পৃথক করে নিয়ে বিচার করতে চাই, তাহলে প্রথমেই এই কথা বলতে হবে যে কল্পনাবৃত্তি একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি এবং অনুকরণবৃত্তি থেকে পৃথক একটি রূপরচয়িত্রী বৃত্তি। যেখানে অনুকরণ হচ্ছে উপলব্ধ প্রতীতির পুনরাকরণ, সেখানে কল্পনা হচ্ছে—নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি—অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা। অনুকরণ রূপ দিতে পারে তাকেই যাকে সে প্রতীতিরূপে গ্রহণ করেছে আর কল্পনা গড়ে নতুন নতুন রূপ—অপূর্ব বস্তু, যে পার্থক্যই থাক, দুয়েরই কাজ যে রূপ রচনা এ বিষয়ে অবশ্য কোন মতভেদ নেই। কল্পনাবাদের বিশেষ বক্তব্য মোটামুটি এই যে :—মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধিবৃত্তি বলে একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি আছে, তেমনি কল্পনাবৃত্তি বলেও স্বতন্ত্র আর একটি বৃত্তি আছে। এই বৃত্তি আছে বলেই মানুষ রূপের সঙ্গে রূপ মিলিয়ে নতুন নতুন

অপূর্ব রূপ তৈরি করতে পারে। বুদ্ধির কাজ বিষয়ের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিরূপণ করা, বিষয় সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করা, এক কথায়, বিচার ও বিতর্ক করা; আর কল্পনার কাজ—ইন্দ্রিয়াহৃত—বিভিন্ন প্রত্যয়কে সাজিয়ে-গুছিয়ে বাড়িয়ে-কমিয়ে বিচিত্র কল্পরূপ উদ্‌ভাবন করা—ধারণার রূপ বা প্রতিমা গড়া। বুদ্ধির স্বাধীন অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়—নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও যুক্তিতন্ত্র গড়ে তোলায়, আর কল্পনার স্বাধীন অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায় —রূপের সঙ্গে রূপ মিলিয়ে নতুন নতুন রূপ উন্মেষণ করায়—রূপ নিয়ে খেলা করায়—তথা রূপের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বাড়িয়ে দেওয়ায়। এই কল্পনাবৃত্তির প্রেরণা থেকেই শিল্পের জন্ম, সুতরাং শিল্প কল্পনার সৃষ্টি—রূপময়ী সৃষ্টি; শিল্পের আবেদন মানুষের কল্পনাবৃত্তির কাছে—কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ করাই শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং শিল্প যে আনন্দ দেয় তা' কল্পনাবৃত্তি চরিতার্থ হওয়ার বিশেষ আনন্দ। বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ কল্পনাবাদী যাঁরা, তাঁদের মতে শিল্পের উৎকর্ষ কল্পনা-কৌশলেরই মধ্যে নিহিত থাকে—যত কৌশল, যত রূপ-বৈচিত্র্য তত উৎকর্ষ। এরই অনুসিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে, যেহেতু শিল্প বুদ্ধির গড়া কোন সিদ্ধান্ত নয়, শিল্পের মধ্যে সত্য মিথ্যা খুঁজতে যাওয়ার অর্থই নির্বুদ্ধিতা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ শিল্প যেহেতু অলৌকিক এবং কল্পনাসর্বস্ব, রূপকে বিচিত্র ও সুন্দর করে তোলাই যখন শিল্পের একমাত্র উদ্দেশ্য, তখন শিল্প শ্লীল কি অশ্লীল এ প্রশ্নও অবান্তর।

প্রত্যেক কল্পনাবাদী মোটামুটি এইভাবেই চিন্তা করে থাকেন বটে, কিন্তু কল্পনার স্বরূপ সম্বন্ধে সকলের ধারণা এক রকম নয়। সাধারণ ভাষায় প্রতিভাকে বা কল্পনাকে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি" বা 'অপূর্ববস্তুনির্মাণ ক্ষমা প্রজ্ঞা' বলা হয়েছে এ কথা ঠিক কিন্তু সৃজনশীল কল্পনার (creative imagination) যথার্থ প্রকৃতি নির্ধারণ করতে যেয়ে কল্পনাবাদীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গেছেন। কল্পনা সবিকল্পক কি নির্বিকল্পক ব্যাপার—এই প্রশ্নটির বা সমস্যার সমাধান করার

উপরেই শেষ পর্যন্ত যথার্থ প্রকৃতিনির্ধারণ ব্যাপারটি নির্ভর করছে বলেই এমনটি ঘটেছে।

এখানেই কল্পনাবাদের ভিত্তির উপরেই প্রতিভানবাদের নতুন প্রকোষ্ঠ গড়ে উঠেছে। গড়েছেন—বেনিডেটো ক্রোচে।

ক্রোচের মূল বক্তব্য এই যে জ্ঞান দুই প্রকার:—এক নৈয়ায়িক বা বৌদ্ধিক জ্ঞান অর্থাৎ সংজ্ঞাশ্রয়ী জ্ঞান—'সামান্যে'র জ্ঞান, দুই প্রাতিভানিক জ্ঞান—কল্পনা বা রূপকল্পনাত্মক জ্ঞান। চিদবৃত্তি বুদ্ধি (intellect) এবং প্রতিভান (intuition) বা কল্পনা এই দুটি উপবৃত্তির রূপ ধরে একদিকে বিচার-বিতর্ক প্রভৃতির সাহায্যে সংজ্ঞা বা সামান্যের জ্ঞান তৈরি করছে, অন্যদিকে প্রতিভান সাহায্যে বিচিত্র রূপকল্প (image) তৈরি করছে। প্রতিভান বুদ্ধিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র একটি মানসিক বৃত্তি এবং স্বভাবে নির্বিকল্পক। ক্রোচের "ঈস্থেটিক-পরিচয় ও সমালোচনা নিবন্ধ" থেকে ঈস্থেটিক গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারাংশ উদ্ধৃত করলেই ক্রোচের বক্তব্য ক্রোচের নিজের মুখেই শোনা যাবে।*

প্রতিভান ও রূপায়ন (Intuition & Expression)

জ্ঞান দুই প্রকার—এক প্রাতিভানিক বা প্রাতিভজ্ঞান (intuitive knowledge); দুই নৈয়ায়িক বা পারামর্শিক জ্ঞান (logical knowledge), প্রথমটির উৎপত্তি কল্পনা থেকে; দ্বিতীয়টির উৎপত্তি বুদ্ধি থেকে; প্রথমটি বিশেষের (individual) জ্ঞান, দ্বিতীয়টি সামান্যের (universal) জ্ঞান। প্রথমটি সৃষ্টি করে —প্রতিরূপ (image), দ্বিতীয়টি সৃষ্টি করে—সংজ্ঞা (concept)।

প্রাতিভানিক জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য

এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন যে প্রাতিভানিক জ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য থাকতে পারে না; নেইও। তাঁদের মতে—প্রতিভান অন্ধ;

* লেখকের "ক্রোচের ঈস্থেটিক-পরিচয় ও সমালোচনা" গ্রন্থ (যন্ত্রস্থ)।

বুদ্ধির দৃষ্টি-শক্তি ছাড়া তার দেখবার ক্ষমতা নেই। প্রাতিভ-জ্ঞান ও নৈয়ায়িক জ্ঞানের মধ্যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ—নৈয়ায়িক জ্ঞান প্রভু প্রাতিভ-জ্ঞান তার ভৃত্য। কিন্তু এ কথাটা মনে গেঁথে রাখতে হবে যে, প্রাতিভ-জ্ঞানের কোনো প্রভুর প্রয়োজন নেই বা কারও ওপর নির্ভর করবার প্রয়োজন নেই; অন্যের চক্ষু ধার করবারও তার আবশ্যকতা নেই, কারণ তার নিজেরই সুন্দর চক্ষু আছে।

অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে অনেক সময় প্রতিভানকে ও সংজ্ঞাকে অবিচ্ছেদ্যভাবেই থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এও সত্য যে—এমন অনেক 'প্রতিভান' সম্ভব যাতে সংজ্ঞার কোনোও স্পর্শ থাকে না। দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—যেমন শিল্পীর মনে চন্দ্রালোকিত দৃশ্যের প্রতীতি বা ছাপ, রেখাঙ্কন-শিল্পীর আঁকা কোনও দেশের রেখা-চিত্র, সঙ্গীতের কড়ি বা কোমল সুর, দীর্ঘোচ্ছ্বাসময় গীতি কবিতার শব্দ ধ্বনি, যে ভাষায় আমরা জিজ্ঞাসা, আদেশ বা অনুশোচনা ব্যক্ত করে থাকি।

কথা উঠতে পারে—সভ্য-সমাজের অধিকাংশ প্রতিভানই সংজ্ঞা-গর্ভ। এই কথার উত্তরের মধ্যেই গুরুতর একটা জিজ্ঞাসার মীমাংসা করা হবে। মীমাংসা এই যে যে-সব সংজ্ঞা প্রতিভানের সঙ্গে মিশে এক হয়ে থাকে তাদের বিশুদ্ধ সংজ্ঞা বলা যেতে পারে না। তারা একদা সংজ্ঞারূপে থাকলেও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিভানেরই উপকরণ মাত্র। সাহিত্যের পাত্র-পাত্রীর মুখে যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব-বিচার শোনা যায়, সেই সব সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব-বিচার সংজ্ঞারূপে সেখানে কাজ করে না, শুধুমাত্র পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ করে:—যেমন, কোন চিত্রের লাল রঙ আর পদার্থবিদের লাল রঙ এই হিসেবে এক নয় যে চিত্রের লাল রঙ চিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে থাকে আর পদার্থ-বিদের লাল রঙটি বর্ণের তত্ত্ব-বিশেষ।

কলা ও বিজ্ঞানের পার্থক্য

অংশীর ধর্ম অনুসারেই অংশের ধর্ম বা গুণ বিচার করতে হবে—অঙ্গীর ধর্মই অঙ্গের ধর্মের নিয়ামক (The whole is that

which determines the quality of the parts)। কোন রস-সাহিত্যের ভেতর খত-ইচ্ছে তত্ত্ব, দার্শনিক আলোচনা বা সংজ্ঞা থাকতে পারে, কিন্তু অত'আলোচনা থাকা সত্ত্বেও তাকে শাস্ত্র সাহিত্য বলা যাবে না এই' জন্যে যে—কলার ফলশ্রুতি—প্রতিভান। আবার কোনও দার্শনিক প্রবন্ধাদির ভেতর প্রতিভানের মাত্রা যতই থাক, দার্শনিক আলোচনার ফলশ্রুতি—সংজ্ঞা; যার সাকল্য ফল—প্রতিভান (intuition) তাই কলা, আর যার সাকল্য ফল (total effect) সংজ্ঞা তাই বিজ্ঞান।

> The difference between a scientific work and a work of art, that is, between an intellectual fact and intuitive fact lies in the difference of total effect aimed at by their respective authors.

প্রতিভান ও প্রত্যক্ষীকরণ

প্রতিভান বলতে প্রায় সকলেই প্রত্যক্ষীকরণ (perception)—অর্থাৎ বাস্তবিক কোন কিছুর জ্ঞান—সত্য বলে কোন কিছুর ধারণা, বুঝে থাকেন। প্রত্যক্ষীকরণ নিশ্চয়ই প্রতিভান। আমি যে ঘরে বসে দোয়াত থেকে কালি নিয়ে, যে কাগজে, যে লেখনী দিয়ে লিখছি এ সকলের প্রত্যক্ষীকরণ প্রতিভান ত বটেই। কিন্তু লেখক-আমি'র 'অন্য ঘরে—বসে লেখা'র 'অন্য নগরে বসে লেখা'র অন্য কাগজ বা কালিকলমে লেখার যে কল্প রূপ (image) ভেসে উঠেছে তাও তো প্রতিভান। এ থেকে এই তথ্যই পাওয়া যায় যে প্রকৃত প্রতিভানে বাস্তব-অবাস্তবের পার্থক্য অবান্তর—প্রতিভান সত্য-মিথ্যা নিরপেক্ষ প্রত্যয়-মাত্র। সত্য প্রত্যয়—একথা বললে সঙ্গে সঙ্গে সত্য প্রতিরূপের, মিথ্যা প্রতিরূপের পার্থক্য বিচার এসে পড়ে। প্রথম প্রত্যয়ের মুহূর্তে এই রকম বিচার বা বিকল্প থাকে না; সুতরাং এই ধরনের প্রতিভান—বাস্তবের বা অবাস্তবের প্রতিভান নয়—বিশুদ্ধ প্রতিভান।

প্রতিভানের লক্ষণ এই রকম দেওয়া যেতে পারে—প্রতিভান বাস্তব প্রত্যক্ষের ও তার সম্ভাব্য প্রতিরূপের নির্বিকল্প প্রত্যয় মাত্র।

Intuition is the undifferentiated unity of the perception of the real and of the simple image of the possible.

প্রতিভান ব্যাপারে আমরা বাহ্য বস্তুর মুখোমুখি হয়ে সত্যাসত্য যাচাই করতে যাই না, আমরা আমাদের প্রতীতিগুলি (impressions) যে ধরনেরই তারা হোক না কেন—শুধু রূপায়িত করতে অর্থাৎ আকার দিতে চেষ্টা করি।

প্রতিভান ও স্থানিক-কালিক মান

যাঁরা প্রতিভানকে স্থান-কাল মাত্রায়—গৃহীত ও বিন্যস্ত অভিবেদন বা ঐন্দ্রিয়-প্রত্যয় (sensations) বলে মনে করেন, তাঁরা সত্যের কাছাকাছি গিয়েছেন বলে মনে হতে পারে।

এঁদের মতে স্থান ও কাল প্রতিভানের অধিকরণ (forms)। প্রতিভান করার অর্থ—স্থান-কালের মান দিয়ে পরিচ্ছিন্ন করে গ্রহণ করা। কিন্তু স্থান-কাল নিরপেক্ষভাবেও প্রতিভান ঘটতে পারে।

We have intuitions without space and time.

যেমন :—আকাশের রঙ, কোনও অনুভবের রঙ, বেদনাজনিত আর্তনাদ এবং বাসনার বা চেষ্টার চেতনায়-ফুটে-ওঠা রূপ। এই সব প্রতিভানে স্থান ও কালেরকোনও সম্পর্ক নেই। কোনও কোনও প্রতিভানে মাত্র 'স্থানিক মান' থাকতে পারে, আবার কোনটিতে কেবল 'কালিক মান'ই থাকে—এমন কি যে জায়গায় উভয়েরই সদ্ভাব দেখা যায় সে জায়গায় তা পরক্ষণের বিকল্পনা বা বিচারের ফল। কোনও আকা চিত্র বা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার সময়, বিকল্পনা দেখা না দেওয়া পর্যন্ত কারও মনে স্থানিক মানের চেতনা আসে কি? অথবা কোন গল্প বা সঙ্গীত শুনবার সময়, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ না করা পর্যন্ত কে কালিক মাত্রা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে থাকে? সুতরাং স্থান কাল—নিরপেক্ষ প্রতিভান সম্ভব। কলা-শিল্পে প্রতিভান স্থান কে

পরিস্ফুট করে না, প্রকাশ করে চরিত্র (character)—ব্যক্তি বিশেষের অবয়ব বা আকার বৈশিষ্ট্য।

[এর পরে ক্রোচে স্থান-কাল সম্বন্ধে যে সব দার্শনিক মতবাদ আছে, তাদের আলোচনা করেছেন। জ্ঞানের জন্য স্থান কালের নিমিত্ত কারণতা অপরিহার্য নয়—আধুনিক দর্শনের সম্প্রদায় বিশেষের মত উদ্ধৃত করে ক্রোচে নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করতে চেষ্টা করেছেন। ক্রোচে বলেন—স্থান ও কাল জ্ঞানের নিমিত্ত কারণ নয় অর্থাৎ স্থানকে কালকে আশ্রয় করে জ্ঞান জন্মায় না। জ্ঞানের দ্বারাই স্থান ও কালের প্রতীতি সম্ভব হয়। পাঠক স্মরণ করতে পারেন যে দার্শনিক ইমান্নুয়েল ক্যাণ্টের সময় থেকে জ্ঞান-তত্ত্বে স্থান ও কাল অপরিহার্য ও নিত্য নিমিত্তকারণ হিসেবে গৃহীত হয়ে আসছিল। তবে এক সম্প্রদায় স্থান ও কালকে ঐ রকম নিমিত্ত কারণ বলে স্বীকার করেন না। ক্রোচে সংক্ষেপে এদের মত নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই জটিল আলোচনায় প্রবেশ করবার প্রয়োজন এখানে নেই।]

প্রতিভান ও অভিবেদন (Sensation)

প্রতিভানের একদিকের সীমা নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতিভানের পূর্বসীমান্তে আছে—অভিবেদন (sensation)—আকারহীন বস্তু (formless matter)। এই আকারহীন বস্তুকে অর্থাৎ অভিবেদনকে আত্মা আকার না দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। সুতরাং অভিবেদন সীমার সঙ্কেত মাত্র; আত্মার সামগ্রী হতে হলে তাদের ঐ সীমা অতিক্রম করতেই হবে। বস্তু বা প্রকৃতি (matter) হচ্ছে তাই যা আত্মার গণ্ডীর বাইরে অর্থাৎ আত্মা যাকে সৃষ্টি করতে পারে না—যা আত্মার বন্ধস্বরূপেই থাকে।

> It is what the spirit of man suffers but does not produce.

অবশ্য এই বস্তু বা প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষের জ্ঞান বা কর্ম কোনটাই সম্ভব নয়। কিন্তু কেবল মাত্র প্রকৃতি পশুত্বের—আভ্যন্তরীন পশু-স্বভাবের এবং আবেগের জনক—মনুষ্যত্বের অর্থাৎ

স্বপ্রকাশশীলতার জনক নয়। কত সময় আমরা আন্তর-ভাব-প্রবাহকে জানবার জন্য কত চেষ্টাই না করে থাকি! আভাসও কিছু কিছু পেয়ে থাকি, কিন্তু মনের চোখে তাদের রূপ বা প্রতিভান ধরা পড়ে না। কেবল সেই সময়েই আমরা বিষয় (content) ও আকারের (form) গভীর ও বিলক্ষণ পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। প্রতিভানই (intuition) বিষয়কে আকার দিয়ে আত্মার বিষয় করে তোলে। প্রতিভানের পারস্পরিক পার্থক্য সম্ভব হয়—বিষয়ের পার্থক্যের জন্য; বিশিষ্ট প্রতিভান বিষয়ের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে।

> It is the matter, the content, which differentiates one of our intuitions from another—the form is constant, it is spiritual activity while matter is changeable.

বিষয় না থাকলে আত্মিক ব্যাপার নৈর্ব্যক্তিকতা পরিহার করে প্রকৃত ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে না—বিশেষ বিশেষ প্রতিভানও সম্ভব হয় না। আশ্চর্যের বিষয়—আত্মার এই মূল্যবান ব্যাপারটিকে আজ অনেকেই স্বীকার করতে চান না। অনেকে বলেন—এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি কখনও চোখে পড়ে না। যেন ঘর্ম-নিঃসরণ ও চিন্তার মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই—আর পার্থক্য থাকলেও তা পরিমাণ গত।

প্রতিভান ও আসম্বন্ধন (Association)

অনেক সময় প্রতিভানকে অভিবেদনের আসম্বন্ধন (association of sensations) বলে মনে করা হয়। কিন্তু, 'আসম্বন্ধন' কথাটির অর্থ নির্দিষ্ট নয় বলে, বলা যেতে পারে—তা সমস্যার জনক এবং সমস্যার সমাধান এক সঙ্গেই। এখন, আসম্বন্ধন বলতে যদি স্মৃতি (memory) বা সংজ্ঞান স্মরণ (conscious recollection) বোঝায় তা হলে সমস্যা দেখা দেয়; কারণ যা প্রতিভাত হয় নি, আত্মার সাহায্যে গৃহীত হয় নি—চেতনার দ্বারা আকারিত হয় নি, এমন

কোন কিছু স্মৃতির সাহায্যে সংগৃহীত হতে পারে—তা, ধারণা করা যায় না। আবার আসম্বন্ধন বলতে যদি নির্জ্ঞান বিষয়ের আসম্বন্ধন বোঝায় তা হলেও অভিবেদনের (sensation) অনাত্ম ক্ষেত্রেই আমরা পড়ে থাকি।

কিন্তু, 'আসম্বন্ধন' বলতে যদি—এক শ্রেণীর আসম্বন্ধনবাদীদের (associationist) সঙ্গে একমত হয়ে আমরা, স্মৃতি বা অভিবেদন প্রবাহমাত্র না বুঝে—সৃজনশীল আসম্বন্ধন (productive association) বুঝি, তাহলে প্রতিভানের সঙ্গে তার নামমাত্র পার্থক্য থাকে। সৃজনশীল আসম্বন্ধন ও সমন্বয় (synthesis) একই ব্যাপার। সমন্বয় আত্মিক ব্যাপার, অতএব প্রতিভানের সমধর্মী। মোট কথা, আসম্বন্ধনের অর্থ যেখানে 'অভিবেদনের (sensation) সমষ্টি', সেখানে প্রতিভানের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা নেই, আর যেখানে 'অভিবেদনের সমন্বয়ন' সেখানেই প্রতিভানের সঙ্গে তার সমধর্মিতা।

প্রতিভান ও উপস্থাপন

এমন এক সম্প্রদায়ের মনোবিজ্ঞানবিদ আছেন যারা অভিবেদন (sensation) ও সংজ্ঞার মধ্যে প্রতিরূপ (image) বা উপস্থাপনের (representation) একটা পর্যায়ের কথা বলে থাকেন। এই উপস্থাপন ব্যাপারের সঙ্গে প্রতিভানের সম্বন্ধ কি ? উত্তরে বলা যায় —অনেকখানি বা একটুও না। উপস্থাপন বলতে আমরা যদি এমন একটা ব্যাপার মনে করি যা অভিবেদনের সীমা অতিক্রম করে, অভিবেদন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, তা হলে—প্রতিভানের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য নেই। কিন্তু উপস্থাপন বলতে যদি যৌগিক অভিবেদন ধরা হয় তা হলে আবার সেই অভিবেদনের (sensation) [অনাত্ম] দেশে পড়ে থাকতে হয়। তবে উপস্থাপন অভিবেদনের চেয়ে এক ধাপ পরবর্তী বা দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপার—এই কথা বললেও যথার্থ কথা বলা হয় না এবং সমস্যার সমাধানও হয় না। আসল প্রশ্ন—দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাপার বলতে কি বোঝায় ? তা কি

পরিমাণগত না গুণগত পার্থক্য? যদি গুণগত বৈলক্ষণ্য হয় তা হলে উপস্থাপন অভিবেদনের পরিবর্ধন (elaboration of sensation), অর্থাৎ প্রতিভান: অন্যথা অভিবেদন থেকে তার কোন পার্থক্য নেই।

প্রতিভান ও রূপায়ন

প্রত্যেক যথার্থ প্রতিভান বা উপস্থাপনই—রূপায়ন (expression)। যাহা রূপে আকারিত বা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে না তাকে প্রতিভান বা উপস্থাপন বলা চলে না, তা অভিবেদন (sensation) বা প্রাকৃত বিষয় ছাড়া অন্য কিছু নয়। আত্মা প্রতিভান করে কেবল তখনই যখন সে সৃষ্টি করে, আকার দেয়—রূপনির্মাণ করে। প্রতিভানের অর্থই রূপায়ন (expression)।

রূপায়ন বলতে সাধারণতঃ বাচিক রূপায়ন ধরা হয়, কিন্তু রূপায়ন নানা উপায়ে ঘটতে পারে,—যেমন :—রেখায় বর্ণে, ধ্বনিতে অর্থাৎ মোট কথা যত উপায়ে মানুষ নিজেকে প্রকাশ করতে পারে সব উপায়েই রূপায়ন সম্ভব। আসল কথা—প্রতিরূপ (image) পাওয়া। প্রতিরূপই রেখায়-বর্ণে-স্বরে বাস্তব হয়ে প্রকাশিত হয়।

আমাদের অনুভব ও অভিবেদন, ভাষা অবলম্বন করে আত্মার অজ্ঞেয় প্রদেশ থেকে জ্ঞাতা আত্মার পরিচ্ছন্ন ধারণার মধ্যে উপস্থিত হয়।

> Feelings or impressions, then, pass by means of words from the obscure region of the soul into clarity of the contemplative spirit.

অনেক সময় লোককে বলতে শোনা যায় যে তাদের মনের মধ্যে বড় বড় ভাব আছে, কিন্তু তারা প্রকাশ করতে অক্ষম। কিন্তু কথা এই যে ভাব যদি সত্যই থাকত তা হলে তারা নিশ্চয়ই সুন্দর ও উপযুক্ত ধ্বনিময় শব্দে রূপায়িত করতে পারত। যদি এমন হয় যে প্রকাশ করতে গেলেই ভাবগুলো তিরোহিত হয় বা সংখ্যায় অল্প ও পরিমাণে কম হয়ে যায়, তার কারণ এই যে, হয় ভাবগুলি আদৌ

ছিল না, না হয় খুব অল্পই ছিল। লোকে মনে করে থাকে, যে সকল সাধারণ ব্যক্তিই চিত্র-শিল্পীদের মত দেশ-মূর্তি দৃশ্য প্রভৃতি, ভাস্করদের মত প্রতিমা কল্পনা বা রূপন্বিত করতে পারেন; তবে পার্থক্য মাত্র এই যে চিত্র-শিল্পী বা ভাস্কর চিত্র অঙ্কিত করতে এবং প্রতিমা খোদিত করতে পারেন আর তাঁরা কেবল মনের মধ্যেই সেগুলি বয়ে নিয়ে বেড়ান। এই সব লোক মনে করেন যে র‍্যাফেল অঙ্কিত "ম্যাডোনা" যে কেউই কল্পনা করতে পারত। র‍্যাফেল 'র‍্যাফেল' হয়েছিলেন এই কারণেই যে তিনি পটের ওপর মূর্তি অঙ্কিত করবার কৌশল জানতেন।

এইরকম ধারণা করবার মতন ভুল আর কিছুই হতে পারে না! চিত্রশিল্পী এই কারণেই চিত্র-শিল্পী যে তিনি সেই সব বস্তু সত্যিই দেখেন যা অন্য সকলে কেবল অনুভব করে থাকে বা যার আভাসমাত্র ধরতে পারে কিন্তু দেখে না। আমরা মনে করি বটে যে আমরা একটি স্মিতহাস্য দেখলাম; কিন্তু বস্তুতঃ আমাদের মধ্যে তার অস্পষ্ট প্রতীতি মাত্র থাকে, আমরা শিল্পীর মত তার সমগ্র বৈশিষ্ট্য বা অবয়ব প্রত্যক্ষ করি না। শিল্পী তা করতে সক্ষম বলেই পটের ওপর আঁকতে পারেন। প্রতিভান ও রূপয়ন একই ব্যাপার। প্রতিভান ঘটেছে অথচ রূপয়ন হয় নি—এমন ব্যাপার অসম্ভব। সাধারণের সঙ্গে শিল্পীর পার্থক্য—এই প্রতিভান সামর্থ্যের মধ্যেই; শিল্পী প্রতিভান করতে সমর্থ—সাধারণ লোক প্রতিভানে অসমর্থ।

প্রতিভান ও কলা (Intuition & Art)

কলা-সৃষ্টি ও প্রাতিভানিক জ্ঞান এক ব্যাপার

কলা-সৃষ্টি ব্যাপার এবং প্রাতিভানিক জ্ঞান অভিন্ন, কলা-শিল্প এবং প্রাতিভানিক জ্ঞান একই বস্তু। এই মত অনেক দার্শনিক গ্রহণ করতে চান না। তাঁরা বলেন—স্বীকার করা গেল কলা প্রতিভান, কিন্তু প্রতিভান মাত্রই কলা নহে। কলাশিল্পে বা শৈল্পিক প্রতিভানে (artistic intuition) সাধারণ প্রতিভানের চেয়ে বিলক্ষণ এমন-একটা কিছু থাকে যা তাকে পৃথক শ্রেণীর করে তোলে। কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ এই বিলক্ষণ "এমন একটা কিছু"র লক্ষণ দিতে পারেন নি।

আবার অনেক সময় বলা হয়—কলা সাধারণ প্রতিভান নয়—প্রতিভানের প্রতিভান (intuition of intuitions) অর্থাৎ মানুষ তার অভিবেদনাদিকে রূপ দান করেই কলা-শিল্পের সৃষ্টি করে না, প্রতিভানকে রূপয়িত করেই কলা-সৃষ্টি করে। এই মত অগ্রাহ্য। প্রকৃত কলা শিল্পের মধ্যে আমরা ব্যাপকতর ও যৌগিক প্রতিভান দেখি, কিন্তু তাদের সঙ্গে সামান্য প্রাতিভানিক ব্যাপারের কোনও পার্থক্য নাই। প্রতিভান ছোটই হোক আর বড়ই হোক—প্রতিভান হতে গেলেই অভিবেদনের (sensation) ও প্রতীতির (impression) প্রতিভান হতে হবে।

> What is generally called par excellence art, collects intuitions that are wider and more complex than those which we generally experience, but these intuitions are always of sensations and impressions.

শিল্পীর বৈশিষ্ট্য

কলা-সৃষ্টি বলতে সাধারণতঃ যা ধরা হয় তা এই যে সাধারণতঃ আমরা যে সব প্রতিভান প্রত্যক্ষ করি, তার চেয়ে ব্যাপকতর ও জটিলতর প্রতিভান সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু এই সমস্ত প্রতিভান সব

সময়েই অভিবেদনের ও প্রতীতির প্রতিভান। এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা তাঁদের আত্মার বা মনের জটিল ভাবাবেগ প্রভৃতি সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করতে পারেন। এই লোকদেরই সাধারণ ভাষায় 'শিল্পী' বলা হয়।

শিল্প প্রতিভা

সাধারণ লোকের ও প্রতিভাশালী লোকের মধ্যে প্রকৃতিগত বা গুণগত কোনও পার্থক্য নেই। পরিমাণগত পার্থক্যই গুণগত বৈলক্ষণ্যের মহিমা বলে পূজিত হয়। এই কথাই সকলে ভুলে যায় যে প্রতিভা স্বর্গ থেকে পড়া 'এমন একটা কিছু' নয়; এ মানুষেরই ভিতরকার বস্তু।

> It has been forgotten that genius is not something that has fallen from heaven, but humanity itself.

প্রতিভান কি নির্জ্ঞান

এই প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে যে যাঁরা শৈল্পিক প্রতিভাকে নির্জ্ঞান-ব্যাপার বলে মনে করেন তাঁরা শিল্পীকে তাঁর মানবোত্তর মর্যাদা থেকে নিম্নতর স্তরে নামিয়ে দিয়ে থাকেন। শৈল্পিক প্রতিভা অন্যান্য মানবীয় কর্মের ন্যায় সর্বদাই সজ্ঞান।

> Intuitive or artistic genius, like every form of human activity, is always conscious; otherwise it would be a blind mechanism.

শৈল্পিক প্রতিভানে থাকে না শুধু—reflective consciousness—বিকল্পাত্মক চেতনা অর্থাৎ বিচার, the superadded consciousness of the historian or critic,—ঐতিহাসিক এবং সমালোচকের চেতনা।

কলাশিল্পে বিষয় (content) ও আকার (form)

কলা-শিল্প কি কেবল বিষয়াত্মক না কেবল আকারাত্মক অথবা উভয়াত্মক? যে মতবাদ কলা-সৃষ্টিকে বিষয়মাত্র (content alone) বলে মনে করে—এবং যে মতবাদ শিল্প-সৃষ্টিকে বিষয় ও

আকারের সংযোগ অর্থাৎ বিষয়+(যোগ) আকার, বলে মনে করে এই উভয় মতবাদকেই আমরা বর্জন করব।° শিল্প-সৃষ্টিতে রূপয়ত্রী শক্তিকে প্রতীতির সঙ্গে যোগ করা হয় না, প্রতীতিই এর সাহায্যে রূপয়িত ও পরিবর্ধিত হয়। কলা-সৃষ্টি ব্যাপার রূপয়ন ছাড়া আর কিছুই নহে।

The aesthetic fact, therefore, is form and nothing but form.

এর অর্থ এই নয় যে বিষয় না থাকলেও শিল্প সৃষ্টি সম্ভব। বিষয় না থাকলে শিল্প-কার্য অসম্ভব। কিন্তু বিষয়ের—আকার-হীন বিষয় হিসাবে কোনও নির্দিষ্ট বা নির্দেশ্য বৈশিষ্ট্য নেই। সে বৈশিষ্ট্য থাকলে রূপয়ন ও প্রতীতি একাকার হয়ে পড়ে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে বিষয় তাই যা আকারে পরিণমনীয়, কিন্তু আকারিত না হওয়া পর্যন্ত তার কোনও নির্দেশ্য স্বরূপ পাওয়া যায় না। কারণ বিষয় নির্দেশ্য হয়ে উঠলেই প্রতিভানে পরিণত হয়ে যায়। এই দিক দিয়ে দেখলে, বিষয়—সত্তা হিসেবে নয়, জ্ঞানের দিক দিয়ে 'অসৎ'।

বিষয় কি রমণীয়? (Interesting)

শৈল্পিক বিষয়কে (content) রমণীয় বলেও মনে করা হয়ে থাকে। লক্ষণটা মিথ্যা নয়, তবে উল্লেখযোগ্যও নয়। প্রশ্ন ওঠে কার কাছে রমণীয়? রূপয়নী ক্রিয়ার কাছে? নিশ্চয়ই।

রূপয়নী বৃত্তির কাছে রমণীয় না হলে বিষয়কে তা আকারের বা রূপের মর্যাদায় উন্নীত করবে কেন?

[বিশেষ লক্ষণীয়—রূপয়নী বৃত্তির কামনা আছে এবং আছে বলেই তা কামনার পরিপোষক ও পরিতোষক বস্তু বা বিষয় গ্রহণ করে।]

কলা কি প্রকৃতির-অনুকরণ ?

প্রস্তাবনা :—[বিষয় ও আকারের সম্বন্ধ বিচারের পরে ক্রোচে —কলা প্রকৃতির অনুকরণ (Art is imitation of Nature) এই মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই মতবাদটী প্লেটো এরিস্টটলের সময় থেকে চলে আসছে। প্লেটো অবশ্য কলাকে 'অনুকরণের অনুকরণ' বলে অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটল পোয়েটিক্স্ (poetics) গ্রন্থে কলা সৃষ্টিকে mimesis অর্থাৎ অনুকরণ ব্যাপার (?) বলেছেন। কিন্তু 'মাইমেসিস্' শব্দটির অর্থ নিয়ে "পোয়েটিক্সের" অনুবাদকদের ধারণার মধ্যেই না কি গণ্ডগোল আছে। গিলবার্ট মারে (Gilbert Murray) "ইন্‌গ্রাম বাইওয়াটার" কর্তৃক অনূদিত সংস্করণের ভূমিকায় এই রকম মন্তব্য করেছেন যে এরিস্টটলের মতবাদ বলে 'মাইমেসিস্' শব্দটিকে যেরূপ সংকীর্ণ অর্থ দেওয়া হয় তা যথার্থ নয়। 'মাইমেসিস্' কথাটির মধ্যে— creative power of artও অন্তর্ভুক্ত।]

এবার ক্রোচের বক্তব্য বলা যাক :—"কলা প্রকৃতির অনুকরণ"—এই বক্তব্যটীর নানা অর্থ আছে এই বাক্যটিতে অনেক সময় সত্যের কায়া অথবা ছায়া প্রকাশ পায় ; অনেক সময় অসত্যও প্রচারিত হয়। এর যথার্থ বৈজ্ঞানিক অর্থ পাওয়া যায় তখন যখন অনুকরণ বলতে উপস্থাপন বা প্রতিভান ধরা হয—একে একপ্রকার জ্ঞান মনে করা হয়। আর যখন বাক্যটিকে ঐ অর্থে প্রয়োগ করা হয় এবং ব্যাপারটি যে আত্মিক ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়— এই বিষয়টি যখন জোর দিয়ে বলা যায় তখন অন্য একটি সিদ্ধান্তও অবধারিত হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্তটি এই যে—কলা প্রকৃতির আদর্শায়ন (idealization) অথবা আদর্শায়নাত্মক অনুকরণ (idealizing imitation)। কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণ বলতে যদি এমন কোন কিছু ধরা হয় যে কলা প্রকৃত বস্তুর যান্ত্রিক উপস্থাপন— কমবেশি অবিকল রূপ, এমন উপস্থাপন যাতে প্রকৃত বস্তুর প্রতীতির অবিকল পরম্পরা একের পর এক দেখা দেয়, তা হলে মতবাদটির

মিথ্যাত্ব বিনা প্রমাণেই বোঝা যায়। যাদুঘরের বিচিত্র 'মমী' যা জীবনকে অনুকরণ করে এবং যা দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই, তা কোনও শিল্পপ্রতিভান সৃষ্টি করে না। মায়া (illusion) ও ভ্রান্তির (hallucination) সহিত শৈল্পিক প্রতিভানের প্রশান্ত রাজ্যের কোনও সম্বন্ধ নাই।

Illusion and hallucination have nothing to do with the calm domain of artistic intuition.

অন্যপক্ষে, যদি কোনও শিল্পী মোমময়ী মূর্তিকে বা যাদুঘরের অভ্যন্তরীণ প্রদেশকে চিত্রিত করে, অথবা যদি কোনও অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে মনুষ্যমূর্তির একটা ব্যঙ্গ দৃশ্য দেখায়—সেইসব ক্ষেত্রে আমরা আত্মিক ব্যাপার তথা শৈল্পিক প্রতিভান দেখতে পাই। ফটোগ্রাফির মধ্যে শিল্পের অংশ কতটুকু? যে পরিমাণে তা চিত্র-গ্রাহকের প্রতিভান, তার দৃষ্টিকোণকে প্রতিভাত করে, সেই পরিমাণেই তা শৈল্পিক।

সত্যিই, সবসেরা আলোক-চিত্র দেখলেও কি আমাদের সম্পূর্ণ আনন্দ হয়? হয় না।

কলা ভাব না জ্ঞান?

অনেক সময়েই বলা হয়—কলা জ্ঞান নয় এর সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ নেই; তা জ্ঞানরাজ্যের ব্যাপার নয়—ভাবরাজ্যের ব্যাপার। এই ধরনের কথা উঠে এইজন্য যে প্রতিভান যে জ্ঞানবৃত্তিক ব্যাপার সে-সম্বন্ধে ধারণার অভাব থাকে এবং জ্ঞান বলতে শুধু বৌদ্ধিক জ্ঞানই ধরা হয়। আমরা জানি, প্রতিভান একপ্রকার জ্ঞান এবং প্রতিভানই যখন কলা তখন কলা জ্ঞান-বিশেষ, ভাবব্যাপার নয়। অনেকে কলাকে আভাসন (appearance) বলে মনে করেছেন,—[Art is appearance (Schien)] এবং এই কারণেই করেছেন যে কলার সঙ্গে জটিল প্রত্যক্ষকরণের পার্থক্য রাখা একান্ত দরকার; কলার প্রতিভানিকতা বিষয়ে এরা সচেতন। আবার

যারা—'কলা ভাবাবেগ' (Art is feeling)—এই মত পোষণ করেছেন তারাও ঐ একই কারণে করেছেন। যদি সংজ্ঞা (Concept) কলার বিষয়স্বরূপে গণ্য না হতে পারে, তা হলে বিষয় বলতে—প্রাণাবেগ বা ভাবাবেগ দ্বারা 'তৎক্ষণাৎ ও নির্বিচারে-গৃহীত' 'প্রকৃতি' ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আর তারই নাম প্রতিভান (intuition)।

> For if the concept as content of art and historical reality as such be excluded from the sphere of art, there remains no other content than reality apprehended in all its ingenuousness and immediacy in the vital impulse, in its feeling, that is to say again, pure intuition.

[ক্রোচে এখানে প্রতিভানের আর একটি লক্ষণ দিয়েছেন। লক্ষণটি—

> Reality apprehended in all its ingenuousness and immediacy in the vital impulse, in its feeling.

প্রাণসত্তা ও অনুভব দিয়ে উপলব্ধি—প্রতিভান,—বিশেষ আলোচ্য বিষয়।]

বিশেষ শৈল্পিক ইন্দ্রিয় (Aesthetic senses) আছে কি ?

রূপয়ন যে অভিবেদন বা প্রতীতি থেকে পৃথক—এই কথাটি পরিষ্কারভাবে না বোঝবার ফলেই—'Theory of the aesthetic senses'—শৈল্পিক-ইন্দ্রিয়-বাদের আবির্ভাব ঘটেছে। শৈল্পিক ইন্দ্রিয় কি কি এ প্রশ্ন করাও যে কথা, কোন্ কোন্ প্রতীতির (sensible impressions) রূপয়নে প্রবেশাধিকার আছে—এ প্রশ্ন করাও একই কথা। আমরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারি—সমস্ত ঐন্দ্রিয় প্রতীতিই শৈল্পিক রূপয়নে স্থান পেতে পারে। মহাকবি দাঁতে (Dante) শুধু চাক্ষুস প্রতীতিকেই রূপয়িত করেন নি, ত্বাচ অথবা তাপ উপলব্ধিকেও প্রতিভানের মর্যাদা দিয়েছেন। Sweet colour of the oriental saphire—এ যেমন চাক্ষুস,

তেমনি "dense air" এবং fresh rivulets-এ ত্বাচ এবং তাপ প্রতীতির দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কোনও ছবি থেকে আমরা শুধুই চাক্ষুস উপলব্ধি পাই—এ এক ভ্রান্ত ধারণা।' ছবি থেকে আমাদের কি কপোলের লালিমার, যুবদেহের তেজস্বিতার, ফলের সরসতার ও মিষ্টতার, ধারালো ছুরির বুকের উপলব্ধি ঘটে না? এরা কি কেবল চাক্ষুস উপলব্ধি? আমরা ছবিকে মাত্র চোখ দিয়েই দেখি না, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়েই উপলব্ধি করি।

কেউ কেউ আছেন যাঁরা মাত্র চাক্ষুস (visual) এবং শ্রাবণ বা শ্রৌত (auditive) প্রতীতিকেই (impression) শৈল্পিক যোগ্যতার অধিকারী বলে মনে করেন। তবে এঁরা এইটুকু স্বীকার করতে রাজি আছেন যে চাক্ষুস এবং শ্রাবণ প্রতীতিই প্রত্যক্ষ-ভাবে শৈল্পিক ব্যাপারে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য প্রতীতি আনুষঙ্গিকভাবে (associated) থাকে। এইরকম পার্থক্য নিরূপণ অবান্তর। কারণ শৈল্পিক রূপয়ন—একটা সমন্বয় (synthesis) আর এই সমন্বয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিষয় পৃথক করা অসম্ভব। যখন কোনও ব্যক্তি চিত্রের বা কবিতার বিষয়কে ধারণা করে, তখন প্রতীতিগুলি ক্রমান্বয়ে বা কোনটা প্রধান কোনটা অপ্রধান হয়ে উপস্থিত হয় না। ধারণার পূর্ব পর্যন্ত, কি ঘটেছে না ঘটেছে কিছুই অবগত হয় না।

He knows nothing as to what has happened prior to having absorbed.

[লক্ষণীয়—প্রতিভানের পূর্বকালীন ব্যাপার সম্বন্ধে 'সংজ্ঞান-আমি' একটুও অবহিত নয়। প্রতিভানের আগ পর্যন্ত কবি বা শিল্পী যদি কি ঘটেছে না ঘটেছে অর্থাৎ প্রতিভানের গঠনব্যাপার সম্বন্ধে অচেতন থাকেন তা হলে প্রতিভানিক ব্যাপারটাকে 'সংজ্ঞান' বলা সঙ্গত কি না বিচার্য।]

'বিশেষ ইন্দ্রিয়'—মতবাদটা অন্য একভাবেও উপস্থাপিত করা হয়। রূপটি এই—শৈল্পিক ব্যাপারসম্পন্ন করতে কোন্ কোন্

শারীর তন্ত্রের বা যন্ত্রের দরকার হয়। শরীরতন্ত্র বা যন্ত্র কতকগুলো কোষের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়—নিছক প্রাকৃত ব্যাপার। রূপায়ন শারীর ক্রিয়ার' কোন ধারই ধারে না। যদিও প্রতীতির সঙ্গে তার যোগ আছে, কিন্তু প্রতীতিগুলো কোন্ পথে মনে প্রবেশ করে সে বিষয়ে রূপায়ন সম্পূর্ণ উদাসীন অর্থাৎ তার সঙ্গে রূপায়নের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ কথা সত্যি যে কোনও ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ বিশেষ কোষতন্ত্রের অভাবে বিশেষ বিশেষ প্রতীতি সম্ভব নয়; জন্মান্ধ ব্যক্তি কখনও আলোক প্রতিভানিত বা প্রকাশিত করতে পারে না। কিন্তু প্রতীতিসমূহ শুধু ইন্দ্রিয়েরই অপেক্ষা রাখে না, যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের ওপর কাজ করে তারও অপেক্ষা রাখে। যে ব্যক্তি কখনও সাগর দেখে নি সে যেমন সাগরকে রূপায়িত করতে পারবে না। সেইরকম যার অভিজাত সমাজের সঙ্গে অথবা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তারও তাদের রূপায়িত করবার ক্ষমতা থাকবে না। কিন্তু তাই বলে রূপায়নব্যাপার বস্তুর অথবা ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে একথা স্বীকার্য নয়। একথা সেই পুরানো কথারই পুনরুক্তি—রূপায়ন প্রতীতিসাপেক্ষ, বিশেষ বিশেষ প্রতীতি বিশেষ বিশেষ রূপায়ন সৃষ্টি করে।

কলা-শিল্পের এককত্ব ও অবিভাজ্যত্ব

প্রত্যেক রূপায়নই একক রূপায়ন। রূপায়ন প্রতীতিসমূহের সমন্বয়ে এক জৈব অঙ্গীর (organic whole) সৃজন। কলা-সৃষ্টির বিলক্ষণ স্বরূপ—এককত্ব অথবা বহু-সমবায়ে এক-ত্ব। রূপায়নের অর্থই—বহুর একের মধ্যে সমন্বয়ন (synthesis of the various or multiple in the one)। আমরা যে কলাকে অংশে অংশে ভাগ করি, কবিতাকে চিত্রে, কাহিনীতে, অলঙ্কারে; চিত্রকে মূর্তিতে, পটভূমিতে ইত্যাদিতে ভাগ ভাগ করে থাকি, তার সঙ্গে ঐ মন্তব্যের বিরোধ আছে মনে হতে পারে। কিন্তু একথা সত্যি যে ঐসবে

ভাগ-ভাগ করলেই বিনষ্ট করা হয়, যেমন দেহীকে হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক, স্নায়ু, মাংসপেশী ইত্যাদিতে ভাগ করলে কঙ্কালেই পরিণত করা হয়।

অবশ্য একথা বলা যেতে পারে যে কখনও কখনও রূপায়ন অন্যান্য রূপায়ন থেকে উৎপন্ন হতে পারে, রূপায়ন দুই রকম হতে পারে—এক সরল বা প্রাথমিক (simple) দুই যৌগিক (complex) এবং আর্কিমিডিসের আবিষ্কারের আনন্দ-জ্ঞাপক "ইউরেকা"র এবং পঞ্চাঙ্ক একখানি ট্র্যাজেডির রূপায়নব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য আছে—একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু উত্তর এই যে কোনও পার্থক্যই নেই।

রূপায়ন সর্বদাই সোজাসুজি—প্রতীতি হতেই জন্মে (Expression always arises directly from impression)। যিনি ট্র্যাজেডির লেখক তিনি অনেক পরিমাণ প্রতীতি একগ্রাসে গ্রহণ করে থাকেন; অন্য সময়ে গঠিত রূপায়ন নূতন রূপায়নের উপাদান হয় বটে, কিন্তু রূপায়নস্বরূপে নয়, প্রতীতির পর্যায়ে নেমে গিয়েই হয়। নূতন মূর্তি গঠনের সময়, খণ্ড খণ্ড ব্রোঞ্জ ও ব্রোঞ্জমূর্তি গলিয়ে একাকার হয়ে যেমন নূতন মূর্তির উপাদান হয়ে থাকে, তেমনি নূতন রূপায়নেই পুরাতন রূপায়ন ও অন্যান্য প্রতীতি একাকার হয়ে উপাদানে পরিণত হয়। নূতন রূপায়নে যোগদান করতে হলেই পুরাতন রূপায়নকে প্রতীতির স্তরে নেমে যেতেই হবে।

> The old expression must descend again to the level of impressions in order to be synthesized in a new single expression.

কলা মুক্তিদাতা

নিজের প্রতীতিগুলি সংগ্রহণ এবং সংবর্ধন করে মানুষ তাদের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে থাকে; এদের রূপায়িত তথা অপসারিত করে মানুষ তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। কলার এই মুক্তিদায়িনী ও পাবনী শক্তি বা বৃত্তি (liberating and purifying

function of art) কলার আত্মিক-ক্রিয়াধর্মেরই একটা দিক। ক্রিয়াই মুক্তি দেয় কারণ তা জড়তা দূর করে।

এইজন্যেই শিল্পীদের অপার বেদনা বা আবেগ (passion) এবং অপার শান্তি (serenity)। অপার বেদনা দেখা দেয় নানারকম প্রকাশ্য বা রূপয়নীয় বস্তুর সমাবেশের ফলে আর অসীম প্রশান্তি আসে—রূপয়ন থেকে। কারণ রূপয়নের দ্বারাই শিল্পী প্রতীতি ও আবেগের আলোড়নকে বশীভূত ও প্রশমিত করে থাকেন।

[ক্রোচের এই মতবাদটি শিল্পতত্ত্বশাস্ত্রে "ইনটুইশানিজম্" বা "এক্স্প্রেশানিজম্" নামে প্রচারিত। এবং, বলা বাহুল্য, অন্যান্য মতবাদেরই মতো এই মতবাদটিও সর্বজনস্বীকৃত নয়। শিল্পসৃষ্টি-ব্যাপারটি সম্পূর্ণই প্রাতিভানিক ক্রিয়া এ কথা স্বীকার করতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়েছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ক্রোচে নিজেই বলেছেন—

> The complete process of aesthetic production can be symbolized in four stages which are :—(a) impressions (b) expressions or spiritual aesthetic synthesis (c) hedonistic accompaniment or pleasure of the beautiful (d) translation of the aesthetic fact into physical phenomena.

অর্থাৎ শিল্পসৃষ্টির সমগ্র ব্যাপারটিকে চার পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, (ক) প্রতীতি, (খ) রূপয়ন, (গ) শৈল্পিক আনন্দ বা সৌন্দর্যানুভূতিজনিত আনন্দ, (ঘ) অন্তরের রূপকে বাইরের বস্তুরূপে ব্যক্ত করা। ক্রোচের পক্ষ থেকে অবশ্যই এ কথা কেউ বলতে পারেন—বলেও থাকেন—উল্লিখিত ব্যাপারসমূহের মধ্যে আসল ব্যাপারটি হচ্ছে—রূপয়ন (expression), সৃষ্টি মুখ্যত রূপয়নসাধ্য সুতরাং ক্রোচের সিদ্ধান্তই ঠিক; কিন্তু ঐ যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ আবার এ কথাও বলতে পারেন যে ক্রোচে যখন এ কথা স্বীকার করেছেন—

> The expressive process is exhausted when these four stages have been passed through.

এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে অতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন—

Indeed we do not externalize and fix all the many expressions and intuitions which we form in our spirit, we do not declare our every thought in a loud voice or write it down, or point or draw or paint or expose it to the public. We select from the crowd of intuitions which are formed or at least sketched in us, and the selection is ruled by the criteria of the economic disposition of life and its moral direction.

তখন সমগ্র সৃষ্টিব্যাপারটিকে একমাত্র প্রাতিভানিক বলা সঙ্গত হবে না। কারণ যেখানে 'selection' কাজ করে এবং সেই নির্বাচন অর্থনৈতিক ও নৈতিক ইচ্ছার দ্বারা ও বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সেখানে বুদ্ধির সংস্পর্শ না থেকেই পারে না। যদি বলা যায় যে, প্রতিভানের 'নির্বাচন' বলতে বিশেষ বিশেষ অংশের বা রূপকল্পের নির্বাচন বুঝায় না, এক-একটা গোটা বৃত্তের, কবিতার, ছবির, মূর্তির বা গীতের প্রতিভানের কথা বলা হয়েছে, তা হলেও এই প্রশ্ন জাগবে—সমগ্র একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক, অথবা সমগ্র একখানি মহাকাব্য অথবা সমগ্র একখানি উপন্যাস—এক-একটি গোটা প্রতিভান হতে পারে কি না? সমগ্র বৃত্তের রূপজ-পরিকল্পনা যদি প্রতিভানসিদ্ধ-ব্যাপার না হয় এবং নির্বাচনমূলক ব্যাপার হয়, তা হলে সমগ্র সৃষ্টিব্যাপারকে প্রাতিভানিক বলা চলে না।

তারপর, শিল্পসৃষ্টি-ব্যাপারকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্পক বলা চলে কি না—বিচার্য বিষয়। শিল্পসৃষ্টিকে শুধুমাত্র প্রাতিভানিক ব্যাপারে পরিণত করলে, এই কথাই মানতে হয় যে শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর সংজ্ঞান ইচ্ছা কাজ করে না—শিল্পসৃষ্টি আসলে নিজ্ঞান ব্যাপার।

যদিও ক্রোচে সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন—প্রাতিভানিক বা শৈল্পিক প্রতিভা, সর্বদাই সংজ্ঞান, তবু এ কথা যখন তিনি বলেন—"We can not or not will our aesthetic vision"—অর্থাৎ শৈল্পিক রূপকে আমরা ইচ্ছামত প্রতিভাত বা নিবৃত্ত করতে পারি নে, তখন নিশ্চয়ই তিনি নিজের হাতেই সংজ্ঞান-ইচ্ছার হাত সরিয়ে দেন।

রূপের সৃষ্টি যেখানে ইচ্ছাধীন নয়, প্রতিভান-গঠনে 'will' যেখানে নিষ্ক্রিয়, সেখানে সৃষ্টিব্যাপারকে সংজ্ঞান প্রচেষ্টা বলা চলে না। কলাসৃষ্টি-ব্যাপারকে বিশুদ্ধ প্রতিভানে পরিণত করতে গেলে এই স্বতোবিরোধ এড়ানো সম্ভব নয়। ক্রোচের মধ্যেও এই স্বতোবিরোধ দেখা যায়। অন্য ক্ষেত্রেও একরূপ বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-সৃষ্টি-ব্যাপারকে শুধুমাত্র 'প্রতিভান' বললে—অন্যান্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত আবেগ বা প্রেরণার বৃত্ত থেকে ব্যাপারটিকে বহু দূরে সরিয়ে রাখা হয়—শিল্পের বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্ন, উপযোগ মূল্য এবং সামাজিক-মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। গোড়ার দিকে ক্রোচে তা করেছেনও—বলেছেন—শিল্পের সঙ্গে প্রয়োজনের এবং নীতির কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমরা ক্রোচেকে এমন সিদ্ধান্তও করতে দেখি—সৃষ্টির সমগ্র ব্যাপারটি 'Expression' এবং 'Externalization'—এই দুই ব্যাপার মিলে সম্পূর্ণ হয় এবং শেষোক্ত ব্যাপারটি শিল্পীর আর্থনৈতিক এবং নৈতিক ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করলে এই কথাই স্বীকার করতে বাধ্য—যে শিল্পীর মনের ভিতর থেকে প্রতিভাত রূপটি যখন বাইরে এসে শিল্পবস্তুর রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, তখন তা নিছক একটি রূপমাত্রই নয়, তা, বাহ্যত দেখলে রূপই বটে কিন্তু ঐ রূপের আড়ালে শিল্পীর আর্থনৈতিক ও নৈতিক ইচ্ছার রূপটি প্রকাশিত। ক্রোচে নিজেই বলেছেন 'man-artist'-কে 'artist man' থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা চলে না। চলে না যে তা প্রমাণ করা খুব কঠিন কাজ নয়। ধরেই নেওয়া যাক, শিল্প হচ্ছে 'প্রতিভান'—বিচিত্র প্রত্যয়ের সমবায়ে গঠিত রূপকল্প (image)। তখনই প্রশ্ন হবে—রূপকল্প যে তৈরি হয়, তার উপাদানরাজি সংশ্লেষণ করে কোন্ শক্তি এবং কেনই বা করে? ক্রোচে বলবেন—সংশ্লেষণ করে আত্মা এবং করে এইজন্যই যে রূপটি শিল্পীর আত্মার কাছে উপভোগ্য (interesting)। ক্রোচের উত্তর শুনে আমরা নিশ্চয়ই এ কথা বলতে পারি—'আত্মা যে একরূপ বাদ দিয়ে অন্যরূপ উপভোগ করতে চায়—সেই চাওয়াটাই

প্রতিভানের বিশেষত্ব সৃষ্টি করে এবং ঐ চাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য নানা সংস্কার মিশে থাকে। অর্থাৎ প্রতিভানের মধ্যে শেষপর্যন্ত শিল্পীর ভিতরকার সামাজিক-মানুষটিই ব্যক্ত হয়ে থাকে। সামাজিক-মানুষই যেখানে প্রকৃত স্রষ্টা এবং সামাজিক-মানুষ বলতে যেখানে পরিবেশ-সাপেক্ষ নীতি-নিয়ন্ত্রিত এবং বাসনা-চালিত কোনো ব্যক্তিকেই বুঝায়, সেখানে শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ পরিবেশনিরপেক্ষ নীতি-নিরপেক্ষ এবং প্রয়োজনশূন্য হওয়া সম্ভব হয় না। যে মন সৃষ্টি করে সেই যখন পরিবেশসাপেক্ষ, তখন শিল্পের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না।

নিছক প্রতিভানে পর্যবসিত করায়, শিল্পকে শুধু যে নীতিসম্পর্ক-শূন্য বা প্রয়োজনশূন্য বলে মনে করার ঝোঁককেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে তা নয়—রূপকৈবল্যবাদের ভিত্তিকেও দৃঢ়তর করা হয়েছে—রূপকে বিষয়-নিরপেক্ষ করে রূপের স্বতন্ত্র মহিমা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। শিল্প রূপকর্ম, এ বিষয়ে আপত্তি করার কিছুই নেই, কিন্তু আপত্তি উঠছে সেখানেই যেখানে শিল্পের বিষয়কে নস্যাৎ করে শুধু আকৃতিকেই কৈবল্য করে তোলা হচ্ছে। "শিল্পের কোনো বিষয়বস্তু নেই, আছে শুধু রূপ"—এ সিদ্ধান্তের অর্থ যদি এই হয় যে শিল্পের শিল্পত্বের মাত্রা নির্ভর করে প্রকাশমাত্রার উপরে—তা হলে নিশ্চয়ই আপত্তি করার কিছু নেই; কিন্তু তার অর্থ যদি এই হয় যে শিল্পের রূপ কোনো বিষয়ের রূপ নয়—বিশেষ কোনো প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশিত রূপ নয়—এককথায় নির্বিষয়ক রূপ, তাহলে আপত্তি উঠবেই উঠবে। ক্রোচে নিজেই স্বীকার করেছেন—এক প্রতিভান থেকে অন্য প্রতিভান পৃথক হয় বিষয়ের ভিন্নতার জন্যই। রূপ বিষয়াশ্রয়ী না হয়ে পারে না—বিষয়কে আশ্রয় করেই রূপ ব্যক্ত হয়। এই স্বীকৃতি অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, একদিক থেকে দেখলে যা "রূপ", অন্যদিক থেকে দেখলেই তা "বিষয়েরই অভিব্যক্তি"; রূপ সৃষ্টি করার অর্থ—বিষয়কে সুব্যক্ত করা—সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করা। অর্থাৎ রূপের সৌন্দর্য শুধু সুষমাতেই নিহিত, আপাতদৃষ্টিতে

একথা মনে হলেও রূপের সৌন্দর্য শেষপর্যন্ত রূপের সম্পূর্ণতার মধ্যেই নিহিত—কারণ শিল্পে 'what is expressed is beautiful'—যা প্রকাশিত তাই সুন্দর।

রূপের সম্পূর্ণতা বলতে বুঝায়—বিষয়েরই পূর্ণ অভিব্যক্তি। সুতরাং সিদ্ধান্তে দাঁড়ায় এই যে পরাদর্শের (absolute image) সঙ্গে রূপের যত সাদৃশ্য সেই রূপ তত সুন্দর। ক্রোচে শিল্পবিচারে —প্রতিভাত রূপের সৌন্দর্যমূল্য নির্ধারণ করতে যেয়ে— "absoluteness of imagination"-কেই মান হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে তিনি রূপের সম্পূর্ণতাকেই বা পরাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যের মাত্রাকেই সৌন্দর্যের মাত্রা বলে গ্রহণ করেছেন—সৌন্দর্য-বিচারে বিষয়ের ধারণাকে অপরিহার্য করে তুলেছেন। সুতরাং 'expression' যে-পরিমাণে 'that' সাপেক্ষ সেই পরিমাণেই তা 'content'-নির্ভর। কোনো 'form'-ই 'content'-বিহীন নয়— 'content'-ই ব্যক্ত হয়ে 'form' আখ্যা পায়। এইভাবে 'form' এবং 'content' ব্যাখ্যা করলে 'expression'-এ যেমন 'content'-এর গুরুত্ব স্বীকার করা হয়, তেমনি এ কথাও স্বীকার্য হয়ে পড়ে যে 'what is expressed' আমাদের অভিজ্ঞতারই অন্তর্গত কোনো কিছু—অতএব পরিবেশেরই প্রত্যয় (impressions)-সদৃশ কিছু। প্রতিভান সৃজনশীল কল্পনার সৃষ্টিই হোক আর যাই হোক, যতক্ষণ তা বিষয়ের রূপ বলে স্বীকৃত থাকবে, ততক্ষণ সমালোচকরা লৌকিক বিষয়ের এবং লৌকিক রূপের ধারণার সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করবেনই। শিল্পের বাস্তবতা-অবাস্তবতা বিচার লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পের বিষয়ের এবং রূপের সাযুজ্য এবং সাদৃশ্য যাচাই করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিষয়কে প্রকাশ করার দায়িত্ব থেকে শিল্পকে যতদিন মুক্তি দেওয়া না হবে, ততদিন শিল্পবিচারে বাস্তবতা-অবাস্তবতার প্রশ্ন থাকবেই। ক্রোচের প্রতিভানতত্ত্ব সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করা হল, আশা করি, তা এই অবকাশে যথেষ্ট।

শিল্পতত্ত্বে

'অপূর্ববস্তু'বাদ বা রূপসর্বস্ববাদ

কল্পনাবাদ এবং তার রকমফের প্রতিভানবাদ সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় দেওয়া গেছে, তা থেকে এমন একটা ইঙ্গিত হয়তো অনেকেই পেয়েছেন যে কল্পনাবাদে এবং প্রতিভানবাদে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব, সম্পূর্ণ উপেক্ষিত না হলেও, রূপের (form) গুরুত্বের কাছে অতি তুচ্ছ হয়ে আছে—আচ্ছন্ন হয়ে গেছে যে এবং রূপকে যেহেতু কোনো আইডিয়ার বা বস্তুর অনুকরণ বলে মনে করা হয় নি—রূপের একটি বিষয়নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং মহিমা স্বীকার করা হয়েছে। যেন এমন কথাই বলা হয়েছে যে শিল্পে বিষয়বস্তু উপলক্ষ্য এবং লক্ষ্য হচ্ছে—রূপবৈচিত্র্য—'অপূর্ববস্তু'-র রূপ বিষয় অবলম্বন করে কল্পনা-শক্তির স্বাধীন অনুশীলন করা।

বাস্তবিকই রূপকল্পবাদীদের মধ্যে যাঁরাই 'অপূববস্তু'র দিকে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন, বিষয়নিরপেক্ষ রূপসুষমাকে (হারমনি) শিল্পের লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন—অর্থাৎ রূপের বিষয়সাপেক্ষতা তথা অভিজ্ঞতাসাপেক্ষতা অস্বীকার করেছেন—রূপের সৌন্দর্য যে অভিব্যক্তির সম্পূর্ণতার (perfection of expression) উপর নির্ভর করে—এ কথা অস্বীকার করেছেন, তাঁরা ক্রমশ অপূর্ববস্তু নির্মাণবাদে এবং ঐ মতবাদ—('Configuration'-বাদ) থেকে রীতিবাদে যেয়ে উপস্থিত হয়েছেন। 'অপূর্ববস্তু'বাদ থেকে রীতিবাদ—সামান্য একটি পদক্ষেপ। অপূর্ব রূপের স্বমহিমা বিশ্লেষণ করতে গেলেই, শেষপর্যন্ত আমাদের উপাদান বিন্যাসের বিশেষ রীতিকেই শিল্পের আত্মা বলে স্বীকার করতে হবে। রূপকে বিষয়নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র মর্যাদা দিতে গেলেই এই অবস্থা অনিবার্য। রূপ বলতে

যদি বিশেষ কোনো লৌকিককল্প বস্তুর বা ব্যক্তির আকৃতি বা ধারণার অভিব্যক্তি না, বুঝায় অর্থাৎ রূপ বলতে যদি বস্তুকল্প কোনো অবস্তুর আকৃতি বুঝায় তাহলে রূপের স্বমহিমা বলতে অবশিষ্ট থাকে—শুধু উপাদান-প্রয়োগের বিচিত্র ভঙ্গিমা। ভাস্কর্য হয়—পাথর, মাটি, ধাতু প্রভৃতি উপাদানের বিশিষ্ট বিন্যাস; চিত্র হয়—রং ও রেখা প্রয়োগের বিশিষ্ট রীতি; সংগীত হয়—স্বরের সঙ্গে স্বর জুড়ে নতুন নতুন ঠাট (sound-pattern) তৈরি করা এবং সাহিত্য হয়—বিশিষ্ট পদ-সংঘটনা বা শব্দার্থের চমৎকারিত্ব। রীতিবাদের আলোচনা যথাস্থানে করা হবে—অতএব এখানে এইটুকুই যথেষ্ট।

'অপূর্ববস্তুনির্মাণ'বাদকে ইংরেজিতে বললে, বলা যায়, 'Configuration theory'। এই মতবাদের বিশেষ বক্তব্য এই: প্রত্যেক শিল্পকর্মই নতুন আবিষ্কার—স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র। শিল্প অভিজ্ঞাত লৌকিক বস্তুর অলৌকিক রূপ নয়—নতুন এবং অপূর্ব বস্তুর সৃষ্টি। এক মনের অভিজ্ঞতাকে অন্য মনে সঞ্চার করবার জন্য বা আনন্দকে বা ভাবকে প্রকাশ করার জন্য শিল্পের জন্ম হয় নি; শিল্পের জন্ম হয়েছে—এমন এমন নতুন নতুন রূপ সৃষ্টি করবার তাগিদে যাদের সার্থকতা শুধু চিত্তচমৎকারিতার মধ্যেই নিহিত। রূপের মূল্য ছাড়া শিল্পের আর কোনো মূল্য নেই—

> No functional purposes, neither representing nor expressing, nor pleasing.

('Beauty in Configuration'—Aesthetics & Criticism—P. 218)

বলা বাহুল্য—এ হচ্ছে "absolute value of abstract form-properties independent of sentiment, feeling or representation"—প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। তবে এ চেষ্টাকে অতি-আধুনিক চেষ্টা বললে সম্পূর্ণ সত্যকথা বলা হবে না। সৌন্দর্যকে স্ব-স্বরূপে দেখার প্রবৃত্তি অনেক দিনের পুরানো। সৌন্দর্যকে নিছক হারমনি' বা

'গোলডেন রেশিয়ো'-তে পরিণত করার চেষ্টার মধ্যে এই একই প্রবৃত্তিকেই দেখা গিয়েছিল—এ কথা যেমন বলা বাহুল্য, তেমনি এ কথাও মনে রাখতে হবে যে—পরীক্ষামূলক শিল্পতত্ত্বেও (Experimental Aesthetics) মূলত ঐ একই প্রবৃত্তি—সৌন্দর্যের নিরপেক্ষ লক্ষণ নিরূপণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু যেমন অতীতে, তেমনি বর্তমানেও, সৌন্দর্যের নিরপেক্ষ লক্ষণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি।

এই মতবাদটি গ্রহণ করার পথে যে দুটি বড় বাধা আছে তা নির্দেশ করতে যেয়ে হ্যারোলড ওসবোর্ণ লিখেছেন—(ক) এর বড় বাধা হচ্ছে এই যে রূপের এমন কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্ম বা লক্ষণ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় নি যার সঙ্গে মিলিয়ে কোন রূপকে সুন্দর, কোন রূপকে অসুন্দর বলা যাবে।

> Its main draw back is an inability to define the quality of formal structure in virtue of which some configurations are judged to be good and others bad
>
> – (Aesthetics & Criticism—P. 126)

কারণ সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। যে ধর্ম থাকলে রূপ সুন্দর হয়, তা যদি অনির্বচনীয়ই হয়, তাহলে সমালোচনা বা সৌন্দর্যবিচার ব্যক্তিগত খেয়ালখুসিতে পরিণত না হয়ে পারে না। শ্রদ্ধেয় ক্লাইভ বেল-এর "significant form" সংজ্ঞাটিও আমাদের মূলসমস্যার সমাধানে বিশেষ কোনো সাহায্য করতে পারে নি। কি থাকলে রূপ 'significant' হবে তা যতক্ষণ নির্দিষ্টভাবে জানা যাবে না, ততক্ষণ 'significant' শব্দমাত্রই।

(খ) দ্বিতীয় বাধা—সুন্দর এবং অসুন্দর শিল্পকর্মের মধ্যে যে পার্থক্য তা যদি শুধু আকৃতিগত পার্থক্যই হয়, তাহলে—সুন্দর শিল্পদ্রব্যকে আমরা মূল্যবান বলে মনে করি কেন? বলা বাহুল্য শিল্পের উপযোগমূল্য স্বীকার করলে এ ধরনের কোনো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যেখানে 'উপযোগমূল্য' স্বীকার করা হয় না,

সৌন্দর্যকে আকৃতিগত সুষমা বলে মনে করা হয়, সেখানে এ প্রশ্ন উঠবেই।

ক্লাইভ বেল "significant form"-এর লক্ষণ নিরূপণ করতে যেয়ে যে কথা বলেছেন তা ঠিক যথেষ্ট সন্তোষজনক সমাধান বলা যায় না। "Significant form" হচ্ছে সেই 'form' যা আমাদের মধ্যে 'special kind of emotion' জাগায় এবং ঐ বিশেষ আবেগটি আমাদের বহুকাম্য বলেই রূপটি আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে।

হ্যারোলড ওসবোর্ন তিন উপায়ে এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। ক্লাইভ বেল "বিশিষ্ট আবেগ"-এর পটভূমিতে রূপের 'তাৎপর্য' (significance) ব্যাখ্যা করতে যে চেষ্টা করেছেন তা তাঁর মনঃপূত হয় নি। তিনি "কন্‌ফিগারেশান্‌"-বাদের পক্ষ জোরের সঙ্গে সমর্থন করতে যেয়ে "Organic Unity"-কেই সৌন্দর্য লক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন।

"থিওরি অব বিউটি" (১৯৫২) এবং "ঈস্থেটিকস্‌ অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম্‌" (১৯৫৫)—দুই গ্রন্থেই তিনি "অর্গানিক ইউনিটি-তত্ত্ব" প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর স্থূল সিদ্ধান্তই এই যে সেই সংগঠনই সুন্দর বলে স্বীকৃত যার মধ্যে "অর্গানিক ইউনিটি" থাকে। 'অর্গানিক ইউনিটি' বলতে তিনি বুঝেন—

> A configuration such that the configuration itself is prior in awareness to its component parts and their relations according to discursive and additive principles.

অর্থাৎ সেই ধরনের সংগঠন যার অংশের এবং অংশগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের সবিকল্পক জ্ঞানের আগেই সমগ্র সংগঠনের রূপটি চেতনায় প্রতিভাত হয়। এই বৈশিষ্ট্য থাকলেই সংগঠন সুন্দর হয়। অবশ্য সুন্দরকে "ঐক্যের বা সমগ্রের সুষমা" বলে মনে করা একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার নয়—কোলরিজ যখন বলেছেন—

> The Beautiful is that in which many, still seen as many, becomes one.

তখন একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন অথবা টি. ই. হিউলমের (Hulme) 'intensive manifold'-ও ঐ একই দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছে। সে যাই হোক, "অর্গানিক ইউনিটির" ভাষ্য করতে যেয়ে ওসবোর্ণ মহাশয় যা লিখেছেন—তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—(ক) সমগ্রের ধারণাকে নির্বিকল্পক ব্যাপার (apprehended 'synoptically' as a simple complex whole) বলে মনে করায় তা প্রায় প্রতিভানিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে (খ) "Such synoptic apprehension demands a heightening and tautening of awareness—visual, aural or intellective—far beyond the normal need of practical life—" এ কথা বলে তিনি জন ডিউই-কথিত 'heightened experience' বাদকেই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই স্বীকৃতরই অনিবার্য পরিণতি—নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত :

> Only works of art can demand or provide the material for such intense awareness and their apprehension in appreciation causes that heightening of consciousness, that enhancement of mental vitality which critics have often noticed and attributed to other, inadequate causes. This is why the experience of beauty is valued.

অর্থাৎ সৌন্দর্যকে আমরা যে মূল্যবান বলে মনে করি তার কারণ সুন্দর বস্তু আমাদের চেতনাকে যেরূপ তীব্রভাবে উদ্দীপিত করতে পারে অন্য কোনো বস্তু তেমন পারে না। সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষণে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি—"it makes us more vividly alive."

"Art as Experience" (১৯৩৪) গ্রন্থে জন ডিউই মহাশয় শেষোক্ত এই মতটিকেই বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর বক্তব্যও উল্লিখিত মন্তব্যের অনুরূপ। সাধারণ জীবনযাত্রায়, পরিবেশের নানা বস্তু আমাদের চোখে পড়ে সত্য, কিন্তু তা শুধু চোখে পড়াই। বস্তুটি উপযোগী কি না এই

চিন্তাই তখন প্রবল থাকে এবং তা থাকে বলেই বস্তুটিকে স্বরূপে আমরা দেখতে চাইনে—দেখতে পারিনে। দেখার মতো দেখা—শুধু দেখার-জন্যই-দেখা—সম্ভব হয় না। এই দেখা সম্ভব হয় তখনই যখন আমরা আর সব কথা ভুলে যেয়ে বস্তুটিকে আর দশটা বস্তু থেকে পৃথক করে নিয়ে একমাত্র 'দেখার সামগ্রী' করে তুলি—experience-কে "heighten" করি। বলা বাহুল্য এই দেখা আসলে বস্তুটির রূপ-মাহাত্ম্যই দেখা—সমস্তরকম উপযোগের কথা বিস্মৃত হয়ে একমাত্র রূপের সুষমাটিই দেখা। এই দেখা থেকে যে আনন্দ জন্মে তা অবশ্যই ঐ "heightened experience"-এর আনন্দ—চেতনার উদ্দীপনাজনিত আনন্দ—সংবিদানন্দ।

এই সমস্ত মতবাদ দেখতে শুনতে যত নতুনই হোক আসলে পুরানো। "ঈস্থেটিক অ্যাটিটিউড"-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করতে যেয়ে অনেকেই এই ধরনের কথা বলেছেন এবং এখনও বলে থাকেন। "ঈস্থেটিক অ্যাটিটিউড" বলতে যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বুঝায় তার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে এই কথাই বলা হয়ে থাকে যে তাতে দ্রষ্টার ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, আর্থ-রাজনৈতিক, এককথায় ঔপযোগিক প্রবৃত্তি বা হিসাব থাকে না, থাকে শুধু একটিমাত্র প্রবৃত্তি—বিষয়কে তার রূপের স্বমহিমায় দেখার ইচ্ছা। এই দৃষ্টির নামই সৌন্দর্য দৃষ্টি। "Intensified manifold", "heightened experience", "synoptic apprehension" এই দৃষ্টিরই ভিন্ন ভিন্ন উপাধি।

Bullough এর "Psychical Distance"—মতবাদটিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দেখতে-শুনতে নতুন বলে মনে হলেও আসলে তাতে পুরাতন 'ঈস্থেটিক অ্যাটিচিউড'-কেই মনস্তত্ত্বের রং মাখিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। "Heightened experience" যেমন সমস্ত উপযোগ-চিন্তা থেকে মুক্ত করে 'experience'-কে উপভোগ করার চেষ্টা, 'synoptic apprehension' যেমন 'experience-কে 'heightened' করে দেখার চেষ্টা, তেমনি বিষয়কে সর্বপ্রকার

প্রয়োজনের দৃষ্টি থেকে দূরে রেখে, অর্থাৎ শুধু স্বরূপে দেখার চেষ্টার নাম—"psychical distance'-এ রেখে দেখা। বলা বাহুল্য উল্লিখিত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিষয়কে স্বমহিমায় দেখার চেষ্টা এবং রূপের একটি নিরপেক্ষ সৌন্দর্যসত্তা স্বীকারের প্রবৃত্তি বর্তমান।

রীতিবাদ

এই প্রবৃত্তিরই চরম অভিব্যক্তি দেখা যায়—রীতিবাদে। আগেই বলেছি, শিল্পকে অভিজ্ঞতাবহির্ভূত অর্থাৎ 'অপূর্ব বস্তুর কল্পনা' বলে মনে করলে—অপূর্ব আকৃতির সংগঠন বলে স্বীকার করলে, শেষপর্যন্ত উপাদান-বিন্যাসের বিশেষ রীতিকেই শিল্পের আত্মা বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ যা যথার্থ 'অপূর্ব-আকৃতি' তা অবশ্যই অভিজ্ঞাত বস্তুর আকৃতির বহির্ভূত হতে বাধ্য এবং তা হওয়ার অর্থই এই যে সেই আকৃতিটি কোনো বস্তুর আকৃতি নয়—আসলে 'মাধ্যম' বা উপাদানের বিচিত্র বিন্যাসের ফল। চিত্রশিল্পে কিউবিস্টসম্প্রদায় এই দিকে উল্লেখযোগ্য ঝোক দিয়েছিলেন। Maurice Denis এর ঘোষণা—

> It must be recalled that a picture—before it is a picture of a battle horse, nude woman or some anecdote—is essentially a plane surface covered by colours arranged in a certain order. (১৮৯০)

অর্থাৎ চিত্র যুদ্ধের ঘোড়ার চিত্র, নগ্ন নারীর চিত্র অথবা কোনো ঘটনার চিত্র—যার চিত্রই হোক না কেন ঐ সব বস্তুর চিত্র হওয়ার আগে চিত্র মুলতঃ সমতল ক্ষেত্রের উপরে বিশিষ্ট রীতিতে বর্ণের বিন্যাস—এই সিদ্ধান্ত বিষয়ের "রূপ" থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে রূপরচনার উপকরণ ও বিশিষ্ট রীতির উপরে দৃষ্টিকে আবদ্ধ করেছিল। এর ফলে শিল্পের সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল—শিল্পের 'মাধ্যম' (মিডিয়াম) বা উপাদানকে বিশেষ রীতিতে প্রয়োগ করা। শিল্পের উৎকর্ষ হল—প্রয়োগকৌশল। এঁদের হাতে চিত্র হল—

রং ও রেখার বিচিত্র সমাবেশ, সংগীত হল স্বর ও শব্দের বিচিত্র বিন্যাসের কৌশল এবং সাহিত্য হল—শব্দার্থে বিচিত্র ভঙ্গিমায় বিন্যাস—বিশিষ্ট পদসংঘটনা—অলংকৃত বাক্য—বক্রোক্তি। সংস্কৃত আলংকারিকদের মধ্যে যাঁরা—অলংকৃত বাক্যকেই অথবা অদোষ ও সগুণ শব্দার্থকে কাব্যের লক্ষণ বলে নির্দেশ করেছেন, অথবা রীতিকে বা বক্রোক্তিকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন, তাঁরা মূলতঃ রীতিবাদীই—কারণ, তাঁদের কাছে কাব্যত্বের লক্ষণ ভাবের অভিব্যক্তিতে বা রসনিষ্পত্তির মধ্যে নিহিত নয় এবং রস বা বস্তু ধ্বনিত করাও কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের কাছে কাব্যত্ব শব্দার্থের বিশিষ্ট প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যেই নিহিত।

বলাবাহুল্য, এই মতবাদটিতে বিষয়বস্তুর রূপ এবং গৌরব অতিতিরস্কৃত হয়েছে এবং প্রকাশ-কৌশল—প্রকাশ-মাধ্যমের (মিডিয়াম) বিন্যাস-কৌশলকেই (configuration) একমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এককথায়, বিন্যাস-রীতির সুষমাকে নিরপেক্ষ সত্তা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এই মতবাদ স্বীকার করার পথে বড় একটি বাধা রয়েছে। এ কথা ঠিক বটে যে রূপ তৈরি করতে গেলেই উপাদানকে বিশেষ রীতিতে বিন্যস্ত করতে হবে এবং রূপের উৎকর্ষ বিন্যাস-কৌশলের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয়—শিল্পে বিষয়নিরপেক্ষ রূপ নেই এবং রীতিরও রূপনিরপেক্ষ কোনো স্বমহিমা নেই। দ্বিতীয়ত এই মতবাদ স্বীকার করলে, মহান শিল্পের (great art) এবং সুন্দর শিল্পের (good art) পার্থক্য নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ মহান শিল্পকে আকারে-প্রকারে উভয়তই মহান হতে হবে। বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব না থাকলে কিছুতেই মহান শিল্প সৃষ্টি করা যায় না। ওয়ালটার পেটার মহাশয় তাঁর "স্টাইল" প্রবন্ধে এ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি লিখেছেন :

It will be good literary art not because it is brilliant or

sober or rich or impulsive or severe, but just in proportion as its representation of that sense, that soul-fact, is true...

অর্থাৎ রূপের যাথার্থ্যের পরিমাণ অনুসারেই শিল্পের উৎকর্ষের পরিমাণ, * তবু এ কথাও বলেছেন প্রকাশ্য বা নির্বচনীয় বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারেই শিল্পের মহত্ত্বের তারতম্য ঘটে থাকে।—

> The distinction between great art and good art depending immediately, as regards literature at all events not on its form, but on the matter....It is on the quality of the matter it informs or controls, its compass, its variety, its alliance to great ends, or the depth of the note of revolt or the largeness of hope in it, that the greatness of literary art depends....

পেটারের এই সিদ্ধান্ত সত্য বলে স্বীকার করলে—না করে উপায় নেই—'প্রকাশ-মাধ্যমের বিন্যাসভঙ্গিমাকেই' শিল্পের মুখ্য লক্ষণ বলা চলবে না। এমন কি পেটার যাকে 'good art' বলেছেন, সেই 'good art'-ও রীতিসর্বস্ব বা অলংকারৈকপ্রাণ কোন বস্তু নয়, কারণ "Style" কোন ব্যক্তির খেয়ালখুশি বা খেলা নয়—

> The style, the manner, would be the man not in his unreasoned and really uncharacteristic caprices, involuntary or affected, but in absolutely sincere apprehension of what is most real to him.

এই "absolutely sincere apprehension of what is most real to him" থেকেই—"absolute correspondence

---

* লক্ষণীয়—ওয়ালটার পেটার কিন্তু রীতিবাদী নন। 'স্টাইল' প্রবন্ধের তাৎপর্য সম্যক অনুধাবন করতে না পারায় অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝে থাকেন। 'স্টাইল' বলতে পেটার কি বুঝাতে চেয়েছেন এক উক্তি থেকেই উপলব্ধি করা যাবে—"All beauty is in the long run only fineness of truth or what we call expression, the finer accommodation of speech to that vision within." পেটারের 'স্টাইল' "The unique word, phrase sentence, paragraph, essay or song, absolutely proper to the single mental presentation or vision within." নিছক শব্দালংকার বা অর্থালংকার নয়, অন্তরস্থ ধ্যানের অদ্বিতীয় অভিব্যক্তি—পরাকাষ্ঠা নির্বচন।

of the term to its import."* অর্থাৎ স্টাইল, সম্ভব হয়। যখন অন্তরের ঐকান্তিক উপলব্ধি বা ধ্যানধারনাকে (vision) যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে পারার মধ্যেই স্টাইলের সার্থকতা এবং সেই রীতিই সুন্দর ও সার্থক রীতি যা ঐ ধ্যানকে নিখুঁতভাবে ব্যক্ত করতে সমর্থ, তখন স্টাইলের বা রীতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের মান—নিশ্চয়ই স্টাইলের কোন পরাদর্শ নয়, বিচারের শেষ মান—ধ্যানেরই বিশেষ রূপ বা প্রকৃতি। স্টাইলের স্বতন্ত্র মহিমা স্বীকার করলে ঘুরে ফিরে সেই একই বাধার সম্মুখীন হতে হবে—উপাদানের এক ধরনের বিন্যাস বা প্রয়োগরীতি কেন আনন্দ দেয় অন্য ধরন কেন আনন্দ দেবে না, তার কারণ নির্দেশ করা কঠিন হবে—কারণ নির্দেশ করতে absolute style-এর দোহাই পাড়তে হবে—বলতে হবে যে বিন্যাস চেতনাকে বেশি করে উদ্দীপিত করে সেই বিন্যাসই অধিকতর সমর্থ ও সুন্দর। এই কারণেই—বিশুদ্ধ রীতিবাদীর কাছে শিল্পের সমালোচনা আসলে রীতি বা বিশুদ্ধ স্টাইলের আলোচনা ; বাস্তবতা অবাস্তবতা বিচারের, অথবা বিষয়ের গুরুত্ব বিচারের কোন অবকাশ সেখানে নেই। আর যেহেতু রীতি বা স্টাইল বিষয়নিরপেক্ষ, সমালোচকের একমাত্র কাজ—absolute style-এর দোহাই পেড়ে পেড়ে, মনগড়া রায় দিয়ে যাওয়া। 'দেখতে সুন্দর', 'শুনতে মধুর'—এই কথা ছাড়া বিশুদ্ধ রীতিবাদীর আর কি বলার থাকে ?

---

* "সাহিত্য" শব্দটির তাৎপর্যও একই। শব্দের ও অর্থের সাহিত্য এবং absolute correspondence of the term to its import" একই কথা। সাহিত্য নিছক শব্দার্থ নিয়ে খেলা নয়, অর্থকে প্রকাশ করতে পারার মধ্যেই শব্দের সার্থকতা এবং তাতেই সাহিত্য—তাতেই "স্টাইল"।

শিল্পতত্ত্বে Infection Theory বা সঞ্চারবাদ (Communication Theory)

সঞ্চারবাদ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করার আগেই পাঠকবর্গের দৃষ্টিকে বিশেষ একটি বিষয়ে আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি এই যে অনুকরণবাদের পরে যে কয়টি মতবাদ উপস্থাপিত হয়েছে— (কল্পনাবাদ থেকে রীতিবাদ পর্যন্ত) তাদের মধ্যে আমরা বিশেষ একটি প্রবৃত্তির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। অনুকরণবাদের পরিব্যাপ্তি সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে এই কথাটাই স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে যে অনুকরণ মূলতঃ কল্পনাত্মক ব্যাপার বটে কিন্তু অনুকরণ আসলে বিশেষ বস্তু বা বিষয়েরই রূপনির্মাণ—শিল্প আসলে মানুষের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক উপলব্ধির প্রকাশ—বাহ্য ও আন্তর প্রকৃতির উপলব্ধিকে বিশেষাকারে ব্যক্ত করার চেষ্টা। মোটকথা অনুকরণবাদে বিষয়ের ও রূপের উভয়েরই সমান গুরুত্ব এবং শিল্পীর কল্পনা বাস্তববিষয়বস্তু-কেন্দ্রিক। কল্পনাবাদে কল্পনাশক্তির বাস্তববিষয়কেন্দ্রিকতা অপেক্ষাকৃত কম এবং অপূর্ববস্তুনির্মাণের দিকে ঝোঁক বেশি। অবশ্য সেই অপূর্ব বস্তু কিম্ভূতকিমাকার পর্যায়ের কিছু নয়। অর্থাৎ কল্পনাবাদে যদিও শিল্পী তার বাহ্য ও আন্তর পরিবেষ্টনী থেকে বেশ একটু আলগা হয়ে দাঁড়িয়েছেন,—অভিজ্ঞতাকে স্থান-কাল-পাত্র থেকে বিযুক্ত করে নানাভাবে সাজানো-গোছানোর (mental manipulation) অধিকার পেয়েছেন, তবু তিনি শেষপর্যন্ত পরিবেশেরই অধীন হয়ে আছেন। তাঁর কল্পনা পরিবেশনিয়ন্ত্রিত, পরিবেশসাপেক্ষ হয়ে আছে। ক্রোচের প্রতিভানবাদে শিল্পীকে পরিবেশ থেকে আরো বিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। যেমন শিল্পীর অন্তর্মুখিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, তেমনি সৃষ্টিব্যাপারটিকে পুরোদস্তুর নির্বিকল্পক ব্যাপারে

পরিণত করা হয়েছে। অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদে (Configuration Theory) শিল্পীর পরিবেশসাপেক্ষতার মাত্রা আরো কমিয়ে দিয়েছে—অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে শিল্পের যে যোগসূত্র তা আরো ছিন্ন করে দিয়েছে এবং বিষয়কে আচ্ছন্ন বা বিলুপ্ত করে দিয়ে শুধু রূপ-সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলবার নির্দেশ দিয়ে পরিবেশসাপেক্ষতাকে প্রায় মুছেই দিয়েছে। রীতিবাদে এই প্রবৃত্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁচেছে—শিল্পীকে ঋষির ও মনীষীর আসন থেকে নামিয়ে এনে হাতিয়ার-সর্বস্ব যন্ত্রকুশলীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শিল্পীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপাদান-বিন্যাসরীতির ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সঞ্চারবাদে এই প্রবৃত্তিটিরই বিপরীতপ্রবৃত্তি ব্যক্ত হয়েছে—শিল্পীর ব্যক্তিসত্তাকে এবং শিল্পিসত্তাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলে গণ্য করা হয় নি—শিল্পীকে সামাজিক ব্যক্তি হিসাবেই এবং শিল্পসৃষ্টিকে সামাজিকের কাছে সামাজিকের অভিজ্ঞতা ও ভাব-সঞ্চারের উপায় হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। সঞ্চারবাদে যে প্রবৃত্তিটি ব্যক্ত হয়েছে, তার প্রথম অপরিস্ফুট রূপটি পাওয়া যায় অনুকরণবাদে। বাস্তববিষয়সাপেক্ষতা এবং বাস্তববিষয়নিরপেক্ষতা—এই দুইটিকে যদি প্রবৃত্তির দুই মেরু কল্পনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে—অনুকরণবাদ নিঃসন্দেহে বিষয়সাপেক্ষ—সে বিষয় রূপ বা ভাব যাই হোক না কেন। কিন্তু অনুকরণবাদ বিষয়সাপেক্ষতা স্বীকার করলেও—অনুকরণ-প্রবৃত্তি এবং অনুকৃতিকে সুষমাময় করার প্রবৃত্তি—এই দুই প্রবৃত্তিকে সৃষ্টির প্রেরণা হিসাবে গ্রহণ করায়, সুস্পষ্টভাবে সমাজ-সচেতন হতে পারে নি। এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলে নি যে সমাজের আর দশজনের কাছে রূপের ও ভাবের অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করার প্রেরণা থেকেই শিল্পের সৃষ্টি। সঞ্চারবাদের বিশেষত্ব এখানেই—সামাজিকের মনে ভাব সঞ্চার করার প্রবৃত্তিকেই সঞ্চারবাদ "প্রেরণা"র মর্যাদা দিয়েছে। মহামতি টলস্টয় এই মতবাদটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর "হোয়াট ইজ আর্ট" গ্রন্থে তিনি পূর্ববর্তী

সমস্ত মতবাদ খণ্ডন করতে চেষ্টা করেছেন এবং জোরের সঙ্গে নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বোমগার্টেন (১৭১৪-১৭৬২) থেকে আরম্ভ করে "নাইট" পর্যন্ত (১৮৯৩) যে সব প্রধান প্রধান শিল্পতত্ত্বকার আছেন তাঁদের সিদ্ধান্তের সারাংশ পূর্বপক্ষ হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন, সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিরূপণে যে সব চেষ্টা হয়েছে তাদের মোট দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক :

> The first is that beauty is something having an independent existence (existing in itself), that it is one of the manifestations of the absolutely Perfect, of the Idea, of the Spirit, of Will, or of God.

দুই :

> The other is that beauty is a kind of pleasure received by us not having personal advantage for its object.

প্রথম শ্রেণীর সংজ্ঞাদের টলস্টয়—'objective mystical definition' তথা 'fantastic definition' এবং দ্বিতীয়টিকে 'subjective' এবং 'inexact' বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে সৌন্দর্যের ভিত্তিতে শিল্পের সংজ্ঞা তৈরি করতে যাওয়া ঠিক হবে না। নতুন ভিত্তির উপরে শিল্পতত্ত্বকে দাঁড় করাতে হবে। প্রশ্ন—কি সেই নতুন ভিত্তি? সৌন্দর্যের ধারণাকে বাদ দিয়ে শিল্পতত্ত্ব গোড়ে তোলার যে যে চেষ্টা হয়েছে টলস্টয় তাদেরও তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখিয়েছেন ১। (ক) ডারুইন শিলার স্পেন্সার—প্রভৃতির ধারণা—springing from sexual desire and the propensity to play, (খ) গ্র্যান্ট এলেন-এর physiological evolutionary definition—খেলার সময় স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে সুখদায়ক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২। ভেরনের "experimental definition"—শিল্প হচ্ছে রেখা, রঙ, গতি, শব্দ বা ভাষার সংকেতে মানুষের আবেগের অভিব্যক্তি। ৩। Sully-র দেওয়া অতি-আধুনিক সংজ্ঞা :

Art is the production of some permanent object or passing action which is fitted not only to supply an active enjoyment to the producer, but to covey a pleasurable impression to a number of spectators or listeners, quite apart from any personal advantage to be derived from it.

টলস্টয় এই সংজ্ঞাগুলিকে আগের পরাতত্ত্বভিত্তিক সংজ্ঞার চেয়ে "Superior" বলে মনে করলেও নির্দোষ বলতে পারেন নি। প্রথমটির দোষ দেখাতে যেয়ে দেখিয়েছেন—শিল্পকর্মের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু না বলে প্রেরণার কথাই বলা হয়েছে। দ্বিতীয়টি অতিব্যাপ্তিদোষদুষ্ট—কারণ শারীর ক্রিয়ার উত্তেজনা নানা কারণেই সম্ভব। তৃতীয়টির দোষ এই যে, রেখা-রঙ ভাষার মাধ্যমে আবেগের প্রকাশ করলেই শিল্প হয় না। অনেকের মনে যা প্রভাব বিস্তার করে না, তাকে শিল্প বলা যায় না। চতুর্থ—সালির সংজ্ঞাটিও অতিব্যাপ্ত কারণ যে বস্তুর বা ক্রিয়ার রূপ দেখে স্রষ্টার বা দর্শকের মনে নিষ্কাম আনন্দ জন্মে সেই বস্তু বা ক্রিয়া শিল্প নাও হতে পারে—যেমন যাদু বা শারীরিক ব্যায়াম প্রভৃতি শিল্প নয়। তারপর শিল্প থেকে দশকরা যে সব ক্ষেত্রেই আনন্দ সংবেদনা পেয়ে থাকেন, তাও বলা যায় না; হৃদযবিদারক করুণ কবিতা বা নাটক দুঃখ বেদনাই জাগিয়ে থাকে।

টলস্টয় পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির ত্রুটি দেখিয়ে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে সংজ্ঞাগুলি শিল্পের প্রেরণা বা আনন্দ-মূল্যের দিকে যত দৃষ্টি রেখেছে উদ্দেশ্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখে নি। শিল্পের খাঁটি সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হলে—তিনি বলেন—

It is necessary first of all to cease to consider it as a means to pleasure, and to consider it as one of the conditions of human life.

'শিল্পকে আনন্দের উপায় মনে করার অভ্যাস ছাড়তে হবে—শিল্পকে মানবজীবনেরই অন্যতম ব্যবহার বা আচরণ হিসাবে গণ্য করতে হবে।' শিল্প—"means of intercourse between man

and man" শিল্প সামাজিকের সঙ্গে সামাজিকের ভাববিনিময়ের উপায়—অর্থাৎ একের ভাবাবেগকে অন্যের মধ্যে সঞ্চার করার প্রবৃত্তি থেকেই শিল্পের জন্ম হয়েছে। ভাবাবেগ এক হৃদয় থেকে অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়—একের হাসি অন্যকে আনন্দ দেয়, একের কান্না অন্যকে ব্যথিত করে তোলে—এই পারস্পরিক ভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ব্যাপার আছে বলেই শিল্পের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। অপরের ভাবকে গ্রহণ করার এবং সেই ভাবকে দশের হৃদয়সংবেদ্য করার ক্ষমতা আছে বলেই মানুষ শিল্প সৃষ্টি করতে এবং শিল্প আস্বাদন করতে পারে। টলস্টয়ের মতে—শিল্পের কাজ—

> To evoke in oneself a feeling one has once experienced and having evoked it in oneself then by means of movements, lines, colours, sounds or forms expressed in words, so to transmit that feeling that others experience the some feeling.

অনুভূত আবেগকে পুনরুদবোধিত করা এবং তা করার পরে গতি, রেখা, বর্ণ, শব্দ বা শব্দময় রূপের সাহায্যে সেই আবেগকে এমনভাবে আর দশজনের মনের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাতে তারাও অনুরূপ আবেগ উপলব্ধি করতে পারে। শিল্প এই অর্থেই সামাজিক মানুষের অন্যতম আচরণ—গোষ্ঠীর মনের কাছে ব্যষ্টির অনুভূতিকে সঞ্চার করে দেওয়ার উপায়বিশেষ। শিল্প—সামাজিক মানুষের বিশেষ অভিপ্রায়ের সৃষ্টি। সমাজের কোন একটি ব্যক্তি বাহ্য সংকেতের সাহায্যে তার ভাবাবেগকে সমাজের আর দশজনের কাছে ব্যক্ত করছে, সেই আর দশজনের মধ্যে ঐ ভাবাবেগ সংক্রমিত হচ্ছে এবং অনুরূপ ভাবাবেগ জাগাচ্ছে—তারই নাম শিল্পসৃষ্টি। শিল্প কোন রহস্যময় সৌন্দর্যের বা ঈশ্বরের অভিব্যক্তি নয়, শিল্প কোন বাড়তি শক্তির স্ফূরণ বা খেলা নয়, শিল্প নিছক আবেগের প্রকাশ নয়, শিল্প কোন আনন্দজনক বস্তুর নির্মাতা নয় বা আনন্দের প্রকাশ নয়; শিল্প হচ্ছে, মানুষের মধ্যে সহানুভূতির

যা সহৃদয়তার দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি করার উপায় এবং ব্যক্তির এবং সমষ্টির অভ্যুদয়ের জন্য তা অপরিহার্য।*

টলস্টয়ের "Infection Theory" বা "Intercourse or Communication Theory"-র প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য কি তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; এখানে টলস্টয়ের মতবাদের পক্ষে-বিপক্ষে যা বলার সেই সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি। আগেই বলেছি টলস্টয়ের মতবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে তিনি শিল্পীকে সমাজসাপেক্ষ এবং শিল্পকে প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি বলে মনে করেছেন এবং পরোক্ষভাবে তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন যাঁরা শিল্পকে অতিপ্রাকৃত এবং অতীন্দ্রিয় কোন সত্তার অভিব্যক্তি বলতে চেয়েছেন, অথবা যাঁরা শিল্পীকে পরিবেশনিরপেক্ষতা বা স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন এবং শিল্পকে রহস্যময় ব্যক্তিমনের নিগূঢ় কামনার প্রকাশ বলে, নিছক আত্মপ্রকাশ বলে মনে করেছেন। একদিকে তিনি রহস্যময় অতিপ্রাকৃতের আওতা থেকে, অন্যদিকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বা স্বাধীন কল্পনার কাল্পনিক ধারণার আওতা থেকে শিল্পকে মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন—শিল্পকে সামাজিক মানুষের জীবনযাপনের প্রচেষ্টার তথা প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করে দেখিয়েছেন। অবশ্যই এ চেষ্টা প্রশংসনীয় এবং যাঁরাই পরাতত্ত্ববিমুখ বা ব্যক্তি-আত্মার নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যে অবিশ্বাসী তাঁরাই টলস্টয়ের এই

* Art is not, as the Metaphysicians say, the manifestation of some mysterious Idea of beauty or God; it is not, as the aesthetic physiologists say, a game in which man lets off his excess of stored-up energy; it is not the expression of man's emotions by external signs; it is not the production of pleasing objects; and, above all it is not pleasure; but it is a means of union among men joining them together in the same feeling, and indispensable for the life and progress towards well-being of individuals and of humanity.

(What is Art—Tolstoy—P. 123)

প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ দেবেন। এ কথাও স্মরণীয় যে বস্তুবাদীদের মধ্যে যাঁরা মানুষের সত্তাকে শুধুমাত্র সহজাত প্রবৃত্তির (instincts) অথবা সংজ্ঞান-আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র বলে মনে করবেন না, মানুষকে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিকসত্তার সমবায় বলে মনে করবেন, তাঁরা সকলেই এই দৃষ্টিতেই শিল্পী ও শিল্পকে বিচার করবেন। যাই হোক, শিল্প যে 'communication' এই সত্যটির দিকেই টলস্টয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। দ্বিতীয়তঃ টলস্টয়ের সিদ্ধান্ত এই যে শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য—ভাবাবেগ ব্যক্ত করা এবং ভাবাবেগের দ্বারা দর্শক-পাঠকের চিত্তে অনুরূপ ভাবাবেগ উদ্রিক্ত করা। প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সামাজিক ঘটনা দেখে ব্যক্তির মনে ভাবাবেগ জাগে, ব্যক্তি সেই আবেগকেই কোন উপায়ে ব্যক্ত করতে—সামাজিকের মনে সঞ্চার করতে—চেষ্টা করেন—এই সিদ্ধান্তের অনুসিদ্ধান্ত এই যে শিল্পী রূপ সৃষ্টির জন্যই রূপ সৃষ্টি করেন না—"রূপ" ভাব-প্রকাশেরই উপায়মাত্র। কেউ যদি এমন প্রশ্ন তোলেন যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র বা কবিতা কোন্ ভাব প্রকাশ করে? টলস্টয়ের উত্তরে হবে—নিসর্গের চিত্রে বা বর্ণনায় মূলতঃ বিশেষ কোন ভাবই ব্যক্ত হয়ে থাকে। ভাব-নিরপেক্ষ রূপোপলব্ধি কোথায়? কবি বা চিত্রকর যখন কোন সন্ধ্যার বর্ণনা করেন বা সন্ধ্যার ছবি আঁকেন, তখন আসলে—"feeling of quietness transmitted by an evening landscape"-কেই ব্যক্ত করেন এবং পাঠকের বা দর্শকের চিত্তে সন্ধ্যার শান্ত-সমাহিত ভাবটিকেই সঞ্চারিত করতে চেষ্টা করেন। আমাদের রসবাদীদের সঙ্গে টলস্টয়ের এখানে যথেষ্ট ঐক্য রয়েছে। রসবাদের বিপক্ষে যে-সব অব্যাপ্তিদোষ দেখানো হয়েছে—টলস্টয়ের বিরুদ্ধেও সেই সব যুক্তি দেখানো যেতে পারে। অতএব এ প্রসঙ্গের উপসংহার এখানেই।

শিল্পীর উদ্দেশ্য 'ভাব'কে (feelings & emotions) প্রকাশ করা—এ সিদ্ধান্তে সকলের সমান সম্মতি না থাকলেও, শিল্প-

সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য—"communication"—এ কথা অনেকেই স্বীকার করেছেন। আমরা দেখি—আই. এ. রিচার্ডস্ মহাশয় (প্রিন্‌সিপল্‌স্ অফ্ লিটারারি ক্রিটিসিজম্ গ্রন্থে) এই মতবাদটিকে খুব জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন তাঁর সিদ্ধান্ত—

> The two pillars upon which a theory of criticism must rest are an account of value and an account of communication.

রিচার্ডস মহাশয় মানুষের জীবনে "কমুনিকেশান্'-এর গুরুত্ব, মনের গঠনে ভাবপ্রকাশ-চেষ্টার প্রভাব, মানুষের অভিজ্ঞতার বা মনোভাবের সংগঠনে সমাজের নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন এবং এই কথাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে প্রকাশের জন্য ভাব থাকা চাই বটে কিন্তু ভাব ব্যক্ত করার তাগিদ থাকে বলেই এক ছেড়ে অন্য ভাব নির্বাচন করা হয়, এবং ব্যক্ত করার বা সঞ্চার করার তাগিদই ভাবের নির্বাচন তথা শিল্পকর্মের প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে থাকে—* এ কথা অবশ্য ঠিক যে সবক্ষেত্রে শিল্পীরা ভাব ব্যক্ত করার তাগিদ সম্বন্ধে সচেতন থাকেন না, কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পরে তাঁদের একমাত্র কর্তব্য হয়, শিল্পকর্মটিকে সুচারু ও সম্পূর্ণ করে তোলা, এ কথাও কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য যে প্রচার-প্রবৃত্তির আধিক্যে শিল্পকর্মের উৎকর্ষহানি ঘটে, কিন্তু—রিচার্ডসের সুস্পষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত—

> But this conscious neglect of communication does not in the least diminish the importance of the communicative aspect. It would only do so if we were prepared to admit that only our conscious activities matter. The very process of getting the work 'right' has itself, so far as the artist is normal, immense communicative consequences.—P. 27.

* An experience has to be formed no doubt before it is communicated, but it takes the form it does largely because it may have to be communicated.

মোটকথা, রিচার্ডস মহাশয় বলতে চান—শিল্পী জ্ঞাতসারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই করুন, দশের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগ করে থাকেন এবং তাঁর নিজের ভিতরে ভাল মন্দের যে সব ধারণা কাজ করে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাতে শিল্পিমনের সমাজসাপেক্ষতাই প্রতিফলিত হয়। রিচার্ডসের মতে—লৌকিক বিষয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শৈল্পিক বিষয়ের উপলব্ধির যে পার্থক্য তা আসলে এই "communicability"-র মধ্যেই নিহিত।* শিল্পে লৌকিক অভিজ্ঞতাকেই সুন্দর এবং উদ্দীপক সংগঠনে সংগঠিত করা হয়। শিল্পের জগৎ অর্থহীন বা অপ্রয়োজনীয় রূপের জগৎ নয়—মানুষের স্মরণীয়, বরণীয় ও পরমকমণীয় উপলব্ধির জগৎ—"The arts are our storehouse of recorded values,"

যাঁরাই শিল্পকে এইভাবে মানবিক মূল্যবোধের দলিল বলে মনে করেন, তাঁরাই শিল্পের সঙ্গে জীবনের এবং নৈতিক মূল্যের যোগ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। রিচার্ড মহাশয় তাঁদেরই একজন এবং প্রধান একজন যারা শিল্পকে জীবন থেকে, প্রয়োজন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে দেখেন না, যাঁরা শৈল্পিক দৃষ্টির রহস্যময় স্বাতন্ত্র্য এবং কলাকৈবল্যবাদ (Art for art's sake) স্বীকার করেন না—যারা মনে করেন—

> The separation of poetic experience from its place in life and its ulterior worths involves a definite lop-sidedness, narrowness and incompleteness in those who preach it sincerely.

সুবিখ্যাত সমালোচক, 'শেকসপীয়ারীয়ান ট্র্যাজেডি'র লেখক ডাঃ এ. সি. ব্র্যাডলে মহাশয়ের মত পণ্ডিতকে কলাকৈবল্যবাদের

---

* It differs from many other experiences, whose value is very similar, in this very communicability.

পক্ষে ওকালতি করতে দেখে * রিচার্ডস সখেদে লিখেছেন ব্র্যাডলে হচ্ছেন তাঁদেরই একজন—

whose practice is a refutation of his principles.

ডাঃ ব্র্যাড্‌লের যুক্তিরাজি খণ্ডন করে করে রিচার্ড্‌স দেখাতে চেয়েছেন—অন্যান্যমূল্যনিরপেক্ষ 'বিশুদ্ধ কাব্যিক মূল্য বলে কিছু নেই এবং কাব্যের জগৎ লৌকিক জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোন জগৎ নয়—লৌকিক জগতের উপাদান-দিয়ে-গড়া এবং লৌকিক-অনুরূপ পদার্থেরই জগৎ।

রিচার্ডস মহাশয় শুধু যে "বিশুদ্ধ কাব্যিক মূল্য"ই অস্বীকার করেছেন তা নয়, শিল্পের সঙ্গে নীতির একটা অন্তরঙ্গ যোগও স্থাপনা করতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য যে নীতির (morality) কথা তিনি বলেছেন, সেই নীতি—"free from occultism, absolutes and arbitrariness" এবং "will change its values as circumstances alter." এইরূপ নীতি অবশ্যই "will explain …the place and value of arts in human affairs."

যে নীতিসূত্র দৈববিধান এবং সনাতন অথবা মানুষের বাসনা-কামনার সঙ্গে যে নীতিসূত্রের কোন সম্পর্ক নেই, এ নীতি সেই নীতিসূত্র নয়। এ নীতি সামাজিক অবস্থার তথা মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে হতে চলে; এ নীতি মানুষের মূল্যবোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত। সুতরাং যিনি মূল্যতত্ত্ব না বুঝতে পারবেন তিনি নীতিতত্ত্বটি বুঝতে পারবেন না। রিচার্ডসের নীতিসূত্র মূল্যতত্ত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মূল্যতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে এককথায় এইটুকুই বলা যেতে পারে—

The best valuable states of mind then are those which involve the widest and most comprehensive co-ordination of activities and the least curtailment, conflict, starvation and restriction.

* অকস্‌ফোর্ড লেকচার্স অন্‌ পোয়েট্রি গ্রন্থের—'আর্টস্‌ ফর আর্টস্‌ সেক্‌' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ সবচেয়ে মূল্যবান মানসিক অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থাটি যাতে মানসিক ক্রিয়ার সবচেয়ে বহুল ও ব্যাপক সমন্বয় ঘটে এবং যাতে বাসনার সবচেয়ে কম অবদমন, কম দ্বন্দ্ব, কম সংকোচন ও অপূরণ ঘটে। অতএব এই ধরনের মূল্যবান অবস্থা অবশ্যই মঙ্গলকর অবস্থা হবে; কারণ এই অবস্থাটিতে ব্যক্তিজীবনের এবং ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের বা অভিযোজনের এমন একটা রূপ বা সংগঠন (organisation) ব্যক্ত হয় যার চেয়ে "greatest possible value from life" আর কিছুই হতে পারে না। এই হিসাবে নীতির সমস্যা আসলে—"the problem of how we are to obtain the greatest possible value from life"—এবং আসলে তা—"problem of organisation both in the individual life and in the adjustment of individual lives to one another." ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, যুগে যুগে, সমাজে সমাজে এই মানস সংগঠনের রূপ পৃথক হয়ে থাকে এবং তা থাকে বলেই মূল্যবোধ তথা নীতিবোধ পরিবর্তনশীল; অর্থাৎ সনাতন নীতি বলে কোন নীতি নেই, থাকা সম্ভব নয় বলেই নেই। শিল্পীর কাজ এই মূল্যের তথা নীতি উপলব্ধিকে সমাজের সকলের কাছে প্রচার করা—সঞ্চার করা।

এখানেই একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আই. এ. রিচার্ডস্ মহাশয়ের মতবাদ সমালোচনা করতে যেয়ে সমালোচকরা দেখিয়েছেন, যে "the word 'value' is itself an 'emotive' term" অর্থাৎ যে মূল্যের কথা তিনি বলেছেন তা মূলতঃ আবেগাত্মক এবং মূল্য ও নীতিকে এক করে ফেলায় শিল্পবিচারে নীতির আধিপত্য বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি এখানে সমালোচকদের মত সমালোচনা করতে চাইনে। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, আই. এ. রিচার্ডস্ মহাশয় যে মূল্যতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন তা আপাতদৃষ্টিতে দেখলে—ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা বাসনাকেন্দ্রিক বলে মনে

হয় বটে, কিন্তু যখনই তিনি বাসনার সংগঠন ব্যাপারটিকে শ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত, সমাজ-নিয়ন্ত্রিত, এককথায় পরিবেশ-নিয়ন্ত্রিত বলে স্বীকার করেছেন তখনই মূল্য ও নীতি সমাজসাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাসনার ভিত্তির উপরে "মূল্যতত্ত্ব" প্রতিষ্ঠিত করায় এবং মূল্যতত্ত্বের উপরে নীতিতত্ত্বকে স্থাপিত করায় এ কথা সহজেই মনে আসতে পারে যে ব্যক্তিগত বাসনা-বন্ধকেই নীতির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে—এই কথাই শেষপর্যন্ত বলা হয়েছে যে যা বাসনাকে চরিতার্থ করে তাই মূল্যবান—তাই মঙ্গলকর। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই রিচার্ডসের মূল অভিপ্রায়টি চোখে পড়বে—দেখা যাবে রিচার্ডস মানুষের বাসনাকে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তি বলে মনে করেন নি। বাসনা-কামনাকে সমাজসাপেক্ষ তথা দেশকালপাত্রসাপেক্ষ বলে মনে করেছেন এবং পরোক্ষভাবে নীতিকেও সমাজসাপেক্ষ করে তুলেছেন। রিচার্ডস বলতে চেয়েছেন—সমাজের অবস্থা বা প্রকৃতি বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাসনার প্রকৃতিও বদলে যায়; ফলে মানুষের মূল্যবোধে তথা নীতিবোধেও পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং নীতিবোধ এবং মূল্যবোধ সামাজিক অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই প্রসঙ্গেই মনে রাখা দরকার—মূল্যবোধ এবং নীতিবোধকে প্রত্যক্ষভাবে সমাজসাপেক্ষ তথা দেশকালপাত্রসাপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত করার চেষ্টা, সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক শিল্পদর্শনে (Sociological Aesthetics) আরো বেশি করে ব্যক্ত হয়েছে। Taine, Grosse, Proudhon, J. M. Guyau, M. Nodau প্রমুখ শিল্পতত্ত্ববিদগণ শিল্পের সামাজিক উপযোগিতার দিকে খুব বেশি করে জোর দিয়েছেন। এঁরা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—শিল্পীর কাজ সামাজিক অভিজ্ঞতার রসনীয় রূপ তৈরি করা বটে, কিন্তু শিল্পীর আসল উদ্দেশ্য—রসনীয় রূপের সাহায্যে সামাজকে গ্লানিমুক্ত করা, উন্নততর সঙ্গতির পর্যায়ে উন্নীত করা—বহুকাম্য মূল্যবোধ বা নীতিবোধ জাগিয়ে তোলা। এঁরা শিল্পী ও শিল্পকে সমাজের

ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন—ইতিহাসেরই বিশেষ পরিণাম হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছেন।

এই প্রবৃত্তিটি মার্কসবাদী শিল্পদার্শনিকেদের মধ্যে আরো ঐকান্তিক আবেগে ব্যক্ত হয়েছে এবং হয়েছে তাঁদের দার্শনিক মতবাদের জন্যই। মার্কসবাদীরা বস্তুবাদে—দ্বন্দ্বমূলক বাস্তববাদে—বিশ্বাসী। অধ্যাত্মবাদী পরাতত্ত্বে এবং তার আনুষঙ্গিক অনুসিদ্ধান্তে এঁদের একটুও আস্থা নেই। সত্য-শিব-সুন্দরের—এককথায় মানসিক মূল্যরাজির (values) অতিপ্রাকৃত পারমার্থিক সত্তা এঁরা একেবারেই স্বীকার করেন না। তাঁদের কাছে সত্য-শিব-সুন্দর, বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কের (subject-object relations) বিশেষ বিশেষ ফল। তাঁদের কাছে বিষয়ী বা ব্যক্তিমাত্রই উন্নত মানসিকশক্তিসম্পন্ন সামাজিক জীব—বিশেষ পরিবেশের অর্থাৎ বিশেষ দেশের ও কালের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেষ্টনীর অধীন—পরিবেশের সঙ্গে অবিরাম অভিযোজনে অর্থাৎ আর্থনৈতিক সংগ্রামে ব্যাপৃত গোষ্ঠীবদ্ধ জীব। সত্য শিব-সুন্দর অভিযোজনশীল সামাজিক মানুষেরই জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুভবের বিশেষ বিশেষ রূপ। এঁদের কাছে 'সত্য' হচ্ছে বিবর্তনশীল প্রকৃতির—(বিশ্বপ্রকৃতি, জীবপ্রকৃতি, সমাজপ্রকৃতি) বিচিত্রবিকাশের এককথায় পরিবেশের অভিজ্ঞতার, যুক্তিযুক্ত এবং প্রমাণসিদ্ধ ধারণা, 'শিব' হচ্ছে—সমাজান্তর্গত ব্যক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের আদর্শ বিধিবিধান—সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতাসম্পন্ন একটি আদর্শ সমাজব্যবস্থা। এবং 'সুন্দর' হচ্ছে—সত্যবোধ এবং শিববোধ নিয়ন্ত্রিত উপলব্ধি বা রূপানুভূতি। মার্কসবাদীরা মানুষের সমাজনিরপেক্ষ অস্তিত্ব কল্পনা করেন না এবং তা করেন না বলেই তাঁদের কাছে সামাজিক জীবন ব্যাপকদৃষ্টিতে 'আর্থনৈতিক' জীবন—অভিযোজনেরই বিচিত্র প্রচেষ্টা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস মূলতঃ আর্থনৈতিক জীবনেরই আধিমানসিক অভিব্যক্তি। আর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনেই পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে যেয়েই মানুষের মনে নানা ধারণা জন্মেছে এবং সেই সব ধারণাই যুক্তিসম্পন্ন বা

প্রমাণসিদ্ধ হয়ে 'সত্যের' মর্যাদা পেয়েছে। সুষ্ঠু অভিযোজনের প্রয়োজনেই মানুষের সমাজে শ্রমবিভাগ তথা শ্রেণীবিভাগ, ক্রমে অধিকারভেদ দেখা দিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এবং শ্রেণীর সঙ্গে শ্রেণীর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানা বিধিনিষেধ, এককথায় নীতিসূত্র তৈরি হয়েছে। এমনিভাবেই সামাজিক মানুষের মনে সত্য ও নীতির মূল্যবোধের জগৎ গড়ে উঠেছে—উঠেছে উৎপাদনবণ্টন-ব্যবস্থার এবং ব্যক্তিসম্পর্কের অর্থাৎ শ্রেণীসম্পর্কের বা শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিত্তির উপরেই। এই দিক থেকে দেখলে যে সিদ্ধান্ত অনিবার্য মার্কসবাদীরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন—সিদ্ধান্ত করেছেন—বিশেষ যুগের সত্যবোধ, নীতি বা শিববোধ, মূলতঃ সেই যুগের আর্থ নৈতিক সংগ্রামের শ্রেণীসম্পর্কের প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করে—শিবচেতনায় শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপটিই প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

মার্কসবাদী বলতে চান—বিশেষ সমাজের অবস্থা বা প্রকৃতি ঐ সমাজের উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা একদিকে যেমন সমাজের অভিযোজন সামর্থ্যকে ব্যক্ত করে—প্রকৃতির উপরে সমাজের আধিপত্যের মাত্রা—সমাজের জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিমাণ সূচিত করে, তেমনি অন্যদিকে তা সমাজের নৈতিক মানকে—শ্রেণীসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপটিকে এবং তাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের রূপটিকে ব্যক্ত করে থাকে। মার্কসবাদীর মতে শিল্পীর মুখ্য কর্তব্য—সামাজিক ব্যক্তিহিসাবে এবং বিশেষ শ্রেণীর অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে—সমাজের শ্রেণীসম্পর্কজনিত নানা সমস্যাকে রসনীয় রূপে প্রকাশ করা—জীবনের সমালোচনার ভিতর দিয়ে শ্রেণীসম্পর্কের উন্নততর ও আদর্শস্থানীয় রূপটিকে তথা মূল্যকে উদ্‌ভাসিত করতে চেষ্টা করা। সুতরাং যে শিল্পীর মূল্য-চেতনা যত গভীর, শ্রেণীদ্বন্দ্বের তথা জীবদ্বন্দ্বের বিচিত্র ও সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধারণা বা রূপ যাঁর মধ্যে যত স্পষ্ট, তিনি তত বড় শিল্পী হতে পারেন। তাই বলে অবশ্য শিল্পীর বড়ত্ব শুধু মূল্যচেতনার

বা দ্বন্দ্বচেতনার উপরেই নির্ভর করে না, নির্ভর করে চেতনার সার্থক অভিব্যক্তির উপরে—চেতনার রসরূপ সৃষ্টি করার উপরে। মনে রাখা দরকার—মার্কসবাদী শিল্পতত্ত্ব শিল্পের কোন নতুন "বৈশেষিক লক্ষণ" (differentia) নির্ধারণ করে নি এবং মূলতঃ তা রসবাদী। মার্কসবাদীরা কখনই এ কথা বলেন না—বলবেনও না—শিল্পীর কাজ আসলে প্রাবন্ধিকেরই কাজ—বিশেষ কোন বক্তব্যকে জনসাধারণের কানে পৌঁছে দিতে পারলেই শিল্পী সার্থককাম। রসবাদীদের মতোই তাঁরা বলেন—শিল্পীর মুখ্য কাজ "রসরূপ" তৈরি করা—রসাত্মক রূপ তৈরি করা। সাধারণ রসবাদীদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের পার্থক্য এখানেই যে মার্কসবাদীরা মনে করেন—

> The world of art is the world of social emotion—of words and images which have gathered, as a result of the life experiences of all emotional associations common to all, and its increasing complexity reflects the increasing elaboration of social life.—(Illusion And Reality—P. 20)

অর্থাৎ শিল্পের জগৎ সামাজিক আবেগের জগৎ—সমাজের সকলের অভিজ্ঞতাপ্রসূত আবেগপ্রকাশক ভাষার ও রূপের জগৎ। শিল্পের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, সামাজিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতারই প্রতিফলন। মার্কসবাদীরা বলতে চান—পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে যেয়ে ক্রমবর্ধমান সমাজ একদিকে যেমন নতুন নতুন উৎপাদন-রীতির উদ্ভাবন করে, অন্যদিকে তেমনি জীবনযাপনের সঙ্গে অজৈবিক বা মানবিক প্রবৃত্তির অভিযোজন করবার চেষ্টা ক'রে কাব্য সৃষ্টি করে। হাতিয়ার মানুষের হাতের গঠনে কোন পরিবর্তন না ঘটিয়েও, হাতকে যেমন নতুন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে, তেমনি কাব্যও মানুষের বাসনা বা আবেগবন্ধে কোন পরিবর্তন না এনেও হৃদয়াবেগকে নতুন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে।* এবং

* Thus the developing complex of society, in its struggle with the environment, secretes poetry as it secretes the

তা ক'রে কল্পনার জগৎ (world of phantasy) তৈরি করে—অনাগত বাস্তব জগতের বা জীবনের ধ্যানকে রূপ দিয়ে—জীবনের নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা এবং অপরিপূর্ণ বাসনাকে ব্যক্ত করে।

"অপরিপূর্ণ বাসনা" কথাটি শুনে, অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠতে পারে—খ্রিস্টোফার কডওয়েল মহাশয় কি তবে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তেরই কাছাকাছি যাচ্ছেন না? প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত এবং সময়োচিত। অতএব সুবিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ফ্রয়েড মহাশয় এবং তাঁর অনুগামী শিষ্যগণ শিল্পের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্বন্ধে যে মত পোষণ করেছেম তা এখানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা যাক। ফ্রয়েডের মতে—শিল্পের জগৎ কল্পনার জগৎ—স্বপ্নের জগৎ—অবদমিত বাসনার কাল্পনিক অভিব্যক্তি। স্বপ্নে যেমন মানুষের অবদমিত বাসনাই বিচিত্র কিম্ভুতকিমাকার রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করে, শিল্পেও মানুষের অবদমিত বাসনা ব্যক্ত হয়ে থাকে। এই হিসাবে শিল্পও একপ্রকার স্বপ্ন—দিবাস্বপ্ন বা জাগ্রতস্বপ্ন। এককথায়, বাসনাপ্রবণ (wish fulfilment)। শিল্পীর আসংজ্ঞান এবং নির্জ্ঞান বাসনাই নানা আকারে শিল্পে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করার অর্থ এই—শিল্প কল্পনার জগৎ বটে—এমন কি উৎকল্পনারও জগৎ বটে—কিন্তু সেই রূপ-কল্পনা স্থষ্টির মূল প্রেরণা আসে অবদমিত বা অপরিপূর্ণ বাসনা থেকে। এককথায় শিল্প হচ্ছে অবদমিত বাসনার কল্পরূপ—"world of phantasy."

আসল সমস্যা এখানেই—অবদমিত বা অপরিপূরিত বাসনার 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে কার কি ধারণা তা নিয়েই। ফ্রয়েডের "অবদমিত

technique of harvest, as part of its non-biological and specifically human adaptation to existence. The tool adapts the hand to a new function, without changing the inherited shape of the hands of humanity. The poem adapts the heart to a new purpose without changing the eternal desires of men's hearts.—Illusion and Reality—P. 21.

বাসনা" এবং কডওয়েলকথিত 'reality not yet realized'—"অপরিপূরিত বাসনা" আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও, আসলে এক নয়। ফ্রয়েডের 'অবদমিত বাসনা' যে পরিমাণে জৈবিক, সেই পরিমাণে আর্থনৈতিক বা সামাজিক নয়। অন্যপক্ষে মার্কসবাদী কডওয়েলের অপরিপূরিত বাসনা—অচরিতার্থ চেতনা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক তথা সামাজিক। ফ্রয়েডপন্থীরা যেখানে আত্মকেন্দ্রিক, মার্কসপন্থীরা সেখানে সমাজকেন্দ্রিক। মনস্তত্ত্ব-প্রসক্ত শিল্পীরা যে লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করেন—তাকে বলা যায় "psychological realism" আর মার্কসবাদী শিল্পীদের লক্ষ্য—"socialist realism". আশা করি—মার্কসবাদীর এবং ফ্রয়েডপন্থীদের মতবাদের তাৎপর্য—বিশেষতঃ মৌলিক পার্থক্য পাঠকদের কাছে খানিকটা স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছি—একথা বোঝাতে পেরেছি যে ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে "কম্যুনিকেশান" ব্যাপারটি মার্কসবাদীদের মতো ততখানি মুখ্য নয় এবং তা নয় বলেই ফ্রয়েডপন্থীদের কাছে শিল্প শিল্পীর নিছক আত্মগত অবদমিত বাসনার অভিব্যক্তি।

সে যাই হোক, "কম্যুনিকেশান" (সঞ্চারণ) ব্যাপারটিকে কে কতখানি প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেছেন, তার মাত্রা হিসাব ক'রে আমরা বিভিন্ন মতবাদকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে পাই আমরা সেই সব মতবাদগুলি যারা সঞ্চারণের দায়িত্বকে প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাই সেই সব মতবাদগুলি যারা সঞ্চারণকে পরোক্ষভাবে মেনে নিয়েছে; এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়বে সেই সব মতবাদ যারা সঞ্চারণের দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করেছে। এ সম্পর্কে এই অধ্যায়ের উপসংহারে আরো বিস্তারিত আলোচনা করব, অতএব এখানে আমি শুধু দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েকটি আধুনিক মতবাদ সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলছি। প্রথমতঃ আমি—জন ডিউয়ি প্রতিষ্ঠিত "Heightened experience"-বাদ, দ্বিতীয়তঃ—আর. এ. জেমস স্কটের "Exhibition"-বাদ, তৃতীয়তঃ—সংকেতবাদ (Art as

semantic) এবং চতুর্থতঃ, সংবাদবাদ (Art as information) সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

(ক) শিল্পকে যাঁরা 'heightened experience' বলতে চান তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সঞ্চারণের কথা না বললেও শিল্পের experience-সাপেক্ষতা স্বীকার করার ভিতর দিয়ে পরিবেশসাপেক্ষতা স্বীকার করে থাকেন। তাঁরা এই কথাই বলেন যে, শিল্পী অভিজ্ঞতাকে একটু বাড়িয়ে একটু পৃথক করে নিয়ে রূপ দিতে চান—এবং তা' চান আর দশজনের কাছে ব্যক্ত করার অভিপ্রায়েই। তবে কেউ যদি বলেন যে শিল্পী তার experience-কে 'heightened' করতে চান শুধু নিজেরই উপলব্ধির জন্য—সমাজের আর দশজনের কাছে অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করবার জন্য নয়, তা হলে অবশ্য 'heightened experience'—মতবাদটিকে সঞ্চারণবাদের বিপরীত কোটিতেই স্থান দিতে হবে। বলা বাহুল্য, এই মতবাদটির সঙ্গে অনুকরণবাদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সংজ্ঞাটির মধ্যে রূপের ও ভাবের—দুয়েরই অভিজ্ঞতাকে স্থান দেওয়ার চেষ্টা করায়, একদিকে যেমন আবেগবাদের (expression of feeling) অব্যাপ্তিদোষ এড়াবার চেষ্টা, অন্যদিকে তেমনি experience-কে 'conceptual thinking' থেকে পৃথক করায়, অতিব্যাপ্তিদোষ এড়াবার চেষ্টা ফুটে উঠেছে।

(খ) দ্বিতীয়তঃ আর. এ. জেমস্ স্কট মহাশয়ের সিদ্ধান্তের কথা। 'দি মেকিং অফ লিটারেচার' গ্রন্থে জেমস্ স্কট মহাশয়—'প্রদর্শনবাদ' প্রতিষ্ঠা করতে যেয়ে লিখেছেন—

> The words 'imitate' and 'represent', then are not quite satisfactory, if we wish to indicate an element that is never absent in a work of art. The word that we need is *exhibit*....The artist does not always imitate, but he always exhibits or shows....Exhibition, then is the fundamental fact in the aesthetic process. The scientist *tells* us; the moralist or rhetorician seeks to *persuade* us, the artist *shows* us.—Pp. 341-42.

বলা বাহুল্য, 'প্রদর্শন' (exhibition) শব্দটি, অর্থের দিক দিয়ে 'সঞ্চারণ' (communication) শব্দের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। প্রদর্শন যে সর্বদাই দর্শকসাপেক্ষ ব্যাপার স্কট তা স্পষ্টভাবেই বলেছেন—শিল্পী

> exhibits it, not to reason with us, not to persuade, but merely to make us see what he has constructed imaginatively as a poet.

জেমস্ স্কট মহাশয় দেখাতে চেষ্টা করেছেন—'অনুকরণ বা 'উপস্থাপনা' এই শব্দগুলি শিল্পের সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এমন অনেক কবিতা আছে (মননপ্রধান আধুনিক কবিতা) যারা কোন কিছুর অনুকরণ বা উপস্থাপন নয় ; যাদের মধ্যে কবি আবেগ চিন্তা ও নীতিকথার এক সমন্বয় ঘটিয়ে থাকেন—

> in which feeling, thought and maxim may be merged in an intuition, the whole being apprehended imaginatively.

এই জাতীয় কবিতার ক্ষেত্রে অনুকরণ কথাটি প্রযোজ্য না হলেও, 'প্রদর্শন' কথাটি প্রয়োগ করা চলে। জেমস্ স্কট মহাশয়ের মতে—an element that is never absent in a work of art—সে হচ্ছে "exhibition".

(গ) তৃতীয়তঃ, তাঁদের কথা যাঁরা শিল্পকে—'semantic' তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখতে চেষ্টা করেছেন। এঁরা মনে করেন—শিল্প হচ্ছে আসলে বিশেষ একপ্রকার "সংকেত" (symbol), এক মানুষের মনের ভাবকে অন্য মানুষের মনে পৌঁছে দেওয়ার সংকেত। সেমান্টিকপন্থীদের বক্তব্য বুঝতে হলে প্রথমেই দুটি শব্দের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে—একটি "sign" এবং অন্যটি "symbol"। প্রথমটিকে আমরা বলতে পারি—"জ্ঞাপক", দ্বিতীয়টিকে—"সংকেত"। জ্ঞাপক ('সাইন্') বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে লেখা হয়েছে—

> Whenever one thing stands for some other thing in our minds it is said to be its 'sign' of that other thing.

অর্থাৎ যখন কোন কিছু দেখলে মনে অন্য কোন কিছুর ধারণা জন্মে, তখন ঐ আগের কোন-কিছুকে, যে বস্তুর ধারণা সে জন্মায় তার জ্ঞাপক বলা যেতে পারে। চিহ্নিত বস্তুটিকে বলা হয়—'referent' (জ্ঞাপ্য); কোন কোন ক্ষেত্রে—অর্থ (meaning) জ্ঞাপকের বা চিহ্নের বাদবিচার করার মাত্রার উপরে প্রাণীদের বুদ্ধির মাত্রা নির্ভর করে। সমস্ত অভ্যস্ত আচরণের মূলে এই বাদবিচার ব্যাপারটি কাজ করে থাকে। প্রতিমুহূর্তেই আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়বেদনাকে বস্তুর জ্ঞাপক স্বরূপেই ব্যাখ্যা করছি—এক বস্তুকে অন্য বস্তুর জ্ঞাপক হিসাবে গণ্য করছি—বন্ধুবান্ধবদের অনুভাবাদিকে তাদের অভিপ্রায়ের ও বাসনার চিহ্ন বা জ্ঞাপক রূপে গণ্য করছি।

এই পর্যায়ে অর্থাৎ "সাইন"-এর পর্যায়ে অভিজ্ঞাত বস্তুর ব্যাখ্যা অনেকটা নির্বিকল্পক মানসিক ক্রিয়া—"conditioned reflex"-এর মত "automatic"। অর্থাৎ সেই ব্যাখ্যাকার্যে সংজ্ঞা-ভাবনার বা সামান্যের ধারণার (conceptualized thought) কোন যোগ থাকে না—কোন বিকল্পনা মেশে না। প্রতীতির নির্বিকল্পক ব্যাখ্যা আমাদের ব্যবহারের অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে।

জ্ঞাপকের (সাইন) সঙ্গে সংকেতের (সিম্বল্) মৌলিক পার্থক্য এই যে সংকেতের ব্যাখ্যা বিকল্পনা অর্থাৎ সংজ্ঞা-ভাবনা-সাপেক্ষ। সংকেতিত বস্তুর উপস্থিতিতে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত, সংকেত প্রত্যক্ষভাবে সেই আচরণ বা প্রতিক্রিয়া জাগায় না; পরিবর্তে জাগায় একটি 'ধারণা' বা সংজ্ঞাকে (concept) যা ঐ সংকেতের তাৎপর্য। সংকেত কোন বস্তুর প্রতিনিধি (proxy) নয়—বস্তুর সংজ্ঞার—বস্তু-ধারণার উপায়।* সংকেতকে তিন শ্রেণীতে ভাগ

* A symbol is distinguished from a sign in that conceptualization is involved in the interpretation of symbols. A symbol does not directly invite overt behaviour appropriate to the presence of its referent, but instigates the formation

করা হয়েছে। (ক) প্রথা-প্রকল্পিত (কনভেনশানাল) (খ) সামি-প্রথাপ্রকল্পিত (সেমি-কনভেনশানাল) (গ) প্রাকৃতিক (ন্যাচারাল)। ধরা যাক—একটি হিংস্র সিংহের মূর্তি আঁকা হয়েছে এবং তার তলায় বা উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"হিংস্র সিংহ"। এখানে "হিংস্র সিংহ"—এই লেখাটুকুর অক্ষরগুলি প্রথাকল্পিত এবং সিংহের চিত্রটি প্রাকৃতিক সংকেত। তারপর ধরা যাক—কোন রাস্তার বাঁকে আঁকা-বাঁকা রেখার একটি চিহ্ন-ফলক দাঁড়িয়া আছে। ঐ চিহ্ন দেখে সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—সামনের রাস্তায় বহু বাঁক ফিরেছে। ঐ সংকেতটি সামি-প্রথাকল্পিত। কারণ সংকেত চিহ্নটির রূপে রাস্তার বাঁকা রূপটি আভাসিত হয়েছে।

যাই হোক, শিল্পের জগৎ আসলে এই সব সংকেতেরই জগৎ, কোথাও প্রাকৃতিক সংকেত, কোথাও সামি-প্রথাকল্পিত সংকেত, কোথাও সম্পূর্ণ প্রথাপ্রকল্পিত সংকেত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ভাস্কর্যে ও চিত্রে প্রাকৃতিক সংকেতেরই প্রাধান্য, তেমনি সাহিত্যে প্রাধান্য রয়েছে—প্রথাপ্রকল্পিত সংকেতের। সাহিত্যে প্রথাপ্রকল্পিত শব্দার্থের দ্বারা অর্থাৎ শব্দ-সংকেতের সাহায্যে অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা হয়। কেউ কেউ এমন কথাও অবশ্য বলেছেন যে সাহিত্যের উদ্দেশ্য যেহেতু আবেগ উদ্রিক্ত করা—অর্থ নিবেদন করা নয়—সাহিত্য হচ্ছে 'ভাষার জ্ঞাপক রূপে প্রয়োগ' (language as sign)।

এ সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। এইটুকু মনে রাখলেই চলবে যে সংকেতবাদ স্বীকার করলেও, শেষপর্যন্ত অনুকরণবাদের এবং সঞ্চারণবাদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হয়। হ্যারোলড্ ওস্‌বোর্ন মহাশয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করলেই বক্তব্য সুস্পষ্ট হবে—

In the context of a general theory of semantics

in the mind of a concept which is its referent. Symbos are not proxy for their objects, but are vehicles for the conception of objects.—(Aesthetics & Criticism—P. 70)

it does then seem moderately sensible to say that both literary art and representational visual art are *mimetic*: both communicate experienced situations, real or imaginal, by means of symbols—literature mainly by means of conventional symbols and visual art mainly by natural symbols.—(ঈস্থেটিক অ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম—৭৩ পৃঃ)

অর্থাৎ সাহিত্যশিল্প এবং মূর্তিশিল্প বা চিত্রশিল্প আসলে অনুকরণ। উভয়েই উপলব্ধ বাস্তবিক অথবা কাল্পনিক পরিস্থিতিকে সংকেতের সাহায্যে সঞ্চারণ করতে চেষ্টা করে। সাহিত্য সঞ্চারিত করে প্রথাকল্পিত সংকেতের সাহায্যে এবং মূর্তি ও চিত্র বা দৃষ্টিগ্রাহ্য শিল্প সঞ্চারিত করে প্রাকৃতিক সংকেতের সাহায্যে। সংকেতবাদের তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, যেহেতু সংকেত সঞ্চারণের উপায় বিশেষ, যাকে সংকেতিত করার উদ্দেশ্যে সংকেত প্রযুক্ত হয়, সেই বিষয়টিই অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। সংকেতের সার্থকতা নিরর্থকতা বিষয়-সংকেতনের মাত্রার উপরেই নির্ভর করে। সংকেতের নিজের কোন মহিমা থাকে না। যে পরিমাণে সে বিষয়ের দ্যোতনা বা ব্যঞ্জনা করতে সমর্থ হয়, সেই পরিমাণেই সে মহিমান্বিত হয়। সংকেতবাদে শিল্পের বিষয়সাপেক্ষতা অতিসংলক্ষ্য।

সংকেতবাদের সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে—এমন আর একটি মতবাদ সম্প্রতি * শিল্পতত্ত্বশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। এই মতবাদটি ইতিমধ্যেই "থিওরি অফ ইনফরমেশান" (সংবাদবাদ ?) নামে প্রচারিত হয়েছে। মাইকেল এ ওয়ালাক (Michael A. Wallach)—লিখিত "Art, Science and Representation Toward an Experimental Aesthetics"—প্রবন্ধে (জার্নাল অফ ঈস্থেটিক অ্যাণ্ড আর্ট ক্রিটিসিজম্ পত্রিকায় ১৯৫৯-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত) উল্লিখিত মতবাদটির বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে। ঐ প্রবন্ধটি থেকেই আমি মতবাদটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করছি।

* ১৯৬০ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমে যে আন্তর্জাতিক শিল্পতত্ত্ব-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে 'ইনফরমেশান থিওরি' সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

প্রবন্ধের গোড়াতেই ওয়ালাক্ শিল্পের লক্ষণ নির্দেশ করতে গিয়ে লিখেছেন—

> A work of art, we would suggest, may be defined as an organization of information according to a set of rules where the construction, tracing or observation of this organization (composing, performing, and perceiving or hearing an art work respectively) serves to alter a person's motivational state in a way sought by the individual.

অর্থাৎ শিল্পের লক্ষণ নির্দেশ করতে এ কথা বলা যায় যে, শিল্প হচ্ছে বিশেষ রীতিতে সংগঠিত সেই সংবাদ বা সংবেদনতন্ত্র, যার নির্মাণ, অঙ্কন অথবা সমালোচনা (শিল্পের রচনা, নির্মাণ এবং আস্বাদন বা শ্রবণ) মানুষের মনোভাবের মধ্যে অভীপ্সিত পরিবর্তন সৃষ্টি করে। উক্ত লক্ষণটির মধ্যে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমতঃ শিল্পকে বলা হয়েছে—'an organization of information' অর্থাৎ 'সংবাদ-তন্ত্র' বা সংবেদন-সংস্থা। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ-তন্ত্রটি গঠিত হবে বিশেষ বিশেষ রীতি বা সূত্র অনুসারে ; তৃতীয়তঃ সংস্থানটি পাঠক ও দর্শকের মধ্যে এষণার পরিবর্তন ঘটাবে।

এই তিনটি বিষয় ব্যাখ্যা করে বুঝাতে যেয়ে লেখক প্রথমেই 'information' শব্দটির তাৎপর্য নির্ধারণ করেতে চেষ্টা করেছেন। লেখকের মতে—"ইনফরমেশান" বলতে বুঝায়—""Anything that impinges on sense organs and or, that can be entertained in the mind"—অর্থাৎ যা এসে ইন্দ্রিয়ে আবেদন করছে (এবং) অথবা মনে যা স্থান পেয়েছে (sensations এবং perceptions ও concept বলতে যা বুঝায়)। ইন্দ্রিয়ে যা এসে আবেদন করে তা রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের বিভিন্ন প্রত্যয় রূপে প্রতিভাত হয়, আর "that can be entertained in the mind"—বলতে অবশ্যই বস্তুর বা ব্যক্তির রূপ-প্রতীতি (perception) এবং সংজ্ঞা (conception) বুঝায়। এককথায় বলা যায়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ষষ্ঠেন্দ্রিয় মন যা কিছু গ্রহণ করতে পারে তাদেরই 'ইনফরমেশান'—সংবাদ

বলা যেতে পারে। এই হিসাবে যে সমস্ত উপাদানের সংযোগে শিল্প বা শাস্ত্র তৈরি হয় তারা সকলেই সংবাদবিশেষ। চিত্রের রঙ ও রেখা, সংগীতের স্বর, সাহিত্যের ভাষা ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংবাদ।

দ্বিতীয় বিষয়—"set of rules" (বিধি বা সূত্র)। ভাষ্য করতে যেয়ে লেখক লিখেছেন—

> Postulates whether explicit or implicit, about what kinds of infoimation are deemed relevant and how they are to be related to one another. *

কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ কোন সংবাদ অভিপ্রেত এবং তাহদের কি করে সংশ্লিষ্ট করতে হবে, সেই সম্বন্ধে উক্ত বা অনুক্ত বিধিসমূহ। 'organization' কথাটির মধ্যেই 'set of rules'-এর প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। সংবাদরাজিকে বিশেষ এক প্রকারে সংগঠিত করতে প্রকারের ও গঠনোপায়ের জ্ঞান অবশ্যই অপেক্ষিত। জ্ঞাতসারেই করুন অথবা অজ্ঞাতসারেই করুন অভিপ্রেত "সংবাদ-তন্ত্র" গঠন করতে সংবাদদাতাকে বিশেষ রীতি বা বিধি-বিধান মানতেই হবে। গঠন মাত্রেই বিধিসাপেক্ষ। সুতরাং যা বিধিনিয়ন্ত্রিত সংগঠনের ফল নয় তাকে কিছুতেই 'শিল্প' বলা চলে না। আমরা দেখব, শিল্প হতে গেলে সংগঠনকে আর একটি শর্ত মানতে হবে। সেই শর্তটিতে বলা হয়েছে—"motivation alteration function"। কিন্তু "set of rules"—সম্পাদিত যা নয়, তার উল্লিখিত ধর্ম থাকলেও তাকে শিল্প বলা চলবে না। কারণ—"sought-after motivational change may occur without mediation by rule systems and in such cases we do not call the phenomenon aesthetic।" অর্থাৎ "ঈস্থেটিক" হতে গেলেই সংবাদতন্ত্রকে বিধি-নিয়ন্ত্রিত এবং ভাবান্তর-সৃষ্টিতে সক্ষম হতে হবে।

তৃতীয় বিষয়—"serves to alter a person's motivational

state in a way sought by the individual"—এই শর্তের ব্যাখ্যা করতে যেয়ে লেখক লিখেছেন—শিল্প "has to perform motivation alteration function before it qualifies as art"—অর্থাৎ শিল্পপদবাচ্য হতে গেলে সংবাদতন্ত্রটিকে এমন হতে হবে যে তা দেখে বা শুনে, দর্শকের বা শ্রোতার মনে ভাবান্তর ঘটবে—এষণাগত পরিবর্তন দেখা দেবে।

'ঐষণিক পরিবর্তন' কথাটিকে লেখক ভাল করে বিশ্লেষণ না করলেও শিল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে যে সব কথা বলেছেন তা থেকে লেখকের অভিপ্রায় উদ্ধার করা যেতে পারে। আলোচনার ভিতর থেকে অভিপ্রায় খুঁজে নিতে, আলোচনাটুকু বিবৃত করাই সবচেয়ে সহজ উপায়, অতএব সেই উপায়ই আমি অবলম্বন করছি।

আমরা জানি, যাঁরা শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন, তাঁরাই কাব্যকলার সঙ্গে ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতির পার্থক্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। ইতিহাস ও বিজ্ঞান-দর্শনের সঙ্গে সাহিত্য শিল্পের মৌলিক পার্থক্য কোথায়, সকলেই জানেন, এরিস্টটলই প্রথম সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত—দর্শন-বিজ্ঞান প্রকাশ করে বিশুদ্ধ সামান্যকে (universal), ইতিহাস বিবৃত করে বিশুদ্ধ বিশেষকে (particular) এবং শিল্প প্রকাশ করে 'বিশেষের আধারে সামান্য'কে—বিশেষেরই সামান্য রূপটিকে। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত পার্থক্য-বিচারে প্রকাশ্য বিষয়টিকেই বিভাজক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এরিস্টটলের এই সিদ্ধান্ত বহুকাল একাধিপত্য বিস্তার করে অবাধে চলে আসছিল, কিন্তু প্রথম বাধা পেল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতালীয় শিল্পতত্ত্ববিদ ভিকোর কাছে এসে। ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের পার্থক্য নির্দেশ করতে যেয়ে ভিকো বলেছেন ইতিহাসের সঙ্গে শিল্পের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই ; উভয়েই বিশেষকে প্রকাশ করে। হোমার একাধারে প্রথম কবি এবং প্রথম ঐতিহাসিক।

এরিস্টটল বা ভিকোর প্রসঙ্গ তুললাম অন্য কোন কারণে নয়, শুধু এই কথাটাই চোখের সামনে রাখার জন্য যে শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ (differentia) এমনটি হওয়া চাই যা মানুষের সবরকম সৃষ্ট পদার্থের ভিতর থেকে শুধু চারুশিল্পকেই পৃথক করে নিয়ে আসবে, যা—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি ভাষাময় রচনা থেকে কাব্যকে পৃথক করে চিহ্নিত করতে পারবে। সূত্রকাররা সকলেই এ চেষ্টা করেছেন এবং আলোচ্য প্রবন্ধের লেখকও অন্যথা করেন নি—শিল্প এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানব্যাপারের পার্থক্য নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছেন—বিশেষভাবে চেষ্টা করেছেন শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের পার্থক্য নিরূপণ করতে।

লেখক বলেন—জাগতিক বিষয়ের প্রতীতিকে আমরা দু ভাগে ভাগ করে দেখতে পারি—এক, বাহ্য বিষয়ের প্রতীতি (external percepts), দুই আভ্যন্তরিক বিষয়ের—মানসিক ব্যাপারের প্রতীতি (internal percepts)। উভয়েই 'direct readings of our experience'। মানুষ চায় এই সব জাগতিক বিষয়ের প্রতীতি-সমূহকে (phenomenal experience) বশীভূত করতে—প্রয়োজন অনুসারে কোন-কোনটিকে গ্রহণ বা উদবোধিত করতে, কোন কোনটিকে বর্জন করতে। প্রতীতি সমূহকে বশীভূত করতে চেয়েছে মানুষ দুটি কারণে—এক, বিচিত্র প্রতীতির মধ্যে শৃঙ্খলা না আনতে পারলে, মানুষের মন সর্বদাই বিভ্রান্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকত। দুই—বশীকরণেরই ফলে সুখকর প্রতীতির পুনরুদবোধন এবং দুঃখকর প্রতীতির বর্জন সম্ভব হয়। বশীকরণ (control) বলতে বুঝায়—"predicting an experience (Call it "Y") from some other information (Call it "X") and being right।" শিল্পকলা ও বিজ্ঞান উভয়ের মূলেই রয়েছে প্রতীতি—বশীকরণের প্রচেষ্টা এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য—"to develop information-systems." লেখকের সিদ্ধান্ত—

It is our view that both science and art are methods

for trying to control experiences, but they differ in that science involves the consensual validation of its predictions, while art, as such, does not. In other words while science's predictions must be public, those of art remain private.

অর্থাৎ কলা এবং বিজ্ঞান উভয়ই মানুষের প্রতীতিরাজির উপরে প্রভুত্বস্থাপনের উপায়। একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য এই যে বিজ্ঞানের নির্বাচনকে (প্রেডিক্শান) দশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলতে হয়—দশের অভিজ্ঞতার কাছে সত্যতার পরীক্ষা দিতে হয়, অন্যপক্ষে কলার নির্বাচনের তেমন কোন দায়িত্ব থাকে না। এইদিক থেকে দেখলে বিজ্ঞানের নির্বাচন সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতা, কলার নির্বাচন ব্যক্তিগত উপলব্ধি। বিজ্ঞান প্রকাশ করে—external percepts অর্থাৎ "percepts that can be reported by anyone else" (রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে—জ্ঞানের কথা সর্বসাধারণের, একজন তাহা প্রকাশ না করিলে অন্যজন তাহা প্রকাশ করিবে। কিন্তু ভাবের কথা একা লেখকেরই)। শিল্পকলা যে নিবাচন করে তার স্বরূপ বুঝাতে যেয়ে লেখক লিখছেন—

"Art's predictions, on the other hand, remain more ambiguous and intuitive · They concern effects on the artist's or appreciator's own feelings and stop there."

অর্থাৎ শিল্পের নির্বাচন বিজ্ঞানের মত তত সুস্পষ্টার্থক এবং বিচারাত্মক নয়, শিল্পের নির্বাচন অধিকতর ব্যঞ্জনাময় এবং 'প্রাতিভানিক' বা নির্বিকল্পক। শিল্প বচন দেয় শিল্পীর হৃদগত অনুভূতিকে এবং সেখানেই তার কর্তব্য সমাপ্ত।

লেখকের সিদ্ধান্ত—"We have been proposing that the difference between art and science is not as great as one may first imagine············. Art is a kind of unconscious version of the first aspect of science." লেখকের কাছে শিল্পকর্মগুলি হচ্ছে—"theorems derived from

one or another set of postulates" এবং তখনই সেই 'থিওরেম' শিল্প পদবাচ্য হয় যখন তা "performs the function of changing an individual's motivational state…."

নতুন মতবাদটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। বিস্তারিত পরিচয় যাঁরা চান তাঁরা অবশ্যই প্রকাশিত "প্রবন্ধ"টি পাঠ করবেন এবং সেপ্টেম্বর-মাসের (১৯৬০) অধিবেশনটিতে যে আলোচনা হয়েছে তা পাঠ করবার জন্য অপেক্ষা করবেন।

মতবাদটি সম্বন্ধে যে দু'একটি প্রশ্ন মনে জেগেছে, তা নিবেদন করতে চাই। প্রথম প্রশ্ন—মতবাদটি কি সম্পূর্ণই নতুন? কোন কথা বলার আগে আমরা প্রস্তাবকের স্বীকৃতিবাক্য সংগ্রহ করতে পারি। প্রস্তাবক স্বীকার করেছেন—মতবাদটি "most closely related to expressionistic theories of art"। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোথায় তা' বুঝতে গেলে, "এক্‌স্‌প্রেসানিষ্টিক থিওরি"-র বিশেষ বক্তব্য আগে জানা দরকার। কাজেই অতি সংক্ষেপে আমি সেই বক্তব্য উপস্থাপিত করছি। "Expressionism—" শব্দটিকে আমরা "প্রকাশবাদ" নামে অনুবাদ করতে পারি। মতবাদটির মূল বক্তব্য এই যে শিল্পকলা আসলে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ—ব্যক্তিত্বের প্রকাশ এবং বিভিন্ন মাধ্যম বা উপাদান আত্মপ্রকাশেরই বিভিন্ন উপায়। এই মতবাদের অন্যতম প্রবর্তক—Eugene Veron এইভাবে মতবাদটি উপস্থাপিত করেছেন; প্রত্যেক শিল্পকর্মই মানুষের আত্মপ্রকাশেরই ভাষাবিশেষ। মানুষ যত ভাষা ব্যবহার করে তাদের মোট দু'ভাগে ভাগ করা চলে। কোন ভাষায় মানুষ সামাজিকের কাছে তার চিন্তাকে ব্যক্ত করে এবং কোন ভাষায় তার আবেগ-অনুভূতিকে প্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যা'তে মানুষ প্রকাশ করে চিন্তাকে এবং শৈল্পিকভাষা হচ্ছে সেই ভাষা যা'তে প্রকাশ করে নিজের ভাবাবেগকে। পরবর্তীকালে আই. এ রিচার্ড এবং সি. কে. ওগ্‌ডেন অনুরূপভাবেই ভাষা-ব্যবহারকে মোট দুই ভাগে ভাগ করেছেন—এক "referen-

tial", দুই "emotive"। ভাষাকে "বিজ্ঞাপন" রূপে ব্যবহার করা (referential use) হয় তখনই, যখন—"it makes statements and purveys information which can be verified or disproved by reference to experienced actuality" ; আর যখন আবেগের উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করা হয়, তখন—"its purpose is to cause other people to have emotions or in order to influence the emotion and behaviour of other people"। লক্ষ্য করবার বিষয়, ইনফরমেশান থিওরির সিদ্ধান্তের সঙ্গে উল্লিখিত সিদ্ধান্তের যথেষ্ট মিল পাওয়া যাচ্ছে। আর একটু এগিয়ে গেলে আরো মিল পাওয়া যাবে। মিঃ টমাস ক্লার্ক পোল্লক (The Nature of Literature-1942) গ্রন্থে ভাষাব্যবহারের রিচার্ডকৃত শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করেছেন এবং ভাষা-প্রয়োগকে—'referential' এবং 'emotive' এই দুই শ্রেণীতে ভাগ না করে—"referential" এবং "evocative" এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। (সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের 'ভাবকত্ব' ও 'ভোজকত্ব' মনে পড়ে) পোল্লক বলতে চান—ভাষা বা সংকেতকে যখন "ভাবক" বা বিজ্ঞাপক"রূপে ব্যবহার করা হয়, তখন তা' "effective for communicating only abstractions from the writer's actual experience whether these abstractions are a pointing at 'objects' or a reference to more generalized ideas". অর্থাৎ বাস্তব ধারণা বা অধিকতর নৈর্ব্যক্তিক কোন সংজ্ঞা বা চিন্তাকে ব্যক্ত করে ; কিন্তু শিল্পকর্মে সংকেত ব্যবহার করা হয় 'ভোজক' বা 'উদ্বোধক' হিসাবে—উপলব্ধির ধারণাকে নয়, খাস উপলব্ধিটিকেই প্রকাশ করার জন্য। শিল্পকর্মে শুধু ভাবাবেগ বা মনোভাবই ব্যক্ত করা হয় না,—চিন্তা, ভাবনা, বিষয়োপলব্ধি সব কিছুই শিল্পের বিষয় হ'তে পারে। এখানেই "evocative" শব্দটির সঙ্গে "emotive" শব্দটির তাৎপর্যগত পার্থক্য। সংকেতের 'evocative' প্রয়োগে, "human beings attempt to comm-

unicate not the abstraction from the experience but the actual experience itself"। সংকেতের ব্যবহার নিরর্থক কোন ব্যাপার নয় প্রত্যেক সংকেত ব্যবহারের মূলে থাকে উদ্দেশ্য—'controlling purpose' (ইনফরমেশান থিওরির—"কন্ট্রোল" ব্যাপার স্মরণীয়)। Controlling purpose যখন "reference" বা information এর অভিমুখে যায়, তখন সংকেত referentially অর্থাৎ ভাবক হিসাবে ব্যবহার করা হয়—দর্শন বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়, আর যখন—evocation এর জন্য ব্যাপৃত হয় তখন সংকেতের "evocative use" হয়—শিল্পকর্মের সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য ইন্‌ফরমেশান থিওরি এর প্রায় সবটাই গ্রহণ করেছে।

তারপর প্রকাশবাদের অন্যতম ধুরন্ধর ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের দিক থেকেও—সংবাদবাদে প্রতিভানতত্ত্বের (intuition) প্রভাব এসে পড়েছে। ক্রোচের মতেও, মানুষ তাঁর জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ আত্মার দ্বারা জাগতিক বিষয়কে অধিগত করতে চেষ্টা করছে। জ্ঞান দুই প্রকার, এক—নৈয়ায়িক জ্ঞান—"Knowledge through concepts" দুই প্রাতিভানিক জ্ঞান—Knowledge through imagination"। শিল্প হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান—"intuitive knowledge" ক্রোচের মতবাদের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য এখানেই—শিল্পকে প্রতিভানিক জ্ঞান রূপে ঘোষণা করায়—শিল্পের সৃজন ক্রিয়াকে প্রতিভানিক ব্যাপার মনে করায়, (আমরা দেখেছি—যে সংবাদতন্ত্র শিল্পপদবাচ্য তা 'more intuitive') সুতরাং শিল্পকে intuitive বলায় নতুন কিছুই বলা হল না। প্রকাশবাদ সম্বন্ধে আর বেশী আলোচনা না করেই আমরা বলতে পারি—"ইনফরমেশান থিওরি" সংকেতবাদ ও প্রকাশবাদেরই পরিশিষ্টের মতো। প্রকাশবাদেরই মতো সংবাদ-বাদ বলতে চায়—প্রকাশের ব্যাকুলতা অর্থাৎ প্রতীতি বা অভিজ্ঞতাকে বশে রাখার চেষ্টা—সামাজিকের কাছে নিজের অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা, মনোজীবক প্রাণী মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক। সংকেত সাহায্যেই মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ ক'রে থাকে। এই

সংকেত সাহায্যে মানুষ যখন তার চিন্তাকে অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক ধারণাকে (abstract ideas) ব্যক্ত করে তখন দর্শন-বিজ্ঞানের অর্থাৎ শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়, আর যখন মানুষ সংকেতের সাহায্যে ভিতরকার এবং বাইরের অভিজ্ঞতাকে স্বরূপতঃ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করে তখন শিল্পের সৃষ্টি হয়। প্রকাশবাদের সঙ্গে সংবাদবাদের প্রথম পার্থক্য এখানেই যে সংবাদবাদ দর্শন-বিজ্ঞান এবং শিল্পকলা উভয়শ্রেণীর সংকেত-সংগঠনকেই সংবাদ (ইন্‌ফরমেশান) নাম দিয়েছেন। আর প্রকাশবাদে "ইন্‌ফরমেশান" কথাটি শুধু সংকেতের "referential use"-এর ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়েছে। আগেই আমরা জেনেছি—"ইনফরমেশান" কথাটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রকাশবাদের পরিভাষায় বললে বলা যায় তারা Signs এবং 'Symbols'. কি শিল্প, কি দর্শন-বিজ্ঞান বাহ্যত, কতকগুলি সংকেতের সমবায় বা বিন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। শিল্পও যেমন সংকেতের বিন্যাস, দর্শন বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রও তেমনি সংকেত-সমষ্টি। এই হিসাবে অবশ্য উভয়েই—সংবাদ-তন্ত্র (information-systems) বা সংকেত-তন্ত্র (Symbol-system)। একের সঙ্গে অন্যের পার্থক্য ঘটে সংবাদদাতার অভিপ্রায়ের পার্থক্যের জন্য। অভিপ্রায়ের ভিত্তিতে সংবাদ-তন্ত্রকে তাই দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। অভিপ্রায় যেখানে 'Consensual Validation' অর্থাৎ প্রমাণযোগ্য নির্বচন (predictions), এক কথায় abstract ideas—বা "জ্ঞানের কথা", সেই সংবাদ-তন্ত্রকে বলা হয় শাস্ত্র; আর অভিপ্রায় যেখানে—'motivational change'—ঘটানো, প্রকাশবাদের পরিভাষায়—আবেগের উদ্দীপনা আনা "influence the emotion and behaviour of other people", সেখানে সংবাদতন্ত্রের নাম—শিল্প। আলোচ্য প্রবন্ধের "motivational change" কথাটা খুব স্পষ্টার্থক বলে মনে হয় না। প্রবন্ধে 'motives'এর পরিসংখ্যান্ যেমন করা হয়নি তেমনি motivational change বলতে ঠিক কি বুঝায় তাও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি।—প্রকাশবাদে "emotive"

বা 'evocative' শব্দ যত স্পষ্টার্থক, 'motivational change' তত স্পষ্টার্থক হ'তে পারেনি। 'motivational change' বলতে যদি শুধু attitude-এর পরিবর্তন বুঝায় তা'হলে কথাটিকে এমনভাবে বিশেষিত করা দরকার যা'তে শুধু 'aesthetic attitude'-ই বুঝায় —আবেগ—উপলব্ধিকে স্বরূপতঃ আস্বাদন করার প্রবৃত্তিটিকেই বুঝায়। কারণ যদি 'motivational change' বলতে এক 'motive' থেকে অন্য 'motive' বা মনোভাবে সরে যাওয়া বুঝায় তাহলে নিছক 'motivational change'—শাস্ত্র ও শিল্পের বিভাজক লক্ষণ হতে পারে না। তবে 'motivational change'-এর অর্থ— যদি হয় ভাগাবেগগত পরিবর্তন—চিত্তের ভাবনা-কোটি থেকে ভাবাবেগের কোটিতে পরিবর্তন—তা হ'লে অবশ্য কিছু বলার নেই। তবে বলার কথা যেটি থাকে সেটি এই যে "ইনফরমেশান থিয়োরি"তে নতুন বলতে পাওয়া যায় নতুন একটি নাম এবং আর যা পাওয়া যায় তা সবই পুরোনো কথাকে সোজা ভাষায় না ব'লে, ঘুরিয়ে এবং পেঁচিয়ে বলা। শিল্পের যে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে—ত' বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে মতবাদটি শিল্পের নতুন কোন "বৈশেষিক লক্ষণ" নিরূপণ করতে পারেনি। বিস্তারিত বিশ্লেষণে অবশ্যই ধরা পড়বে 'Art is communication of feelings', 'Art is expression of emotions', 'Art is intuition', 'Art is heightened experience'.—এই সব নানা মতবাদ একসঙ্গে জড়ো করে 'সংবাদ-বাদ' (ইনফরমেশান থিওরি) তৈরি করা হয়েছে।*

এখানেই এই অধ্যায়ের উপসংহার করা যাক। যে সকল মতবাদ এখানে আলোচিত হয়েছে তাদের বাদ প্রতিবাদের আলোকে রেখে শিল্পের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ নির্ধারণের সমস্যাটি দেখলে, আশা করি, সমস্যার কেন্দ্রটি স্পষ্টাকারেই চোখে পড়বে। আর তা' চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারা যাবে যে শিল্পতত্ত্বে যতগুলি

* গ্রন্থকার-লিখিত "শিল্পতত্ত্বে নতুন মতবাদ" প্রবন্ধ ("সাহিত্যের খবর" ৩য় বর্ষ, আষাঢ় ১৩৬৭, ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত।

সমস্যা আছে, যেমন 'শিল্পের প্রেরণা', "শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী" "শিল্পের উদ্দেশ্য". "শিল্পের বাস্তবতা—অবাস্তবতা", 'শিল্পের সঙ্গে নীতির ও তত্ত্বের সম্পর্ক", "শিল্পের সঙ্গে জীবনের ও সমাজের সম্পর্ক..." প্রভৃতি সমস্যা—সব সমস্যা আসছে ঐ একটি উৎস থেকেই—শিল্পের সংজ্ঞা নির্ধারণের সমস্যা থেকেই। যেমন মন তেমনি ধন—এ ক্ষেত্রেও ঐ কথা প্রযোজ্য। সংজ্ঞা বিষয়ে যিনি যেমন সিদ্ধান্ত করেছেন, তিনি তেমন অনুসিদ্ধান্ত করেছেন। এই কারণেই আমি উপসংহারে ঐ মূল সমস্যাটির দিকে আর একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমতঃ, সংজ্ঞা নির্ধারণে যে কয়েকটি অতি সংলক্ষ্য পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে তাদের কথাই বলা যাক। নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণীতে তাদের ভাগ করা যেতে পারে :—

(১) প্রথম শ্রেণীর প্রবৃত্তি :—(ক) অতিপ্রাকৃত কোন পারমার্থিক সত্তা বা বস্তুকে (আনন্দ বা সৌন্দর্য) প্রকাশ্য বিষয় রূপে গণ্য করার প্রবৃত্তি (খ) প্রাকৃত অর্থাৎ বিশ্বপ্রকৃতির বা জৈব-প্রকৃতির বা মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতাকে সামাজিক ব্যক্তির আনন্দ-বেদনাকে বা সৌন্দর্যবোধকে প্রকাশ্য বিষয়রূপে গণ্য করার প্রবৃত্তি।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি—(ক) শৈল্পিক দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ প্রয়োজন-নিরপেক্ষ, সত্যবোধ ও নীতিবোধ-নিরপেক্ষ করার প্রবৃত্তি। (খ) শিল্প সৃষ্টি ব্যাপারটি আসলে প্রকাশ ব্যাপার বলে মনে করলেও —শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রয়োজনসাপেক্ষ করার প্রবৃত্তি।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি—(ক) শিল্পীর ও শিল্পের পরিবেশ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা স্বাধীনতা কল্পনা করার প্রবৃত্তি (খ) শিল্পীর চেতনাকে ও বাসনাকে এবং শিল্পকেও পরিবেশসাপেক্ষ বলে মনে করার প্রবৃত্তি।

উল্লিখিত পরস্পর বিরোধী প্রবৃত্তিগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে আশা করি শিল্পতত্ত্বের দুর্গম পথের বাঁক বেছে নেওয়া সম্ভব হবে। লক্ষণীয়, প্রথম শ্রেণীর "ক"-প্রবৃত্তি শিল্পকে অতিপ্রাকৃত দৈবসত্তা,

ভাবসত্তা (আইডিয়া), সৌন্দর্য-সত্তা, আনন্দসত্তা প্রভৃতির কোন একটির অভিব্যক্তিরূপে গণ্য করে। এই দলের কাছে শিল্পের "বাস্তবতা" বিচার্য বিষয় বটে, কিন্তু তা বিচার করতে পারেন কেবল তিনিই যিনি ঐ রহস্যময় সত্তার স্বরূপ সাক্ষাৎকার করতে পারেন—দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করতে পারেন। এদের কাছে শিল্পের প্রেরণা মূলতঃ দৈবী প্রেরণা এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী জাগতিক বাসনা নিরপেক্ষ অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয় উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা।

খ প্রবৃত্তি—সম্পন্নদের কাছে—"ভাব" বা "আনন্দ" ও "সৌন্দর্য"—এদের যে কোনটিই প্রকাশ্য বিষয়বস্তু হোক না কেন, কোনটিই ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ নয়—অতীন্দ্রিয় বা অতিপ্রাকৃত নয়। এঁদের কাছে 'ভাব' (আইডিয়া) হচ্ছে বিষয়-বিষয়ীর সম্পর্কের ফল—বিষয় সম্বন্ধে বিষয়ীর মনে যে ধারণা জন্মে সেই ধারণা। "আনন্দ" হচ্ছে বিষয়-গ্রহণে বিষয়ীর সুখজনক আবেগ এবং "সৌন্দর্য" হচ্ছে বিষয়ের রূপ-সুষমা। এদের কাছে শৈল্পিক প্রেরণার উৎস হচ্ছে চৈতন্য-ধর্ম বা মনোজীবকতা—বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের প্রচেষ্টা এবং শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ প্রয়োজন নিরপেক্ষ নয়—আইডিয়ার ক্ষেত্রে তো নয়ই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর "ক"-প্রবৃত্তি—শৈল্পিক দৃষ্টিকে (aesthetic attitude) নিছক রূপ-দিদৃক্ষায় পর্যবসিত করতে চেয়েছে। বিশুদ্ধ রীতিবাদীরা এবং কল্পনাবাদীরা এই ধরণের দৃষ্টির পক্ষ নিয়ে থাকেন। এঁরা বলতে চান, শৈল্পিক মনোভঙ্গী তত্ত্ব চেতনা, ইতিহাস-চেতনা নীতি-চেতনা, উপযোগ-চেতনা প্রভৃতি চেতনা বা মনোভাব থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র মনোভাব—বিষয়কে রূপের স্বমহিমায় দেখার মনোভাব। কান্টের পরিভাষায় বলতে গেলে বলা যায়—শিল্পী বিষয়কে 'pure reason' অর্থাৎ তত্ত্ব চিন্তার অথবা 'practical reason'-এর বা নীতিবোধের বা উপযোগ-চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করিয়ে দেখতে যান না, শিল্পী বিষয়কে 'judge' করতে চান—বিষয়কে সাক্ষাৎ অনুভবে উপলব্ধি করতে চান তথা 'disinterested

pleasure' সৃষ্টি করতে চান। শিল্পীর দক্ষতা—ধ্যান মহিমায় নিহিত নয়, নিহিত রূপকল্পনায়। শিল্পীর কাজ জীবন-সমালোচনা করা নয়—শুধু রূপ-কল্পনা দিয়ে কল্পনাবৃত্তিকে চরিতার্থ করা। শিল্পকে যাঁরা শুধু এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে চান তাঁরাই সাধারণতঃ বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবাদী—কলাকৈবল্যবাদী নামে পরিচিত।

এই প্রবৃত্তিরই বিপরীত প্রবৃত্তি—শৈল্পিক দৃষ্টির প্রয়োজন-নিরপেক্ষতা—ভাব-নিরপেক্ষতা—নীতি-নিরপেক্ষতা অস্বীকার করা—এবং রসবোধকে ভাব ও নীতির সঙ্গে তথা উপযোগ-বুদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিস্ট করে দেখা। তাই বলে এরা শিল্পের প্রকাশ স্বরূপতা বা রূপ-মূল্য অস্বীকার করেন না; এ কথাও অস্বীকার করেন না যে শিল্পীর দক্ষতা রূপরচনাতেই পরিব্যক্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করেন যে শিল্পী যে রূপ তৈরি করেন তা রস-রূপ অর্থাৎ রসনীয় রূপ এবং তা তৈরি করতে রসবোধ তথা জীবনবোধ অপেক্ষিত। শিল্পী যে রূপ তৈরি করেন তা জীবন ধ্যানেরই প্রতিমা। ধ্যান যদি জীবন সাপেক্ষ হয়, রসবোধ যদি জীবনবোধ সাপেক্ষ হয়, তা'হলে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে শিল্প বাহ্যতঃ রূপকল্পনাই বটে কিন্তু স্বরূপতঃ ধ্যানের রূপ, ভাবের রূপ—রসবোধের প্রকাশ—জীবনবোধের অভিব্যক্তি—জীবন সমালোচনা। রসবোধ যে শেষ পর্যন্ত জীবনবোধ তথা ভাব সাপেক্ষ—নীতিবোধ-সাপেক্ষ, সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই তা প্রমাণ করা যেতে পারে। ধরা যাক ট্র্যাজেডি বা কমেডি রসের দৃষ্টান্ত। ট্র্যাজেডি বা কমেডি জীবনেরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম—ফলে জীবনবোধের সঙ্গে মূল্য-বোধের বা নীতিবোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যযোগে তারা যুক্ত। মূল্য বা নীতিবোধ যেখানে নেই, সেখানে জীবনের পরিণাম বিচারে লঘু-গুরু ভেদও নেই—কমেডি-ট্র্যাজেডি বোধেরও কোন সম্ভাবনা নেই।

তৃতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তি—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবৃত্তির মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকলেও, পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য। এই শ্রেণীর 'ক'-সম্প্রদায় শিল্পীর আত্মাকে পরিবেশ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব বা স্বাধীনতা

দিয়ে থাকেন। একদিকে আছেন তাঁরা যাঁরা অতিপ্রাকৃতবাদী—তাঁরা আত্মার অতিপ্রাকৃত অস্তিত্ব কল্পনা করে আত্মার বাসনা-কামনাকে রহস্যময় করে থাকেন—অন্যদিকে আছেন তাঁরা, যাঁরা অতিপ্রাকৃতবাদ অস্বীকার করেন বটে কিন্তু ব্যক্তি-চেতনার তথা ব্যক্তিপ্রবৃত্তির পরিবেশনিরপেক্ষ স্বাধীন অভিব্যক্তির অধিকার কল্পনা করেন—চৈতন্য বৃত্তির বিষয়-নিরপেক্ষ স্বাধীন অনুশীলনের অধিকার স্বীকার করেন—শিল্পীকে সামাজিক জীব হিসাবে গণ্য করেও শিল্পীর বাসনাকে ও চেতনাকে—এক কথায় শিল্পীর মনকে স্বয়ংক্রিয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ক্রোচের প্রতিভানবাদ, অপূর্ব-বস্তু-নির্মাণবাদীদের উৎকল্পনাবাদ, রীতিবাদী বা বিষয় নিরপেক্ষ উপাদান-বিন্যাসবাদীদের মতবাদ, ফ্রয়েড পন্থীদের স্বপ্নবাদ (যা আসংজ্ঞান-নির্জ্ঞান বাসনার পরিপূরণের মধ্যে শিল্পকে আবদ্ধ করে রাখে) শিল্পীকে পরোক্ষভাবে পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছে এবং শিল্পসৃষ্টির প্রেরণাকে আত্মপরায়ণ মনের খেয়াল-খুসীর ব্যাপারে পরিণত করেছে।

অন্যপক্ষে 'খ'-সম্প্রদায় শিল্পীকে অন্যতম সামাজিক জীব বলেই মনে করেন, শিল্পীর আচরণকে—সেই আচরণ কায়িক, মানসিক, বাচনিক যাই হোক না কেন—প্রাণধর্মের এবং মনোধর্মের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বলেই মনে করেন এবং মনে করেন মনের কারখানায় যে সব রূপ ও ভাব তৈরি হয় তার উপাদান যোগায় পরিবেশ ও জীবন যাপন, এবং পরিবেশের এবং জীবন যাপনের চাহিদাতেই তারা তৈরি হয়। এঁরা বলেন—শিল্পীর বাসনার বিশিষ্ট প্রকৃতিটি যেমন তাঁর জীবন যাপনের প্রকৃতি থেকে গড়ে উঠে, তাঁর জাতি-যুগ—সমকালের (race, milieu & moment) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি শিল্পীর চেতনার বিশিষ্ট প্রকৃতিটিও (imagination & concept) তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীক্ষা, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতির ফল। এই কারণেই শিল্পীর পক্ষে যেমন পরিবেশ নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না, তেমনি শিল্পের পক্ষেও রূপের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ পরিবেশ

নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, দান্তে, শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথ, প্রত্যেকটি মহাকবির বাসনা এবং চেতনা এক কথায় সৃষ্টি দেশ-কাল-সমাজ-সাপেক্ষ। এঁরা যেমন বিষয়ৈষণাহীন বিষয়ীর অস্তিত্ব—নির্বিষয় চৈতন্য ক্রিয়া স্বীকার করেন না—তেমনি স্বীকার করেন না বিষয়ের পরিবেশ-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব—দেশ-কাল-সমাজ নিরপেক্ষ "বিষয়"। এঁরা বলেন —কল্পনায় (imagination) প্রতিফলিত হয় মানুষের পরিবেশ-সাপেক্ষ বিষয়-ধারণার রূপ বা পরিবেশ-অনুরাগ এবং উৎকল্পনায় (fancy) প্রতিফলিত হয় পরিবেশ-জ্ঞানের পরিবেশধ্যানের পরিবেশ-অনুরাগের অভাব। অবাস্তব দেবলোক এবং দেবদেবীর ধ্যান ধারণায় যেমন পরিবেশ চেতনার অভাব-সূচক রূপটিই বেশী করে ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি আধুনিক শিল্পীদের পরিবেশ বিমুখ রচনায়, পরিবেশ-নিরপেক্ষতা নয়, পরিবেশ-সাপেক্ষতাই পরিবেশ-বিরাগের ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। পরিবেশের বা বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর দু'রকম যোগ থাকতে পারে, এক অনুরাগের যোগ, দুই বিরাগের যোগ। যেখানে অনুরাগের যোগ সেখানে শিল্পী বিষয়কে সাগ্রহে ব্যক্ত করতে চেষ্টিত হন আর যেখানে বিরাগের যোগ, সেখানে উদাসীন থাকতে অথবা বিরক্তি দেখাতে চেষ্টিত হন। এই অনুরাগের বা বিরাগের মধ্যে শিল্পীর মনোভাবের এবং রসবোধের পরিচয় ফুটে উঠে। যদি কোন লেখক আধুনিক জীবন-সমস্যা উপস্থাপিত না করে, পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে শুধু রস সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন, তা'হলে এ কথা মনে করলে কিন্তু ভুলই হবে যে ঐ লেখক পারবেশ-নিরপেক্ষ ; বরং এই কথাই সেখানে বলতে হবে যে ঐ লেখক বাসনায় আধুনিক-বিরাগী—বর্ত্তমান পরিবেশের বা বিষয়ের সঙ্গে তার যে যোগ তা ওদাসীন্যের যোগ—বিরাগের যোগ। আর একটু বিশ্লেষণ করে এবং তলিয়ে দেখলেই এই সত্যটি উপলব্ধি করা যাবে—জগৎ যদি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল হয় এবং সমাজ যদি নিত্য-পরিবর্তনশীল হয় আর পরিবর্তন বলতে যদি

এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়া বুঝায়—স্থিতাবস্থার পরিবর্তন বুঝায় এবং স্থিতাবস্থার পরিবর্তন বলতে যদি পুরাতন বা রক্ষণশীল এবং নতুন বা প্রগতিশীল 'এই দুই প্রবণতার দ্বন্দ্ব ও নতুন প্রবণতার চাপে পুরাতনের সংলক্ষ্য পরিবর্তন বুঝায়, তা' হলে এই কথাই স্বীকার করতে হবে যে সমাজদেহে প্রতিমুহূর্তেই সংরক্ষণশীল ও প্রগতিশীল এই দুই প্রবণতার দ্বন্দ্ব চলছে এবং সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি জ্ঞাতসারেই করুন বা অজ্ঞাতসারেই করুন এই দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করছেন। যাঁরা জ্ঞাতসারে এই দ্বন্দ্বে যোগ দেন তাদের আমরা বলি সক্রিয় আর যারা উদাসীন তাদের আমরা বলি নিষ্ক্রিয়। কিন্তু আসল কথা এই যে কি সক্রিয় কি নিষ্ক্রিয়, উভয়েই দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত। সক্রিয়ের যোগ—সদ্‌ভাবী (পজিটিভ) নিষ্ক্রিয়ের যোগ অসদ্‌ভাবী (নিগেটিভ)। সদ্‌ভাবী যোগ যখন সংরক্ষণশীল প্রবৃত্তির সঙ্গে ঘটে, তখন শিল্পীকে আমরা বলি সক্রিয় সংরক্ষণশীল, যখন প্রগতিশীল প্রবণতার সঙ্গে ঘটে, তখন বলি সক্রিয় প্রগতিশীল। মোট কথা অভিপ্রায় বিহীন কোন সৃষ্টি নেই—সম্ভব নয় বলেই নেই।

উল্লিখিত প্রবৃত্তিগুলি চোখের সামনে রাখতে পারলে যেমন শিল্পের সমস্যা আলোচনা করা সহজসাধ্য হবে, তেমনি শিল্পের সংজ্ঞা নিরূপণের সমস্যা-অবধারণে নিম্নলিখিত প্রবৃত্তিগুলি অনেক পরিমাণে সহায়ক হবে।

(ক) প্রথম প্রবৃত্তি—বিশেষের (particular or concrete form) রূপকে শিল্পের 'বৈশেষিক লক্ষণ' বলে মনে করা। অনুকরণবাদে, কল্পনাবাদে, অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদে, সৌন্দর্যবাদে এই প্রবৃত্তিরই প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যায়। এই মতে, শাস্ত্র সামান্যের (universal বা concept) নির্বিশেষ রূপকে ব্যাখ্যা করে, শিল্প ভাব ও রূপকে—সামান্যের সাকার বা সবিশেষ রূপকে—ব্যক্ত করে। এই প্রবৃত্তির মধ্যেও দুটি উপ-প্রবণতা দেখা যায়। একটি প্রবণতা—রূপকে বিশেষের বা আইডিয়ার রূপ বলে মনে করে, অন্য প্রবণতা—

বিশুদ্ধ কল্পনাবাদীর প্রবণতা—রূপকে রূপাতিরিক্ত কোন কিছুর প্রকাশ বলে স্বীকার করে না।

(খ) দ্বিতীয় প্রবৃত্তি—শিল্পকে ভাবের (আবেগ-অনুভবের) অভিব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা—ভাবকে ('feeling or emotion) শিল্পকর্মের বিলক্ষণ লক্ষণ স্বরূপে দেখা—ভাবকেই শিল্পের উপস্থাপ্য বিষয় বলে মনে করা। এঁদের কাছে—শাস্ত্র হচ্ছে 'জ্ঞানের কথা' আর শিল্প হচ্ছে "ভাবের কথা"—রসনীয় রূপ। এই মতের তাৎপর্য এই—প্রাকৃতিক বস্তুর রূপই হোক আর জীবনের রূপই হোক, শিল্পীর ভাবাবেগ দ্বারা অনুরঞ্জিত—বাসনার দ্বারা বাসিত না হওয়া পর্যন্ত, শিল্পের মর্যাদা লাভ করে না। শিল্পিত রূপ মানেই বাসনা বাসিত রূপ—রূপাধারে ভাব—ভাবাশ্রিত রূপ।

(গ) তৃতীয় প্রবৃত্তি—রূপকে বা ভাবকে বিলক্ষণ লক্ষণ বলে মনে না করে—প্রকাশের কৌশলেই শিল্পত্ব অন্তর্নিহিত—এই কথা মনে করা। প্রকাশের লক্ষ্য রূপ বা ভাব যাই হোক না কেন, প্রকাশের রীতি বা ভঙ্গিমা অর্থাৎ সংকেতের বিন্যাসকৌশলই—শিল্পের বৈশেষিক লক্ষণ। শিল্পের চমৎকারিত্ব বিন্যাস-কৌশলেরই চমৎকারিত্ব। শিল্পীর কাছে রূপ বা ভাব উপলক্ষ্য, লক্ষ্য—প্রকাশ-ভঙ্গিমার স্বকীয়তা ও বৈচিত্র্য দিয়ে চমৎকার সৃষ্টি করা। ভাস্কর্যে এবং চিত্রে অপূর্ববস্তু নির্মাণের প্রবৃত্তি এবং সাহিত্যে রীতিবাদ, অলংকারবাদ, বক্রোক্তিবাদ এবং ধ্বনিবাদ এই প্রবৃত্তিকেই বেশী-কম ব্যক্ত করেছে।

কারুকলা ও চারুকলা

এবং

চারুকলার শ্রেণীবিভাগ

Any attempt at an aesthetic classification of the arts is absurd......... All the books dealing with classifications and systems of the arts could be burned without any loss whatever.—Theory of Aesthetic—Croce.

এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য—কারুকলার সঙ্গে চারুকলার পার্থক্য এবং প্রধান কয়েকটি চারুকলার—বিশেষত্ব নিরূপণ। ক্রোচের উল্লিখিত মন্তব্য থেকে আপাততঃ মনটাকে সরিয়ে নিয়ে এসে, আমরা শিল্পের জাতিলক্ষণ ও বিশেষ বিশেষ শিল্পের প্রজাতিলক্ষণ নির্দেশ করার চেষ্টা করছি। বলাবাহুল্য জাতিলক্ষণ এবং প্রজাতি-লক্ষণ নির্দেশ করা ছাড়া ব্যক্তিপরিচয় দেওয়ার অন্য কোন বৈজ্ঞানিক উপায় নেই। অতএব সংজ্ঞা নিরূপণের মূলসূত্র প্রয়োগ করেই আমাদের যা' করার করতে হবে। আগের অধ্যায়ে 'শৈল্পিক দৃষ্টি-ভঙ্গী' (aesthetic attitude) সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করা হয়েছে তাতে, 'শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী' বলতে নিছক সৌন্দর্যবাদীরা কি বোঝেন তা' উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে বিশেষভাবেই একথা বলা হয়েছে যে সৌন্দর্যবাদীরা মনে করেন—শিল্পের সঙ্গে অ-শিল্পের মৌলিক পার্থক্য এই যে অ-চারুশিল্প সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানো আর চারুশিল্প অপ্রয়োজনের আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে—তথা নিছক সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। মোট কথা এই যে, শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে প্রচলিত যে ধারণা আছে, তদনুসারে কারুকর্ম ও চারুকলার পার্থক্য নির্দেশ করতে গেলে, এই কথাই বলতে হবে যে কারুকলা হচ্ছে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট মনোরম ব্যবহার্য দ্রব্যবিশেষ আর চারুকলা হচ্ছে নিছক আনন্দ দেওয়ার-প্রয়োজনেই-সৃষ্ট সুন্দর

অর্থাৎ উপভোগ্য রচনা বিশেষ। 'কারু' এবং 'চারু' এই দুটি শব্দকে অবচ্ছেদক হিসাবে ব্যবহার করতে গেলেও দেখা যাবে—"কারু কথাটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ঝোক রয়েছে—নির্মাণ দক্ষতার উপরে এবং "চারু" কথাটার ঝোক রয়েছে—আনন্দ সঞ্চার করার উপরে।* অন্যভাবে বললে বলা যায়—যেহেতু সৃষ্ট বস্তুমাত্রই ব্যাপার-সাধ্য অর্থাৎ কর্ম এবং যে করে সেই 'কারু' এবং কারুমাত্রেই ব্যাপক-অর্থে 'শিল্পী' এবং কারুকর্ম বলতে ব্যাপক অর্থে 'শিল্প' বুঝায় বটে কিন্তু শিল্প শব্দটিকে আমরা বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করি বলে, যে সব কারুকর্মে চারুত্বের মাত্রা বেশী সেই সব কর্মকেই চারুকলা নামে অভিহিত করে থাকি। এখানেই আসছে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের গম্ভীর প্রশ্ন। শিল্পীমাত্রেই "কারু"—কৃৎনু কর্মদক্ষ, ইংরেজিতে সাধারণ অর্থে যাকে বলে 'artisan' এবং তাঁর যে ক্রিয়া তা' সকর্মক—কর্তার ঈপ্সিততম কর্ম এক্ষেত্রে শিল্প দ্রব্য। দ্রব্য শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে এখানে ব্যবহার করছি। চেয়ার, টেবিল, খাতা পেন্সিল যেমন দ্রব্য, তেমনি ভাস্করের নির্মিত মূর্তি, চিত্রকরের চিত্র, গীতকারের গান এবং কবির কাব্যও দ্রব্য। "প্রযোজনমনুদ্দিশ্য মন্দোঽপি ন প্রবর্ত্ততে" এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে—এ কথাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে সব সৃষ্টিই উদ্দেশ্যমূলক এবং যত কিছু সৃষ্টি করেছে মানুষ, জীবনযাপনের প্রয়োজনেই তা' করেছে। এই হিসাবে, চেয়ার-টেবিল প্রভৃতি যেমন প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি. তেমনি মূর্তি, চিত্র, গীতকাব্য প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রীও প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি। কিন্তু একথাও স্বীকার্য—সব প্রয়োজনের প্রকৃতি এক রকম নয়। চেয়ারে আমরা বসি; টেবিলের উপরে বইখাতা প্রভৃতি দ্রব্য রাখি, চশমা দিয়ে দেখি, রেডিও দিয়ে বেতারে সংবাদ, গান বক্তৃতা প্রভৃতি শুনি; ভাত খাই, কাপড় পরি, জামা গায়ে দি, পরদা দিয়ে দরজা বা জানালা ঢাকি। আলমারীতে বইপত্র রাখি,

* করোতীতি কারু=শিল্পী=কৃৎনু। তেমনি চারয়তি—অর্থাৎ 'ভাবকে সঞ্চারিত করে যে সে "চারু"।

ইঞ্জিন তৈরি করে গাড়ী চালাই, টেলিগ্রাফ যন্ত্র বানিয়ে দূরে সংকেত পাঠাই, পা-পোষে পা মুছি, গামছা দিয়ে গা মুছি, হারমোনিয়ম, সেতার, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাই, মূর্তি বা চিত্র রচনা করে স্মৃতি রক্ষা করি—দেখি বা দেখাই, গান গাই বা শোনাই, কবিতা পড়ি বা শোনাই, নাটকে জীবনের রূপ দেখি বা দেখাই। এক কথায়, জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনের চাহিদায় বিভিন্ন স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তু উৎপন্ন হয়েছে। তবে সব কিছুই প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি এ কথা সত্য হলেও প্রয়োজনের চেহারা সব ক্ষেত্রে এক রকম নয়। চেয়ার আলমারীর প্রয়োজন মেটাতে পারে না, খাদ্য পানীয়ের প্রয়োজন মেটাতে পারে না—এক কথায়, একের প্রয়োজন অন্য দ্রব্য মেটাতে পারে না, এবং পারে না বলেই ব্যবহারের প্রকৃতি এবং তদনুসারে দ্রব্যের প্রকৃতিও ভিন্ন হয়ে থাকে। মানুষ প্রয়োজনের তাগিদেই আচরণ করে এবং আচরণমাত্রেই ব্যবহার। এ কথা মানলে (প্রয়োজনের তথা ব্যবহারের তাগিদে) মানুষ যত কিছু দ্রব্য তৈরি করে, তার সব কিছুই 'ব্যবহার্য'। কিন্তু 'ব্যবহার্য' কথাটাকে আমরা এই ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিনে—অর্থাৎ সংকুচিত অর্থে ব্যবহার করি এবং সেই সংকুচিত অর্থে 'ব্যবহার্য দ্রব্য' বলতে বুঝায় সেই সমস্ত দ্রব্যই যা আমাদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রজনন বৃত্তির বিচিত্র ক্রিয়ার বা প্রয়োজনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত—যা অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়মাত্র—নিজেই উদ্দেশ্য নয়। এই হিসাবে 'অপ্রয়োজনীয়' বলতে বুঝায় সেই সৃষ্টিকেই যা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য অর্থাৎ যাকে মানুষ সৃষ্টি করে সৃষ্টি করার আনন্দেই, যাকে মানুষ দেখতে চায় শুধু দেখার আনন্দেই বা শুনতে চায় শোনার আনন্দেই—যার সঙ্গে মানুষের উপযোগের সম্পর্ক থাকে না, আর থাকলেও তা গৌণ থাকে শুধু উপভোগের সম্পর্ক এবং সেইটিই মুখ্য। উপযোগের সম্পর্কে বস্তু মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, উপভোগের সম্পর্কে বস্তু উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্য অর্থাৎ নিজেই উদ্দেশ্য।

নিছক উপভোগের উদ্দেশ্য হতে গেলে, বলা বাহুল্য, বস্তুকে শুধু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় হয়েই থাকতে হয়। সাদা কথায়, শুধু দেখার বস্তু বা শোনার বস্তু বা দেখা-শোনার বস্তু হয়েই থাকতে হয়। অর্থাৎ বিশুদ্ধ উপভোগ্য বস্তু হচ্ছে—সেই বস্তুই যা শুধুই দেখবার, শুধুই শোনবার ; আসল কথা যা বস্তু হয়েও অব্যবহার্য তথা অবস্তুকল্প অর্থাৎ অনুপযোগী সামগ্রী। যেখানে বস্তুর উপযোগ-মূল্য ছাপিয়ে উপভোগ মূল্য বড় হয়ে উঠে সেখানেই তার চারুত্ব। আর যেখানে উপভোগ্যতা থাকলেও তার উপযোগ-মূল্যের প্রাধান্য, সেখানে তা কারুকর্ম (crafts)। এই দিক থেকে দেখলে, যে বস্তুর যত উপযোগী বা ব্যবহার্য হওয়ার সম্ভাবনা সেই বস্তু তত কারুকর্মের মেরুর কাছাকাছি। যেমন মন্দির-প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য-শিল্প। মন্দির বা প্রাসাদ যে পরিমাণে বাসোপযোগী গৃহ, সেই পরিমাণে তা কারুকর্ম, আর যে পরিমাণে তা তার গঠন-সৌন্দর্য দিয়ে উপযোগ বা ব্যবহার-চিন্তা ভুলিয়ে দেয়, সেই পরিমাণে তা চারু-শিল্পের পর্যায়ে পৌঁছায়। উপযোগের গণ্ডী থেকে স্থাপত্যশিল্পের ব্যবধান খুবই সামান্য। তার পর থেকেই ব্যবধান ক্রমে বাড়তে থাকে এবং ভাস্কর্য ও চিত্রের স্তর পেরিয়ে যেতেই ব্যবহার্য বস্তুর সাদৃশ্য—অর্থাৎ বস্তুপ্রকৃতিকতা লোপ পেযে যায়। মূর্তি পাথরের, মাটির, ব্রোঞ্জের বা সোনার যে ধাতুরই হোক না কেন, ইচ্ছা করলে তাকে অন্য উদ্দেশ্যে এবং নিছক বস্তু হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে বটে, কিন্তু মূর্তিকে আমরা কোন স্থূল প্রয়োজনে ব্যবহার করি না। চিত্রকেও স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও অন্য প্রয়োজনে অল্প-স্বল্প ব্যবহার করা যেতে না পারে এমন নয় ; কিন্তু সেক্ষেত্রেও ঐ একই কথা। সংগীতের এবং কাব্যের পর্যায়ে উপাদান যথার্থই অবস্তু—শব্দ ধ্বনি বা সংকেত সমষ্টিমাত্র। শোনবার বা শোনাবার প্রয়োজনে ছাড়া অন্য কোন প্রয়োজনেই তাদের ব্যবহার করা যায় না। অবশ্য কেউ যদি 'বৈকুণ্ঠের খাতা'য় বিপিনের মত বইকে না পড়ে বাজায় অথবা কেউ যদি শক্ত মলাটের বই দিয়ে ছাত্রের মাথায় গাঁট্টা মারেন

বা জলের গ্লাস ঢেকে রাখেন—বইয়ের পাতা পুড়িয়ে দুধ গরম করেন—তবে তা ব্যতিক্রম বলেই গন্য করতে হবে। প্রশ্ন উঠবে—কেউ যদি গানকে মনের আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করার কাজে ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন বা টাকা-পয়সা উপার্জনের উপায় হিসাবে অথবা দর্শের মনে বিশেষ কোন আবেগ সঞ্চার করবার উত্তেজক হিসাবে ব্যবহার করেন, সে ক্ষেত্রে গান কি অন্যান্য উপযোগী দ্রব্যেরই মতো উপায়মাত্র নয়? তেমনি মূর্তি, চিত্র এবং কাব্যকে উপায় হিসাবে ব্যবহার করা চলে নাকি? সূক্ষ্ম প্রয়োজন যে মেটায় সেও কি ঐ প্রয়োজনসিদ্ধির উপায় নয়? এই প্রশ্নের উত্তর আগেই একবার দেওয়া হয়েছে—বলা হয়েছে—অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টি বলে কোন সৃষ্টি নেই, আছে শুধু প্রয়োজনের রকমফের। কারণ সৃষ্টি মানেই উপযোগিতার সৃষ্টি—'creation of utility'। কারুকর্মে মুখ্যতঃ যে উপযোগিতা সৃষ্ট হয় তাকে বলা যায়—আধিমানসিক ব সাঞ্চারিক।* কারুশিল্পের পক্ষে যেমন ব্যবহারিক উপযোগিতা লক্ষ্য, চারুশিল্পের পক্ষে তেমনি আধিমানসিক উপযোগিতা লক্ষ্য। উপযোগিতার দিক দিয়ে যে যত হীন বা দীন সে তত লক্ষ্যভ্রষ্ট, সে তত হেয়। অব্যবহার্য কারুকর্ম এবং সঞ্চারশক্তিহীন চারুকর্ম উভয়ই সমান হেয়—সমান লক্ষ্য ভ্রষ্ট।

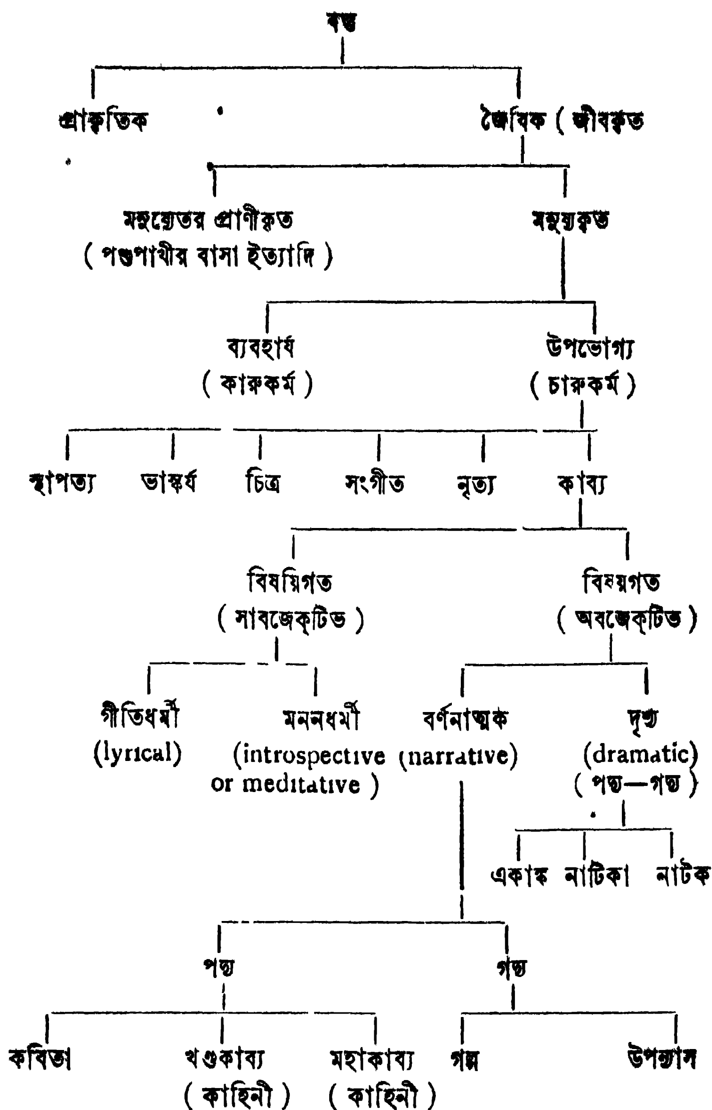
তাই বলে একথা কিন্তু সত্য নয় যে—ব্যবহার্যকে উপভোগ্য করা সম্ভব বা বাঞ্ছনীয় নয় এবং উপভোগ্যকে সমান মাত্রায় উপভোগ্য রেখেই ব্যবহার্য হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। উপযোগ এবং উপভোগ—এই দুই মূল্যকে যতক্ষণ পরস্পরবিরুদ্ধ ব'লে স্বীকার করা না হবে ততক্ষণ ঐরূপ কোন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হবে না। উপভোগমূল্যে ষোল আনা মূল্যবান হয়েও চারুশিল্প শিল্পীর জীবিকার্জনের উপায়, জীবন-সমালোচনার বা জীবনদর্শনের প্রচার বা বাহন তথা উপযোগী হতে পারে। সুতরাং কারুকর্ম—প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি এবং চারুকর্মের উদ্দেশ্য নিছক অপ্রয়োজনের

* আনন্দ, সৌন্দর্য, ভাবাবেগ প্রভৃতি মানসিক প্রয়োজন।

আনন্দ দেওয়া—এই বাক্য দুটিকে খুব সতর্কভাবে এবং প্রকরণসহ ব্যবহার করা দরকার। আধিমানসিক উপযোগিতা সৃষ্টি করা যার উদ্দেশ্য, মনের উপরে সে যে প্রভাব বিস্তার করবেই—মনের সংস্কারকে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করবেই তথা সামাজিকের জ্ঞান-প্রেম-কর্মকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেই—এ কথা সহজেই অনুমান করা যায় এবং সব সময়েই মনে রাখতে হবে। কারণ এই ধারণায় গণ্ডগোল থাকলে—শিল্প সমালোচনায় গণ্ডগোল বাধবেই ; বেধে থাকেও। এমন বহু সমালোচক দেখা যায় যাঁরা উপভোগ এবং উপযোগের মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা কল্পনা করেন এবং উপযোগমূল্যকে শিল্পের অপকর্ষ বলে গণ্য করে থাকেন—উপযোগ-মূল্য থাকায় শিল্পকে "প্রচারধর্মী" অপবাদ দিয়ে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন। এঁরা ভুলে যান বা ভুল করেন—সঞ্চার ও প্রচার স্বতোবিরুদ্ধ ব্যাপার নয়। একে অন্যকে পরিপোষণ করতে পারে। সঞ্চার-সহায় হ'লে প্রচারের শক্তি বাড়ে এবং প্রচারে সঞ্চারের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়।

যাই হোক—ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর সঙ্গে চারুশিল্পের মৌলিক পার্থক্য কোথায়, আশা করি এতক্ষণে পাঠক তা' বুঝতে পেরেছেন এবং 'ব্যবহারিক উপযোগিতা' এবং 'আধিমানসিক উপযোগিতা' এই কথা দুটির তাৎপর্য এবং 'প্রয়োজন' এবং 'অপ্রয়োজন'—শব্দ দুটি যে পারিভাষিক বা সংকুচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়, তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ সম্বন্ধে আর বিস্তারিত আলোচনা করবার প্রয়োজন বা অবকাশ নেই। জিজ্ঞাসু পাঠকের মনে উভয়ের সীমারেখা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগবে এবং জিজ্ঞাসা মেটাতে যেয়ে তিনি দেখতে পাবেন যে অনেকেই ঐ প্রশ্ন তুলেছেন এবং ব্যবহারিক একটি সীমারেখা টেনে নিয়ে সন্তুষ্ট রয়েছেন। আমরাও মহাজনের পথ অনুসরণ করেছি।

এবার প্রধান কয়েকটি চারুকলার পরিচয় দেওয়া যাক। তবে তার আগে আমি একটি শ্রেণীবিভাগ-তালিকা পাঠকদের সামনে ধরে দিচ্ছি :—



'প্রবন্ধ' মূলতঃ চিন্তার প্রকাশ এবং প্রবন্ধের কাব্যত্ব রচনারসের মধ্যেই নিহিত।

এই তালিকার দিকে তাকালেই পাঠক দেখতে এবং বুঝতে পারবেন—"বস্তু"কে আমরা মহাজাতি হিসাবে গণ্য করেছি। বস্তুনিচয়কে প্রকৃতিকৃত এবং জীবকৃত এই দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছি এবং জীবকৃত সৃষ্টিকে আবার মনুষ্যেতর জীবের সৃষ্টি এবং মানুষের সৃষ্টি, এই দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছি। দেখাতে চেয়েছি—শিল্পের জগৎ মনুষ্যকৃত সৃষ্টির জগৎ এবং প্রকৃতিকৃত বস্তু এবং মনুষ্যেতরপ্রাণীকৃত বস্তু শিল্প-জগতের বাইরে। কিন্তু মানুষ যে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছে তাদের সব কিছুকেই আমরা শিল্পের মর্যাদা দিই না, আর দিলেও তাদের মোটামুটি দু' শ্রেণীতে ভাগ করে থাকি। এক শ্রেণীতে রাখি—ব্যবহার্য বস্তুগুলি—কারুকর্মগুলি এবং অন্য শ্রেণীতে রাখি—উপভোগ্য বস্তুগুলি বা চারুকর্মগুলি। কথায় বলে 'চৌষট্টি কলা'। চৌষট্টি এখন বহুগুণিত হয়েছে। কলার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু তা গেলেও কারুকলাকে এখনও মোট পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। অবশ্য কেউ কেউ স্থাপত্যকে বাদ দিয়ে ভাস্কর্য, চিত্র, সংগীত ও কাব্য—এই চারটিকেই মুখ্য চারুকলা বলে গণ্য করে থাকেন।* আমরাও যে স্থাপত্যকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী, নিশ্চয়ই আগের আলোচনা থেকে অনেকে তা' অনুমান করেছেন। যার এক পা কারুকলার গণ্ডীতে, অন্য পা চারুকলার গণ্ডীতে, তাকে নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ চারুকলা বলা চলে না। সে যাই হোক, এবার একে একে চারুকলাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

এই প্রসঙ্গেই শিল্পের উপাদান ও বাহন সম্পর্কে দু একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। উদ্ধৃতি দিয়েই বলা শুরু করা যাক—

---

* There are four main types of works of arts—the products of the arts of literature, painting, sculpture and music. In addition to these main types there are the decorative arts, the useful or industrial arts, such as architecture, ceramics and textiles and various intermediate arts, such as drama, dancing and opera which combine two or more of the main types." (Theory of Beauty—Osborne.)

For the production of any art there are two necessaries:—the *material* with which the artist creates and the *vehicle* by which his creation is conveyed to the perception of otheis. Fine Art—Prof. H. S. Goodhart Rendel.

উল্লিখিত উদ্ধৃতির মধ্যে—"material" (উপাদান) এবং "vehicle" (বাহন বা আধার) এই দুটি শব্দ লক্ষণীয় এবং বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় এই কারণে যে শব্দ দুটির অর্থ-তাৎপর্য সকলের কাছে সমান নয়। অধ্যাপক গুডহার্ট-রেনডেল মহাশয় 'উপাদান' বলতে বুঝেছেন—বিশেষ বিশেষ উপাদানের আইডিয়া বা তন্মাত্রকে, আর বাহন বলতে বুঝেছেন ঐ উপাদানের ব্যক্ত রূপটিকে। যেমন সংগীতের উপাদান হচ্ছে "ideas of sounds" এবং বাহন হচ্ছে—"actual sounds"। স্থাপত্যের উপাদান হচ্ছে—idea of masses, বাহন হচ্ছে "actual masses"। অনেকে এই অর্থে শব্দ দুটিকে ব্যবহার করেন না। তাঁদের মতে শিল্পের উপাদান হচ্ছে—"the class of sensa which are organized by the artist"। যেমন সংগীতের উপাদান "ধ্বনি" (sounds) স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উপাদান—বস্তুপিণ্ড বা ধাতুপিণ্ড (masses), কাব্যের উপাদান শব্দ (words) ও অর্থ (meaning) আর শিল্পের 'বাহন' হচ্ছে—

> "that which persisting unchanged through time and outside perception or apprehension enables the same organization of material to entei the experience of different persons at diffeient times.

যেমন চিত্রের "বাহন" হচ্ছে—পটের উপর রঙ-রেখার বিন্যাস, স্থাপত্যের হচ্ছে—প্রস্তরময় প্রাসাদ বা মন্দির, ভাস্কর্যের বাহন হচ্ছে—প্রস্তর, কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতির 'মূর্তি'। সংগীতের বাহন রাগ-রাগিনী বা ধ্বনির বিশিষ্ট বিন্যাস এবং সাহিত্যের বাহন—কবিতাদি রচনা। প্রথম মতের তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে এই যে শিল্প হচ্ছে আসলে উপাদানকেই বাহনের সাহায্যে ব্যক্ত করা—এক কথায় উপাদানেরই বিচিত্র অভিব্যক্তি এবং দ্বিতীয় মতে, শিল্প হচ্ছে বিশেষ বিশেষ

উপাদানের সাহায্যে নানা উপভোগ্য বাহনের বা আধারের কল্পনা। উভয়ক্ষেত্রেই শিল্প উপাদান প্রয়োগের কৌশল এবং শিল্পীর শিল্পিত উপাদান বিন্যাসের দক্ষতা—রূপদক্ষতা—উপাদানের বিচিত্র বিন্যাসের বা রচনার ভিতর দিয়ে সৌন্দর্যের আদর্শকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। এঁদের মতে স্থপতি পাথর, বা সিমেণ্টের উপাদান দিয়ে মন্দির বা প্রাসাদের আধারে সৌন্দর্যের আদর্শকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন; চিত্রকর রং-রেখার সাহায্যে চিত্রের আধারে সৌন্দর্য চেতনাকে ব্যক্ত করেন, ভাস্কর পাথর, কাঠ, ধাতু প্রভৃতি উপাদান সাহায্যে মূর্তির আধারে সৌন্দর্য ব্যক্ত করেন; সংগীতকার ধ্বনির উপাদানে রাগ-রাগিনীর আধারে সুর সৌন্দর্যকে ব্যক্ত করেন এবং ভাষাশিল্পী ভাষার উপাদানে গীতিকাবিতা, খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনার আধারে 'শব্দার্থের সাহিত্য' তথা সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। এঁদের মতে, অনির্দেশ্য সৌন্দর্যের স্বরূপ ব্যক্ত করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য, বিভিন্ন শিল্প-প্রজাতি বাহন বা আধার এবং মাটি, পাথর, ধাতু, রং ও রেখা ধ্বনি, শব্দ প্রভৃতি উপাদান। যাই হোক, অনেকে মনে করেন—শিল্প-সৃষ্টি আসলে প্রকাশ বা নির্মাণ ব্যাপার। শিল্পী প্রকাশ ক্রিয়ার বা নির্মাণ ক্রিয়ার কর্তা। মাটি, পাথর, ধাতু, রং, রেখা, ধ্বনি, শব্দ প্রভৃতি নির্মাণের উপাদান বা কারণ। নির্মাণ করতে যে সব যন্ত্রপাতি আবশ্যক তারা উপকরণ; শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য বিশেষ বিশেষ ধ্যানকে বা পরিকল্পনাকে, এক কথায় বিষয়কে, সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা। সুষ্ঠু প্রকাশেরই নামান্তর সৌন্দর্য। এঁদের মতে স্থপতির মুখ্য উদ্দেশ্য—প্রাসাদ মন্দির প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে তথা সুন্দরভাবে নির্মাণ করা; অর্থাৎ ইট, কাঠ, পাথর, কনক্রিট প্রভৃতি উপাদানের সামর্থ্যকে প্রাসাদের বা মন্দিরের ধ্যান বা পরিকল্পনার আদর্শ রূপটি ব্যক্ত করতে প্রয়োগ করা। ভাস্করের উদ্দেশ্য উপযুক্ত উপাদানের সাহায্যে সুষ্ঠুরূপে মূর্তি গঠন করা—চিত্রকরের উদ্দেশ্য রং-রেখার সাহায্যে পটের আধারে রূপের অভিজ্ঞতা বা স্মৃতিকে স্মরণীয় ক'রে রাখা—প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা জীবের

বা মানুষের রূপ আঁকা। সংগীতকার ধ্বনির উপাদানের এবং ধ্বনিযন্ত্রের উপকরণের সাহায্যে ভাবাবেগের বিচিত্র গতি-প্রকৃতি বা আদর্শ রূপ ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন এবং কবি শব্দার্থের সাহিত্যে আভ্যন্তরিক ভাবাবেগকে এবং বাহ্যিক অভিজ্ঞতাকে নানা আধারে ব্যক্ত করেন। সুতরাং শিল্পসৃষ্টির জন্য চাই—(ক) উপাদেয় বা বিষয়ের ধ্যান—উপাদান দিয়ে যাকে নির্মাণ করতে হবে। (খ) উপাদান এবং (গ) উপকরণ—উপাদানকে উপযোগী ক'রে তোলার উপায়। লক্ষণীয়—বাহন বা আধার—(যা'কে 'vehicle' বলা হয়েছে) উপাদানের ও উপাদেয়ের প্রকৃতির সংযোগে উপজাত হয় ব'লে পৃথক ক'রে উল্লেখ করা হল না।

এই প্রসঙ্গেই স্মরণীয়—প্রত্যেক উপাদানের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ এবং উদ্দেশ্যের বা উপাদেয় বিষয়ের প্রকৃতিই উপাদান নির্বাচন নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যে শিল্পী পাথর, মাটি, ধাতু, কাঠ ছাড়া অন্য উপাদান নিয়ে কাজ কাজ করতে চাইবেন না, তাঁর পক্ষে কোনকালেই চিত্র বা সংগীত বা কাব্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না অর্থাৎ চিত্রে বা সংগীতে বা কাব্যে প্রকৃতির ও জীবনের অভিজ্ঞতাকে যত ব্যাপক ও বিচিত্র আকারে প্রকাশ করা সম্ভব তা করতে পারবেন না। যিনি পাথরের পর পাথর, ইটের পর ইট, কাঠের পরে কাঠ স্থাপন করে বিচিত্র ও সুদৃশ্য আয়তনের কক্ষ বা ক্ষেত্র তৈরি করতে সংকল্পিত, তাঁর পক্ষে যেমন বিশেষ সীমার বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমনি যিনি পাথর, মাটি, কাঠ, ধাতু দিয়ে প্রাসাদ বা মন্দির প্রভৃতি তৈরি করতে না যেয়ে, বিশেষ কোন মূর্তি গড়তে ইচ্ছুক হবেন, তিনিও তার উপাদানের সামর্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। এমনি করে প্রত্যেক শিল্পীই তার উপাদান-সামর্থ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ। জঁ। পল সার্ত্রে মহাশয়ের একটি মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—

"... it is not only the form which differentiates, but the matter as well. And it is one thing to work with colour and sound, and another to express oneself by means of words." (What is Literature)

অর্থাৎ এক শিল্প থেকে অন্য শিল্প শুধু যে রূপেই পৃথক তা নয়, উপাদানেও পৃথক। রং ও ধ্বনি নিয়ে কাজ করা এক ব্যাপার, ভাষা দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা ভিন্ন ব্যাপার। এই কথাটা মনে রাখতেই হবে—শিল্পের উপাদান ও উপাদেয় বা উদ্দেশ্য, একে অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। উপাদান যেমন উদ্দেশ্য নির্বাচনকে, উদ্দেশ্য তেমনি উপাদান নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। উপাদানের সামর্থ্যের উপরে শিল্পের প্রকাশের পরিধি—প্রকাশ্য বিষয়ের প্রকৃতি নির্ভর করে। এই কথাটি মনে রাখলে—বিভিন্ন চারুকলার লক্ষ্য ও সামর্থ্য নিরূপণ করা সহজ সাধ্য হবে।

স্থাপত্য (Architecture)

হে সম্রাট কবি
এই তব হৃদয়ের ছবি
নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে···

—রবীন্দ্রনাথ

তাজমহল, অন্তরে 'এক বিন্দু নয়নের জল কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'—বিরহী শাজাহানের বাণী নিয়ে অলক্ষ্যের পানে ছন্দে গানে উধাও হয়ে গেছে—এমন এক মর্মরময় নবমেঘদূত বটে, কিন্তু বাইরে সে ছন্দোময় সুষমাময় একটি মন্দির—স্মৃতিমন্দির—গম্বুজ, খিলান, মিনার, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ প্রভৃতির এক বিস্ময়কর সুষমাময় সমাবেশ। তলদেশে ভিত্তি, উপরে চূড়া—এই দুই দেশের (space) আয়তনের মধ্যে আকাশের পটভূমিতে এবং বিচিত্র জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সংযোগে গঠিত সুষমাময় এক মহান রচনা—আকাশের পটে অপূর্ব মর্মরচিত্র—অপরা নির্মিতি—উপাদান সামর্থ্যের পরাকাষ্ঠা প্রযোজনা—বিশিষ্ট ধ্যানের এক পূর্ণ অভিব্যক্তি।

স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য এবং অদ্বিতীয় নিদর্শন এই তাজমহল। তাই তাজমহলকেই সামনে রেখে আমরা স্থাপত্য শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ধারণে অগ্রসর হচ্ছি। তাজমহল স্মৃতি-মন্দির—মমতাজের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করবার উদ্দেশ্যেই তাজমহলের সৃষ্টি। তাজমহল মর্মরে গঠিত মণিরত্ন খচিত ইমারৎবিশেষ। তার ঊর্ধ্বে আকাশ এবং চারিপাশে প্রাকৃতিক দৃশ্যের পটভূমি; ধবধবে শাদা-পাথরের ও মণিরত্নখচিত মিনার, গম্বুজ প্রভৃতির বর্ণশোভা এবং মিনার, গম্বুজ, অলিন্দ, কক্ষ, বাতায়ন, দ্বার, খিলান প্রভৃতির সুষমাময় বিন্যাস—দর্শকের নয়নে ও মনে উদ্দীপনা এনে সৌন্দর্য বোধের পরম পরিতৃপ্তি ঘটায় তথা অপার আনন্দ জাগায় এবং এ কথাও ঠিক, স্মৃতি রক্ষার প্রয়োজনে যার সৃষ্টি, সুন্দর হয়ে সে সেই প্রয়োজনকে আরো বেশী করেই সিদ্ধ করেছে—তাজমহল যত বিস্ময়কর সুন্দর হয়েছে তত বেশী মাত্রায় সে শাজাহানের উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করেছে। কিন্তু এ কথাও সত্য, যে প্রয়োজনেই তাজমহল নির্মিত হোক, আপন গঠন সুষমার মহিমায় বা সৌন্দর্য-মূল্যে তাজমহল স্বকীয়তা তথা চিরদর্শনীয়তা বা চারুত্ব লাভ ক'রে অমর হয়েছে—"a thing of beauty" হয়ে—"a joy for ever"-এ পরিণত হয়েছে। শুধু যে তাজমহলের মতো স্মৃতিমন্দিরের পক্ষেই এ কথা সত্য, তা নয়; দেবমন্দির, প্রমোদভবন, প্রাসাদ প্রভৃতি যে-কোন "স্থাপত্য-শিল্প" সম্বন্ধেই এ কথা প্রযোজ্য। দেবমন্দির দেব বিগ্রহের আবাস,—প্রমোদভবন, প্রাসাদ সবই প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি, কিন্তু প্রয়োজনীয়কে আকর্ষনীয় তথা দর্শনীয় করার চেষ্টার ফলে প্রয়োজনের বস্তুই যখন বিলক্ষণ ছন্দোময় ও সুষমামণ্ডিত হয় —সৌন্দর্যমূল্যে মূল্যবান হয়ে বিশিষ্টতা লাভ করে, তখনই তা' চারুশিল্পের পদবীতে আরোহণ করে। মূল প্রশ্ন থেকেই যাবে—উপযোগ-মূল্যের অধিক কী এই সৌন্দর্য মূল্য? এ কি শুধু গঠন-গত সুষমা—সমগ্রের সঙ্গে অংশের সুসামঞ্জস্য—"organic unity"-র বা configuration-এর সৌন্দর্য? না আর কিছু? তাজমহল সুন্দর কি এই কারণেই যে তা আমাদের মধ্যে "ঈস্থেটিক ইমোশান"

জাগায়? অথবা তার রূপ দেখে আমাদের কোন নিগূঢ় বাসনা পরোক্ষভাবে চরিতার্থ হয় বলেই আমরা আনন্দ পাই এবং তাজমহলকে সুন্দর বলি?

সৌন্দর্যতত্ত্বের সেই মূল সমস্যা। বারবার এই সব প্রশ্ন উঠবে। পাঠক কোন্ পক্ষ নেবেন, সতর্কভাবে তাঁকে তা স্থির করতে হবে। তবে যে পক্ষই তিনি নিন, তাজমহল আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করেই সুন্দর হয়েছে এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে স্থাপত্যশিল্প সৌন্দর্যমূল্যে যত মূল্যবান এবং দর্শনীয়ই হোক, চিত্র, সংগীত, কাব্যাদি শিল্প যে অর্থে অলৌকিক ঠিক সেই অর্থে অলৌকিক নয়। স্থাপত্য মানুষের সৃষ্টি বটে—এবং লৌকিক বস্তুর ধারণাকেই অর্থাৎ গৃহের বা প্রাসাদের বা মন্দিরের ধারণাকেই রূপবান করবার তথা ব্যক্ত করবার চেষ্টাও বটে, কিন্তু যে উপাদান দিয়ে ধারণাকে ব্যক্ত করা হয় অর্থাৎ বস্তুটিকে নির্মাণ করা হয় সেই উপাদান এবং লৌকিক বস্তুর উপাদান এক বলে এবং শিল্পবস্তুটির আকৃতি-প্রকৃতিও প্রায় এক বলে—স্থাপত্য শিল্প লৌকিককল্প। ইট, কাঠ, পাথর প্রভৃতি উপাদান দিয়ে যেমন লৌকিক প্রাসাদ, মন্দির প্রভৃতি গঠিত, তেমনি সেই একই উপাদানে স্থাপত্য-শিল্পও গঠিত। তাজমহল বা মন্দিরাদি সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নির্মিত হলেও, তাজমহলে বা মন্দিরে মানুষ বসবাস করতেও পারে। অর্থাৎ স্থাপত্য-শিল্প নিছক উপভোগ্য নয় ব্যবহার্যও বটে। তবে কেউ যদি তাজমহলের অনুকরণে মডেল তৈরি করে,—হাতির দাঁতে বা অন্য কিছু ধাতু দিয়ে তাজমহল, অথবা মন্দিরাদি নির্মাণ ক'রে—এবং তা' করে শুধু নির্মাণ কৌশল—নির্মাণ বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলন—দেখাবার জন্যই—সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করবার জন্যই তাহলে অবশ্য তাঁর সৃষ্টি আর ব্যবহার্য বা লৌকিক থাকবে না—নিছক উপভোগ্য বা অলৌকিক হয়ে উঠবে। 'চিত্রতুরগ' (ছবির ঘোড়া) যে অর্থে অলৌকিক, শেষোক্ত নির্মিতিগুলি সেই একই অর্থে অলৌকিক পদার্থ হবে। কিন্তু তাজমহল প্রভৃতি স্মৃতিমন্দির এবং

দেবমন্দিরাদি সেই অর্থে অলৌকিক নয়। স্থাপত্যের গণ্ডী পার হয়ে গেলেই শিল্পবস্তুর অলৌকিকত্বের মাত্রা বাড়তে থাকে। ভাস্কর যে মূর্তি গঠন করেন, সেই মূর্তির লৌকিক উপাদান এবং শৈল্পিক উপাদান এক নয়। মাটির বা পাথরের বা ধাতুর উপাদানে গড়া জীবজন্তুর মূর্তি বা মানুষের মূর্তি—জীবন্ত প্রাণীর দেহ যে উপাদানে গঠিত সেই উপাদানে গঠিত নয় এবং ঐ মূর্তিগুলিকে জীবজন্তুর বা মানুষের মতো ব্যবহার করাও যায় না। চিত্রের মূর্তি আরো সূক্ষ্ম উপাদানে নির্মিত—তাই আরো অলৌকিক। সংগীত ও সাহিত্যের উপাদান অবস্তু—আরো সূক্ষ্ম কতকগুলি সংকেত। সে যাই হোক—এই কারণেই, স্থাপত্য কারু এবং চারুশিল্পের সীমানার উপরে দাঁড়িয়ে আছে এবং উপযোগ ও উপভোগের এক সুন্দর সমন্বয়ের নিদর্শন।

স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—স্থাপত্য-শিল্পের সৃষ্টির মূলে উপযোগ-দৃষ্টি সব যুগেই কাজ করেছে এবং জর্জ স্যান্তায়নের ভাষায় বলা যেতে পারে—স্থাপত্যের গঠনে 'line of use or habit' ক্রমে 'line of beauty'-তে পরিণত হয়েছে। ইজিপটের স্থাপত্য শিল্প—(১) স্মৃতিসৌধ বা পিরামিড (সংখ্যায় ৭০টি) (২) মন্দির—(ক) দেবমন্দির (খ) রাজভবন।* চ্যাল্‌ডেইয়ার স্থাপত্য শিল্প—বিশেষ করে দেবমন্দিরগুলি, ব্যাবিলোনের, এসিরিয়ার, পারস্যের, হিটাইট ও ফিনিসিয়ার স্থাপত্য কর্ম—গ্রীক স্থাপত্য, প্রাচীন ভারতীয় ও মধ্যযুগের স্থাপত্য, মোগল স্থাপত্য, এট্রুস্কান ও রোমান স্থাপত্য, বাইজানটাইন স্থাপত্য, সেরাসেনীয় স্থাপত্য, রোমানেস্ক স্থাপত্য, গথিক স্থাপত্য, রেনেসাঁস স্থাপত্য এবং পরবর্তী যুগের স্থাপত্য কর্মগুলির গঠন বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গঠন পরিকল্পনা উপযোগ-চিন্তা, উপাদান, উপকরণ, ভৌগোলিক আবহাওয়া এবং

* হাওয়ারার লেবাইরিনথ ··বা মন্দিরশ্রেণী উল্লেখযোগ্য—সর্ববৃহৎ মন্দির—জাতীয় মন্দির কণার্কের মন্দিরের এবং লুক্সোরের মন্দিরের উচ্চ স্তম্ভগুলি দর্শনীয় বস্তু।

প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রয়োজনীয় বস্তুকে সুদৃশ্য (fomally elaborate) করবার চেষ্টা থেকেই ক্রমশঃ নানা কারুকার্য এবং নতুন অঙ্গ পরিকল্পনা দেখা দিয়েছে—এক'এক দেশে এক এক বিশেষ গঠনের দিকে ঝোঁক এসেছে। কেউ স্তম্ভ-শ্রেণী গঠনে, কেউ চূড়া বা মিনার গঠনে, কেউ গম্বুজ গঠনে, কেউ খিলান গঠনে, কেউ জ্যামিতিক ক্ষেত্রের বৈচিত্র রচনায়, কেউ গাত্র-পরিমার্জনে বা লেপ কর্মে বা গাত্রশোভা বর্ধনে দক্ষতা ও প্রবণতা দেখিয়েছে। কিন্তু যেহেতু কল্পনার উপাদান যোগায় অভিজ্ঞতা বা পরিবেশ, সেইহেতু তাতে যত অপূর্বতাই বা বৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনের অবকাশই থাক, পরিবেশ-সাপেক্ষ না হয়ে তার উপায় নেই। ঈজিপটের স্থাপত্য কর্মের গঠন সম্পর্কে মন্তব্য করতে যেয়ে Andre S. Blum মহাশয় "শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থে যে কথাটি বলেছেন—সেই উক্তিটি "Their architecture always sought its inspiration in nature" সব ক্ষেত্রেই কম বেশী প্রযোজ্য। আধুনিক স্থাপত্য কর্মে যত "Stylization"ই দেখা দিক, একটু তলিয়ে দেখলেই "the part played by nature in the constitution of linear drawing and abstract design" * চোখে পড়বে। design যত abstractই হোক তাকে শেষ পর্যন্ত উপাদান-সামর্থ্য, উপকরণ-সামর্থ্য এবং উপস্থাপ্য বিষয় নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। আগেই বলেছি—স্থাপত্য শিল্পকে আমরা আকাশপটে নির্মাণ-করা প্রস্তর ইষ্টক-মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত ত্রিমানবিশিষ্ট চিত্র বলতে পারি। তার আবেদন শুধু যে তার গঠনের জ্যামিতিক সুষমার জন্যই তা নয়, তার আবেদনের মূলে আরো অনেক কিছু কাজ ক'রে থাকে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে সন্নিবেশিত প্রস্তরাদি বস্তুর বিরাট ও ছন্দোময় সমাবেশ, শুধু সঙ্গতি বা সুষমা বোধকেই বা বর্ণরুচিকেই চরিতার্থ

* ইলামাইট সভ্যতার—"সিরামিকস্"-এর গঠন সৌন্দর্য আলোচনা প্রসঙ্গে M. Pottier-এর উক্তি।

করে না, সঙ্গে সঙ্গে, জর্জস্যান্তায়ন যাকে বলেছেন "emotion of extent" সেই আকৃতিগত-বিশালতাজনিত আবেগও সৃষ্টি করে। বিশাল প্রাসাদ দেব মন্দির স্মৃতিমন্দির প্রভৃতির আবেদনের মূলে যে এই আবেগের বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে—এ কথাটা মনে রাখা দরকার।

ভাস্কর্য (Sculpture)

এরিস্টটল বলেছেন—এক শিল্পকলা থেকে অন্য শিল্প পৃথক হয় নিম্নলিখিত তিনটির যে কোন একটির পার্থক্যে—(ক) উপাদান (মিডিয়াম), (খ) অনুকার্য বিষয় (অবজেক্ট্ অফ ইমিটেশান) এবং (গ) অনুকরণ রীতি (মোড অফ ইমিটেশান)। এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা ভাস্কর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের উপাদান গত খানিকটা ঐক্য থাকলেও, সকলেই জানেন, দুয়ের অনুকার্য বিষয় পৃথক এবং পৃথক বলেই উপাদানের প্রয়োগেও বেশ পার্থক্য দেখা দেয়। স্থাপত্যের উপস্থাপ্য প্রাসাদ, দেবমন্দির, স্মৃতিমন্দির প্রভৃতি ভবন বা তৎসদৃশ কোন কিছু ; সেখানে, নির্মাণ কার্যে প্রস্তরাদি উপাদানের ব্যবহার ঐ বিষয়ের প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নানা আয়তনবিশিষ্ট প্রস্তরের উপরে প্রস্তর ইষ্টকের উপরে ইষ্টক, কাষ্ঠের উপরে কাষ্ঠ স্থাপনা করে অথবা এক খণ্ডের সঙ্গে অন্য খণ্ড যোজনা ক'রে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ভাস্কর্যের অনুকার্য বিষয় যেহেতু স্বতন্ত্র অর্থাৎ "মূর্তি", প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, ধাতু প্রভৃতি উপাদানকে ব্যবহার করার পদ্ধতিও সেখানে পৃথক। পাথর থেকে মূর্তি তৈরি করতে গেলে একখণ্ড আস্ত পাথরকেই হাতুড়ি বাটালি দিয়ে খুদে খুদে মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। ধাতু দিয়ে মূর্তি গড়তে গেলে ধাতুকে মূর্তির ছাঁচে ঢালাই করেই তা করতে হবে। ঘরের দেওয়াল গাঁথতে হলে মাটিকে যেভাবে প্রস্তুত করতে হবে, প্রতিমা গড়তে সে ভাবে প্রস্তুত করলে চলবে না। ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন উপাদান-প্রয়োগ পদ্ধতি।

ভাস্কর্য মানুষের রূপ-রসিকতারই বিশিষ্ট এক প্রকার অভিব্যক্তি। বিশিষ্টতা এখানেই যে ভাস্কর তার ব্যক্তিরূপচেতনাকে, ব্যক্তি রূপের অভিজ্ঞতাকে তথা আনন্দকে—পাথর, মাটি, কাঠ, ধাতু প্রভৃতি স্থূল উপাদানের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেন এবং ত্রিমান বিশিষ্ট বস্তু নির্মাণ করেন। ঈজিপটের ভাস্কররা পাথর, বেলেপাথর, গোলাপী পাথর, চুণোপাথর প্রভৃতির সাহায্যে—চার যুগ ধ'রে * কত বিচিত্র ও সুন্দর সুন্দর মূর্তিই না গড়েছিলেন। এলাম, চ্যালডিয়া, ব্যাবিলোন, আসিরিয়া, পারস্য, হিট্টাইট, ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের সর্বত্র ভাস্কর্যের সুন্দর সুন্দর প্রাচীন নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে। আসিরিয়ার আহত সিংহীর মূর্তি, খোরসাবাদের ডানাওয়ালা ষাঁড়ের মূর্তি গ্রীসের এথেনা এফ্রোদিতি, "ডিসকোবোলোস" ডানাওয়ালা বিজয়-মূর্তি, কুস্তিগির, মুমূর্ষু গোল, স্ত্রীহত্যায় উদ্যত গোল প্রভৃতি মূর্তি, রোমের সিজার আগস্টাসের (দণ্ডায়মান) মূর্তি, রেনেসাস-যুগের এবং পরবর্তী যুগের বিচিত্র ভাবের ও ভঙ্গিমার মূর্তিগুলি, ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের এক বিরাট মিছিল। শিল্পের ইতিহাস পাঠ না করলে, বিশেষতঃ মূর্তিগুলি চোখে না দেখলে এই সৌন্দর্যরাজ্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যাবে না। ভাস্কর্য যেহেতু ব্যক্তিরূপের অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তিরূপ—যে মুহূর্তেরই ব্যক্তিরূপ হোক—ব্যক্তির আচরণেরই রূপ, প্রত্যেক মূর্তিই আসলে ভাবময় রূপ। সুতরাং বিশেষ লক্ষণীয় এই যে ভাস্কর্যের পর্যায় থেকেই রূপের সঙ্গে ভাবের যোগ (mood, feeling, emotions) পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভাস্কর যে মূর্তি সৃষ্টি করেন তা বাহ্যত রূপ বটে কিন্তু আসলে ভাবেরই বিগ্রহ—মূর্তির মাধ্যমে বিশেষ কোন ভাবকেই পরিস্ফুট করবার চেষ্টা। এক হিসাবে এ যেমন ভাবকে রূপের মধ্যে অঙ্গ দান করা, অন্য হিসাবে তেমনি রূপকে ভাবের মধ্যে মুক্ত করে দেওয়া। এখানেই রয়েছে ভাস্কর্যের চতুর্থমান

* (১) মেফাইট, (২) প্রথম থেবান সাম্রাজ্য (৩) দ্বিতীয় থেবান সাম্রাজ্য (৪) সেইত নবজাগরণ।

(fourth dimension)। বাহ্যতঃ দেখলে মূর্তিগুলিকে ব্যক্তিরূপের অনুকরণ বলেই মনে হবে কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে রূপের অন্তরালে সূক্ষ্ম শরীরের মতো বিরাজ করছে একটি ধ্যান। প্রত্যেক শিল্পই আসলে ধ্যানের প্রকাশ এবং ভাস্কর্য তার কোন ব্যতিক্রম নয়।

সুতরাং শিল্পীর মহত্ত্ব যেহেতু দুই দিক দিয়ে প্রকাশ পায়—এক ধ্যানের মহত্ত্বে, দুই রূপ-রচনার বা অঙ্গদানের মহত্ত্বে; ভাস্করের মহত্ত্ব-বিচারেও ধ্যান এবং 'আঙ্গিক' (অঙ্গদান কর্মের)—উভয়ই বিচার্য। ধ্যান সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং রূপের অশরীরী মূর্তি এবং সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় বলে, অনেক সময়েই শিল্পীর মহত্ত্ব বিচারে ধ্যানের চেয়ে আঙ্গিক বেশী গুরুত্ব পায় এবং সৃষ্টি কায বলতে—অঙ্গদান কর্মই বুঝায়। এই প্রবৃত্তি খুবই স্বাভাবিক; কারণ—ব্যক্তিকে শিল্পী বলে মানি আমরা তখনই যখন ব্যক্তি বিশেষ কোন উপাদান ব্যবহার করে বিশেষ কিছু নির্মাণ করতে চেষ্টা করে—ব্যক্তি নির্মাতা হয়—দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা হয়। যেহেতু নির্মাণ ব্যাপারমাত্রই অঙ্গদানকর্ম বা আঙ্গিক ব্যাপার, সেইহেতু আঙ্গিক-সাধনার সিদ্ধিতেই নির্মাণকাযের সিদ্ধি। আঙ্গিক সাধনার দিক থেকে ভাস্করের নৈপুণ্যকে দেখতে গেলে দেখা যাবে—ভাস্করের শক্তি ভাবানুসারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাসের যাথার্থ্য ও সঙ্গতির মধ্যে, বিশেষতঃ স্ফুটনা, বর্তনা, রেখাকল্পনা, মার্জনা, বর্ণলেপ প্রভৃতি প্রয়োগের মধ্যে নিহিত। শিল্পীর সিদ্ধিকে নিরপেক্ষ সৌন্দর্য-বাদীরা এইভাবেই দেখে থাকেন। তাঁরা নিছক আঙ্গিক সাধনার সিদ্ধিকেই শৈল্পিক সিদ্ধি বলে মনে করেন—অতি-আধুনিক শিল্পীদের বিশেষ সম্প্রদায় ভাস্কর্যের প্রচলিত সংজ্ঞা—"Sculpture as an art is that branch of the free fine arts which chisels or carves out of stone or other solid material or models in clay or other plastic substance for subsequent reproduction by carving or casting, imitation of natural objects in their true proportion of length,

breadth and thickness or of length and breadth only."
—স্বীকার করেন না; তাঁরা মনে করেন শিল্পীর উদ্দেশ্য অপূর্ববস্তু-নির্মাণ করা এবং সেই রূপ আশ্রয় করে আঙ্গিকের প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখানো—"essentially to create something new" * তথা নিরপেক্ষ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। এই প্রসঙ্গেই আর একবার বলে রাখা যাক—সৌন্দর্যের সাপেক্ষতায়-বিশ্বাসী এবং নিরপেক্ষতায়-বিশ্বাসী—এই দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব প্রত্যেক শিল্পের ক্ষেত্রেই আছে।

চিত্র (Painting)

চিত্র শিল্প হিসাবে যেমন প্রাচীন, চিত্রশিল্পের স্বরূপ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে প্রচুর। সুতরাং শুধু চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেই আমি ক্ষান্ত হব। চিত্রশিল্পের প্রাচীনতা খুঁজতে বেরিয়ে আমরা সুদূর অতীতের অরিগনেকিয়ান যুগে (Aurignacian period) যেয়ে উপস্থিত হই † এবং দেখি, খৃঃ পূঃ পঁচিশ হাজার বছর আগেও মানুষ গুহাগাত্রে নানা জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কন করেছে। স্পেনের স্যাটাণ্ডে প্রদেশের আলতামিরা গুহার মধ্যে এই সব চিত্রের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের মধ্যে এই যে লক্ষণীয় চিত্রাঙ্কনপ্রবৃত্তি—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে বা স্মৃতিকে রেখা-রঙের মাধ্যমে দশের দর্শনীয় করে তোলার চেষ্টা—এ কোন অহেতুক ঘটনা নয়; উন্নত চেতনার দায়েই মানুষ নিজের অভিজ্ঞতাকে দশের

* Brancusi র "Bird in flight" স্মরণীয়।

† প্রত্ন প্রস্তরযুগকে ৬ পর্বে ভাগ করা হয়েছে—যেস্থানে নিদর্শন পাওয়া গেছে তার নামের ভিত্তিতে। (১) চিলীয়ান (১০০,০০০ বৎসর আগে) (২) এ্কিউলীয়ান (৭৫,০০০ খৃঃ পূঃ) (৩) মৌস্তেরিয়ান (৫০,০০০ খৃঃ পূঃ) (৪) অরিগনেকিয়ান—(২৫,০০০ খৃঃ পূঃ) (৫) সোলুত্রিয়ান (৬) ম্যাগডেলেনিয়ান।

কাছে প্রকাশ করতে চেয়েছে—আজও প্রকাশ করে চলেছে। সমস্ত শিল্পই মানুষের আত্মপ্রকাশের অদম্য আবেগকে বহন করছে।

আমরা দেখেছি, 'স্থাপত্যে স্থূল বস্তু উপাদানের সাহায্যে মানুষ গৃহ-নির্মাণের বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছে এবং ভাস্কর্যে ঐ জাতীয় স্থূল উপাদানের সাহায্যে নানা মূর্তি গঠন করেছে। চিত্রে মানুষ মুখ্যতঃ মূর্তি সৌন্দর্যই সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে বটে, কিন্তু উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছে—পট, রেখা ও বর্ণকে। রেখা ও বর্ণের সাহায্যে মূর্তি অংকন করতে গেলে রেখাপাত ও বর্ণলেপন করবার জন্য একটি আধার আবশ্যক। এই আধারকেই আমরা পট বা পশ্চাৎপট বলে অভিহিত করছি। এই পশ্চাৎপট পর্বতগাত্র, প্রাসাদ-গাত্র, মন্দির-গাত্র, বস্ত্রপট বা পত্রপট যা'ই হোক না কেন চিত্রকর্মের জন্য কোন না কোন পশ্চাৎপট চাইই চাই। আকাশের গায়ে যেমন রেখাপাত করা যায় না তেমনি বর্ণলেপও দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এই ধরণের কোন পটভূমি কোন কোন ক্ষেত্রে ভাস্কর্যেও থাকে। দৃষ্টান্ত—প্রাসাদগাত্রে বা মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন বা উৎকীর্ণ মূর্তিরাজির পটভূমি। কিন্তু প্রাসাদগাত্রে, পর্বতগাত্রে বা মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন বা উৎকীর্ণ মূর্তি আর ঐ ঐ পটভূমিতে অংকিত চিত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান এবং সেই পার্থক্য মূর্তির মান বা "ডাইমেনশান"-গত পার্থক্য। ভাস্কর্য ত্রৈমানিক, চিত্র দ্বৈমানিক। এই দ্বৈমানিকতা এসেছে উপাদানের প্রকৃতি থেকেই। রেখার ও বর্ণের "বেধ" নেই ব'লে রেখার ও বর্ণের দ্বারা ত্রিমান বিশিষ্ট মূর্তি নির্মাণ করা যায় না। এ কথা ঠিক বটে যে চিত্রশিল্পী বর্ণ বিন্যাসের কৌশলে চিত্রে ত্রি-মানের মায়া সৃষ্টি করতে পারেন, কিন্তু তা মায়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ বর্ণ ও রেখা বস্তুতঃ দ্বিমানবিশিষ্ট।

উপাদানের প্রকৃতিগত এই বিশিষ্টতা চিত্রকে একদিকে যেমন দ্বৈমানিক সীমায় আবদ্ধ করেছে, তেমনি রেখা ও বর্ণের প্রকাশসামর্থ্য অন্যদিকে চিত্রকে অনেকখানি মুক্তি দিয়েছে—উপস্থাপ্য বিষয়ের পরিধিকে অনেকখানি সম্প্রসারিত করেছে। দৃষ্টিগ্রাহ্য সমস্ত বস্তুকেই

এবং যথাসম্ভব স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রে উপস্থাপিত করা সম্ভব।* দৃষ্টির সম্ভাব্য পরিমণ্ডলের মধ্যে যতখানি দৃশ্যকে অর্থাৎ যত রকম বস্তু এবং যত রকম দৈশিক সম্পর্কে বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত এবং অন্বিত করা সম্ভব, চিত্র ততখানি দৃশ্যকে রেখায় ও বর্ণে আত্মসাৎ তথা উপস্থাপিত করতে পারে। অর্থাৎ চিত্র শুধু ব্যক্তিরূপকেই চিত্রিত করে না ব্যক্তির পরিস্থিতি বা পরিপ্রেক্ষিতকেও (perspective) গোচরীভূত করতে পারে এবং পারে ততখানিই যতখানি সে নিজের আযতনের মধ্যে, স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে, আত্মসাৎ করতে পারে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের অংকনে অথবা প্রাকৃতিক পটভূমিতে স্থাপিত ব্যক্তিরূপের অংকনে চিত্রশিল্পী পরিপ্রেক্ষিত অংকনের নৈপুণ্য দেখিয়ে থাকেন। এই নৈপুণ্য রেখার ও বর্ণের সমাবেশের কৌশলে বহুবিস্তৃত দেশকে দেশান্তর্গত বস্তুনিচয়কে চিত্রের স্বল্পায়তন ক্ষেত্রের মধ্যে উদভাসিত করে তোলার ক্ষমতা। চিত্রশিল্পী ভাস্করকে এ ব্যাপারে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছেন। কিন্তু ভাস্করের ও চিত্রশিল্পীর শক্তি এক বিষয়ে সমান সীমাবদ্ধ। দেশকাল-পরম্পরার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যায় যে জীবন, পরিবর্তনশীল যে জীবন সেই জীবনধারাকে তাঁরা উপস্থাপিত করতে পারে না। দেশকালের বিশেষ কোন বিন্দুতে ব্যক্ত যে ক্ষণিক রূপ—সে স্থিতিশীল ব্যক্তির রূপই হোক অথবা গতিশীল ব্যক্তির রূপই হোক—সেই এক নিমেষের রূপকেই তারা ধারণ বা স্থায়িত্ব দান করতে পারে। মনে রাখা দরকার—গতির এক বিশেষ মুহূর্তের রূপ আর গতিধারার রূপ বহুকাল বিন্দুর ভিতর দিয়ে পরিবর্তমান কিছুর রূপ এক কথা নয়। মুহূর্তের রূপে গতির যত ব্যঞ্জনাই ফুটুক তা' ঐ তৃতীয় মানের মায়ার মতো গতির মায়া মাত্র।

* All possible visual impressions which can be controlled so as to become relatively permanent to a given context of sensation are potential material of visual art—Theory of Beauty—An Introduction to Aesthetics by H. Osborne Page 110.

সমুদ্রের তরঙ্গ বিক্ষোভের বা নদীর স্রোতের রূপ, চলন্ত গাড়ীর বা উড়ন্ত পাখীর, শ্রেণীবদ্ধ বলাকার যে রূপই চিত্রে অংকিত হোক তা' একটি-মুহূর্তে-প্রতিভাত গতির এক বিশেষ ক্ষণের অভিজ্ঞতা। তা' গতির স্থানিক বিস্তার যথাসম্ভব অর্থাৎ যথাপরিসর উপস্থাপিত করতে পারে বটে কিন্তু গতির কালিক ব্যাপ্তিকে একটি ক্ষণের বাইরে নিয়ে যেতে পারে না'। মোট কথা চিত্রে বা ভাস্কর্যে যে মূর্তি অংকিত বা গঠিত হয় তা' একটি বিশেষ মুহূর্তেরই রূপ। খ্রীস্টের শেষ নৈশ-ভোজের চিত্রই আঁকা হোক আর নাগপাশ বেষ্টিত লাওকুনের জীবন-মরণ সংগ্রামের প্রস্তরময় বা ধাতুময় রূপই গঠন করা হোক—সবই একটি বিশেষ মুহূর্তের রূপ—সবই অভিশপ্ত অহল্যা—বিশেষ নিমেষের স্থিতিতে রূপান্তরিত—স্তম্ভিত এক বিশেষ মুহূর্ত।

তবে শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা যথাস্থিতবাদী (রিয়েলিস্ট) তাঁরা শিল্পী Gustav Courbet-এর মতোই বলবেন—"Painting is essentially a concrete art and consists only of the representation of things real and existing."—বাস্তব বস্তুর রূপ আঁকাই শিল্পীর আসল কাজ। যাঁরা অতিবাস্তব হতে যেয়ে বস্তুর অস্তিত্বকে বা স্থিতিকে পরিবর্তনশীল কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি বলে মনে করেছেন—সেই "ইম্প্রেশানিস্ট" Manet এবং Pissaro, Seurat, Signac প্রমুখ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরা বলবেন—শিল্পীর আসল কাজ—দ্রষ্টা ও দৃষ্টবস্তুর সন্নিকর্ষ ঘটার ফলে দ্রষ্টার মধ্যে যে প্রত্যয়পরম্পরা জাগে, সেই "sense impression itself"-কেই রূপ দেওয়া অর্থাৎ পরিবর্তমান বর্ণাভার সাহায্যে কতকগুলি গতিভঙ্গিমাময় আকৃতি তৈরি করা—"the specific pattern of coloured surface-shapes which is given fleetingly and never recurs the same"—আঁকবার চেষ্টা করা। অবশ্যই এ এক দুঃসাধ্য সাধনা—চিত্রিত বস্তুর কাল-গতির সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে দেওয়ার সংকল্প—পরিবর্তমান প্রতীতিকে স্থায়ী করবার চেষ্টা। এঁরা শিল্পের বিষয়বস্তুর আসন থেকে তথাকথিত বস্তুরূপকে সরিয়ে, শিল্পিমনের পরিবর্তনশীল

প্রত্যয়কে (impressions) বসিয়েছেন—এবং শিল্পকে সম্পূর্ণ ব্যক্তিমনের খেয়ালে পরিণত করেছেন। এই প্রবৃত্তিরই উৎকট পরিণতি—চিত্র-শিল্পকে কোন বিশেষ বস্তুর প্রকাশ বলে না মনে করে "a plane surface covered by colours arranged in a certain order" (Maurice Denis 1890)—"বিশিষ্ট-ধাঁচে-বিন্যাস-করা বর্ণরাজির দ্বারা রঞ্জিত একটি সমতল ক্ষেত্র" মনে করা। এ যেন মানুষকে মানুষ না বলে বিশেষ-ধাচে গড়া হাড়-মাংসের আকৃতি বলা। সত্য বটে যে বস্তুকে বস্তু না বলে বিশেষাকৃতিতে সাজানো উপাদান বললে মিথ্যা বলা হয় না অথবা বস্তু-গঠনের কৌশলকে বাইরের দিক থেকে দেখলে, উপাদান বিন্যাসের কৌশল বলেই মনে হয়, কিন্তু এ কথাও তো মিথ্যা নয় যে উপাদান কোন লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় মাত্র। উগ্র অতিআধুনিক 'কিউবিস্ট'-সম্প্রদায় বলবেন—নিশ্চয়ই লক্ষ্য আছে এবং সেই লক্ষ্য হচ্ছে উপাদানেরই রমণীয় বিন্যাস। চিত্র-শিল্পী বর্ণের * তিন শক্তি বা ধর্ম ব্যবহার করে আসলে যা' তৈরি করেন সে হচ্ছে কতকগুলি ছোট ছোট ভিন্ন ভিন্ন আকারের বর্ণক্ষেত্রের সমবায়ে গঠিত সুষমাময় তথা সুদৃশ্য বড় একটি বর্ণ-ক্ষেত্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে দেখা যাবে—লিওনার্দো দা ভিঞ্চির 'ম্যাডোনা' বা 'শেষ নৈশভোজ' র‍্যাফেলের—"লা ভেলাতা", মাইকেল এঞ্জেলো'র "ডেভিড", তিতিয়ানের—"প্রেম ও কাম" শাদা-কালো বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ মাত্র। এই সব চিত্রের সৌন্দর্য ভাবের অভিব্যক্তিতে নিহিত নেই, সৌন্দর্য নিহিত রেখারও বর্ণের সুষমাময় বিন্যাসে। 'যেমন মন তেমনি ধন'—এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

* "Hue" "Brilliance" এবং "Saturation." (i) Hue—position on the colour circle (ii) Brilliance—gradation upon a black white scale (iii) Saturation—degree of intensity of a given **hue within a coloured area as compared with a neutral grey.**

সংগীত (Music)

"Epic poetry and Tragedy, Comedy also and Dithyrambic poetry, and the *music* of the flute and of the lyre in most of their forms are all in their general conception modes of imitation—Poetics : Aristotle.

সংগীতও অনুকরণ—কিন্তু কার অনুকরণ ?—কী সেই অনুকার্য ? আর উপাদানই বা কি ? সংগীতের উপাদান 'শব্দ' (Sound, Voice) এবং সেই হিসাবে গীতকার মাত্রেই স্বর বা শব্দ শিল্পী—শাস্ত্রীয় ভাষায়, শব্দমূর্তিধর বিষ্ণুর অংশ। প্রত্যেক কাব্যকার এবং গীতকার শ্রুতিবিষয়গুণা যা স্থিতা ব্যাপ্য বিশ্বম—সেই সৃষ্টির—শব্দ মূর্তির উপাসক। আমাদের শাস্ত্র অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে আমরা বলতে পারি—গীতকার শব্দ-ব্রহ্মের অভিব্যক্তিকেই, ছন্দো-লয়-ধ্বনি—সুষমার বিচিত্র প্রকাশকেই—ব্যক্ত করতে চান। তাঁর অনুকার্য বিষয়—বিশ্বলীলার অন্তরে অন্তরে বিলসিত যে মহা ছন্দ—সেই ছন্দের, সেই সুষমার বিচিত্র রূপগুলি। ঐ মহাছন্দই প্রাকৃতিক বস্তুর গতি ভঙ্গিমায় এবং জীবজগতের দৈহিক ও মানসিক গতিছন্দের অর্থাৎ ভাবের বিচিত্র লয়ের মধ্যে বিরাজ করছে। সংগীত শিল্পীর অনুকার্য বিষয়—ঐ বিচিত্র তাল-লয়ের গতিচ্ছন্দকে শব্দ-সংকেতে প্রকাশিত করা। কিন্তু ঐ গতিচ্ছন্দ জীবের মধ্যে ভাবাবেগের গতি-বিভঙ্গের রূপে প্রকাশিত বলে এবং প্রাকৃতিক বস্তুর গতিচ্ছন্দ মানুষের মনে এসে ভাবাবেগে রূপান্তরিত হয় বলে—গীতকারের উপস্থাপ্য বিষয়কে, আপাততঃ আমরা ভাবাবেগ বলতে পারি।

আপাততঃ বললাম এই কারণে যে, অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদীরা সংগীতকে ভাবাবেগের প্রকাশ "natural language of emotions" "general forms of feeling" "morphology of feelings" বলে মনে করেন না। সংগীত এঁদের চোখে 'an architecture of sound'—'structures of sound which exist only to be heard with no content of representation or associated emotion to

distract from the perception of the structure and the aesthetic emotion provoked by its form'—(ওসবোর্ন রচিত "ঈস্থেটিক এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজম" গ্রন্থের ২২৩' পৃঃ)। এঁরা বলতে চান—শিল্প কোন ধরাবাঁধা বস্তুর রূপ বা তদানুষঙ্গিক কোন ভাবের অর্থাৎ ভাবাবেগের প্রকাশ নয়, শিল্প হচ্ছে আমাদের রূপ-কল্পনা-বৃত্তিরই—অপূর্ববস্তুনির্মাণ প্রবৃত্তিরই বিচিত্র অভিব্যক্তি। অতএব সংগীতও আসলে "শব্দের ইমারৎ"—বিচিত্র ধাঁচে শব্দের (যন্ত্রের বা কণ্ঠের স্বর) বিন্যাস, যার একমাত্র উদ্দেশ্য শব্দ-বিন্যাসের অপূর্বতা দেখানো এবং সেই অপূর্ব রূপাদর্শ (প্যাটার্ণ) দিয়ে শ্রুতি-সুখ দান করা। সুতরাং মূল প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে—সংগীতকে আমরা আবেগের শব্দ-মূর্তি' বলব, না 'শব্দের অপূর্ববস্তু' বলব ? অথবা ধ্বনি অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি বলব ? ঘুরে ফিরে সেই মূল প্রশ্নে—সেই সমস্যার সম্মুখে। এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না—অন্ততঃ যাঁরা প্রাচীন শিল্পের উৎপত্তি ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই সব বৈজ্ঞানিক-গবেষকরা অস্বীকার করেন না—আদিম সমাজের নৃত্যগীতে ও কবিতায় মানুষের গোষ্ঠীগত আবেগই ব্যক্ত হয়েছে এবং ঐ আদিম নৃত্য-গীত-কবিতা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যযোগে যুক্ত অর্থাৎ নৃত্য-গীত-কবিতা ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিস্ট।

আমাদের ভারতীয় রাগ-রাগিণীর স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে যে প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী বাহ্যতঃ বিশিস্ট ধাঁচের স্বর-গ্রাম বটে, কিন্তু ধাঁচটির ভিত্তি—বিশেষ কোন ভাবাবেগেরই গতি-ভঙ্গিমা। 'সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি' এই সাতটি স্বর নানা ঠাটে সজ্জিত হয়ে রাগ-রাগিণীর পৃথক পৃথক ব্যক্তি সত্তা সৃষ্টি করেছে, এ কথা যেমন এক হিসাবে সত্য, তেমনি এ কথাও মিথ্যা নয় যে ঐ স্বরগুলিকে বিভিন্ন ঠাটে এবং ধাঁচে সাজানো হয় শুধু সাজানোর সখ মেটাবার জন্যই নয়—বিশেষ একটি ভাবের ধ্যানকেই রূপ দেওয়ার জন্য—বিশেষ একটি ভাবাবেগের গতিস্পন্দকে মূর্ত করবার জন্য। এই হিসাবে প্রত্যেকটি রাগ-রাগিণী বা গীতের স্বরগ্রাম মূলতঃ আবেগেরই বিশিষ্ট

রূপাদর্শ (প্যাটার্ণ)—বাইরে ধ্বনি-রূপ ভিতরে ভাবের রূপ এবং গীত-কারের কৃতিত্ব বাইরের দিক থেকে দেখলে, তান-বিস্তার করার দক্ষতা বটে, কিন্তু তলিয়ে দেখলে—ভাবের ধ্যানটিকে শুদ্ধভাবে ব্যক্ত করা। গানের মহত্ত্ব যেমন ভাবের অনুকূল স্বর-বিকল্পনায়, তেমনি গায়কের মহত্ত্ব ভাবের ধ্যানটিকে তথা স্বর গ্রামকে ভাবশুদ্ধি সহকারে ব্যক্ত করায়। যেমন ভারতীয় মার্গ-সংগীতের তানকর্তব দেখে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক—যে সংগীতের আত্মা তান বিস্তারের অপূর্ব স্বরগ্রাম কল্পনা করার মধ্যে নিহিত, তেমনি আধুনিক ইয়োরোপীয় সংগীতের 'complicated structure within an extremely artificial convention" দেখেও মনে হতে পারে—প্রাকৃতিক বস্তুর গতিস্পন্দের বা ভাবস্পন্দের সঙ্গে তার কোন যোগ নেই—তা নিছক শ্রুতিসুখদায়ক তাল-লয় সমন্বিত শব্দসমাবেশ।

সংগীত শব্দময়ী সৃষ্টি বলে, শব্দের পক্ষে স্বশরীরে অর্থাৎ শব্দ-ব্যঞ্জনায় যত কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব তত কিছুই সে সৃষ্টি করতে পারে। সে রূপকে ব্যক্ত করতে পারে না, পারে শুধু শব্দের ধ্বনি-সংকেতে রূপের বিশিষ্ট গতিস্পন্দের ব্যঞ্জনা আনতে (emotional suggestiveness of a characteristic rhythm—আনতে) তথা—গতিস্পন্দনের আশ্রয় যে রূপটি সেই রূপটির আভাস ফুটিয়ে তুলতে। ইয়োরোপীয় "প্রোগ্রাম মিউজিক" এবং "রিপ্রেজেণ্টেশানাল মিউজিক" শ্রেণীর গানগুলি এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। এই সব সংগীতে, শব্দ সংকেতের সাহায্যে বস্তুরূপ ধ্বনিত করার প্রশংসনীয় চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। যেমনটি দেখা যায় আমাদের পালকী চলার গানে, সারিগান প্রভৃতি শব্দধ্বনিপ্রধান গানে। সে যাই হোক, সংগীত রূপানুকরী নয় এবং প্রয়োজনমূলক সৃষ্টি নয় এই যুক্তিতেই সংগীতকে বিশুদ্ধতম শিল্প বলা হয়ে থাকে। যুক্তিটি কতখানি সত্য তা অবশ্য বিচার্য। সংগীতকে যাঁরা 'ভাবের রূপ' অনুকারী বলবেন এবং ভাবের উপযোগ-মূল্য মেনে নিয়ে সংগীতের আবেগজনকত্ব তথা অনুপ্রেরকত্ব স্বীকার করবেন, তাঁরা অবশ্যই ঐ যুক্তিতে শুদ্ধত্বাশুদ্ধত্ব বিচার করতে

যাবেন না। তারপর "বিশুদ্ধ রূপের সৌন্দর্য" বস্তুটিও মায়ামৃগ। কেউই আজ পর্যন্ত তার নাগাল পায় নি। যেহেতু সংগীতের উপাদান 'শব্দ' এবং শব্দ-তরঙ্গ অন্যান্য শিল্পের উপাদান অপেক্ষা অধিকমাত্রায় গাণিতিক বিশ্লেষণের অধীন, সেই হেতু সংগীত সবচেয়ে—"formal" বটে, কিন্তু কোন গবেষণাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের সার্বজনীন রূপের সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি।

পারেনি ব পারা সম্ভব হয়নি বলেই—সংগীত শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে কম সার্বজনীন—"least universal of all the arts"। ইয়োরোপীয় ও অন্যান্য দেশের সংগীত আমাদের ওস্তাদদের কাছে যেমন "কাঁই মাই' * ছাড়া আর কিছুই নয়, তেমনি বিদেশীদের কাছেও আমাদের ওস্তাদদের 'তান-বিস্তার' বিশেষ করে দ্রুত লয়ের কাজগুলি হাস্যজনক ব অসহ্য চীৎকার (intolerable or wearisome noise) বা দাঁত মুখ খিঁচুনির নামান্তর। কোথায় সৌন্দর্যের সাবজনীন আদর্শ? একের ভাষা যেমন অন্যের কাছে অবোধ্য, একের 'সাংগীতিক ভাষা' (মিউজিকাল ইডিয়াম) অন্যের 'সাংগীতিক ভাষা' থেকে পৃথক। বাদ্যযন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, গোষ্ঠীগতভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে আবেগ প্রকাশের রীতি—প্রকাশের প্রথা, অভ্যাস ইত্যাদি অনেক কিছু মিলে রাগ-রাগিণীর বা সংগীতের সংস্কার তৈরি হয়। গীত সৌন্দর্যবোধ বিশেষভাবেই সংস্কারসাপেক্ষ ব্যাপার; অর্থাৎ তার যতটা জাতীয় রূপ আছে ততটা সাবজনীন রূপ নেই। "বিশুদ্ধ সৌন্দয" নিয়ে শিল্পতত্ত্বে সমস্যার অন্ত নেই। এ ক্ষেত্রেও সেই সমস্যা পিছু ধাওয়া করেছে।

সে যাই হোক আমাদের কাজে তাতে বাধা পড়ছে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংগীতের বিশেষ এবং তুলনামূলক আলোচনা করার অথবা সংগীত-বিষয়ক "পরিভাষা"র ব্যাখ্যা দেওয়ার কোন অবকাশ এবং প্রয়োজন এখানে নেই। শিল্পে সংগীতের স্থান কি সেইটুকু যদি বুঝাতে পেরে থাকি তাহলেই আমি কৃতার্থ।

* পাটনার 'পিণ্ট' হোটেলে বসে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ ইয়োরোপীয় সংগীত সম্বন্ধে এই শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

নৃত্য ও নৃত্ত

In dancing, rhythm alone is used without 'harmony'; for even dancing imitates character, emotion and action by rhythmical movement.—Aristotle's Poetics.

নৃত্য—দেহের ছন্দে "ক্রিয়া, আবেগ ও চরিত্রের" অনুকরণ। তবে নাটক যে অর্থে এ সকলের অনুকরণ সেই অর্থে নয়। কারণ নৃত্য ভাবাশ্রয় এবং নাটক রসাশ্রয়। 'দশরূপক'-গ্রন্থে পার্থক্যবিচার প্রসঙ্গে যে কথাটি লেখা আছে তা উল্লেখযোগ্য—লেখা আছে "নাটকাদি চ রসবিষয়ম্, রসস্য চ পদার্থীভূত বিভাবাদিক সংসর্গাত্মক বাক্যার্থহেতুকত্ববাদ বাক্যার্থাভিনয়াত্মকত্বং রসাশ্রয়মিত্যনেন দর্শিতম্" —নৃত্য গাত্রবিক্ষেপাত্মক, তাতে আঙ্গিকবাহুল্য থাকে বলে লোকের চোখে 'প্রেক্ষণীয়' দৃশ্য বলেই প্রতিভাত হয়ে থাকে। কিন্তু এই দৃশ্যধর্মিতায় সাধর্ম্য থাকলেও, নাটক নৃত্য থেকে দুইটি কারণে পৃথক; এক—নাটক লোকবৃত্তের অনুকরণ অর্থাৎ 'পদার্থীভূত বিভাবাদি-সংসর্গাত্মক' এবং দুই—নাটক দৃশ্যকাব্য—অর্থাৎ বাক্যার্থহেতুক এবং অভিনয়াত্মক। সুতরাং নৃত্য যেমন পদার্থীভূত বিভাবাদিসংসর্গাত্মক নয়, তেমনি বাক্যার্থহেতুকও নয়। নৃত্যের উপস্থাপ্য (দেহছন্দে অর্থাৎ গাত্রবিক্ষেপের মাধ্যমে) 'ভাব'। "ভাবাশ্রয়ং নৃত্যম্"। অবশ্য গাত্রবিক্ষেপে যা কিছু প্রকাশিত হলেই তাকে 'নৃত্য' বলা যায় না। এখানেই নৃত্যের সঙ্গে নৃত্তের পার্থক্য।

নৃত্য "ভাবাশ্রয়ম্"; নৃত্ত 'তাললয়াশ্রয়ম্'। উভয়ই 'গাত্রবিক্ষেপার্থত্বে সমান' বটে, কিন্তু নৃত্যের উদ্দেশ্য যেখানে গাত্রবিক্ষেপের ভিতর দিয়ে ভাবকে অনুকরণ করা সেখানে নৃত্তের উদ্দেশ্য অঙ্গবিক্ষেপের মাধ্যমে তাললয়ের বিচিত্র রূপকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা। নৃত্ত হচ্ছে তাললয়মাত্রাপেক্ষ অথচ অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপ। নৃত্যের এবং নৃত্তের লক্ষণ নির্দেশ করতে যেয়ে দশরূপককার ধনঞ্জয় শিল্পের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রটির উপরে নতুনভাবে আলোকপাত

করেছেন। যখন বলেন—গাত্রবিক্ষেপের সাহায্যে মানুষ যখন ভাবকে বা বিশেষ পদার্থকে মূর্ত করে তখন সে "নৃত্য" করে, আর গাত্রবিক্ষেপে সে যখন তাললয়ের রূপকে (forms of rhythm) ব্যক্ত করে তখন 'নৃত্ত' করে, তখন এই কথাই বুঝাতে চান যে শিল্পিত্ব শুধু বিষয়কে উপস্থাপিত করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়— যে রীতিতে বিষয়ের উপস্থাপনা হয়, উপাদানের সাহায্যে সেই রীতির আদর্শ রূপটিকে ব্যক্ত করার মধ্যেও পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ শিল্পীর উদ্দেশ্য শুধু বিষয় নয়—রীতিও। প্রথমক্ষেত্রে উপস্থাপ্য 'পদার্থ' (আদ্যং পদার্থাভিনয়ো···), দ্বিতীয়ক্ষেত্রে উপস্থাপ্য— আঙ্গিক-কৌশলের—'বৃত্তির' স্বাধীন অনুশীলনের নৈপুণ্য। এই কথাই স্বীকার করতে হয়—যে পদার্থের প্রকাশ আশ্রয় করেই রীতির উদ্ভব ঘটে বটে, কিন্তু উদ্ভবের পরে রীতি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তা করে বলেই অন্যতম উপস্থাপ্য বা প্রকাশ্য বিষয়ে পরিণত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভাবকে ব্যক্ত করতেই তাললয়ের উদ্ভব, সুতরাং ভাবের প্রকাশ ব্যাপারে তাল-লয় উপায়-বিশেষ অর্থাৎ উপলক্ষ্য। কিন্তু সেই উপলক্ষ্য স্বকীয় মহিমার দাবাতে অনেক সময় লক্ষ্যের আসনে বসে থাকে এবং তখন শিল্প নিছক রীতির আরাধনায় প্রমত্ত হয়ে উঠে এবং সেক্ষেত্রে শিল্পীর দক্ষতা ফুটে উঠে উপাদানের বা মাধ্যমের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের রূপ নিয়ে—আঙ্গিকের বা রীতির পরাকাষ্ঠা রূপ বা আদর্শ প্রকাশ করতে উপাদানের বিনিয়োগ-কৌশলে। এঁরা বিষয়-প্রকাশের লক্ষ্য থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে রীতির লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন—যোগী হতে যেয়ে হঠযোগী হন। 'স্বরূপে অবস্থান' না করে—'কর্মসু কৌশলম্' দেখাতে মেতে উঠেন—সমাধিতে মগ্ন না হয়ে রেচক-কুম্ভকের শক্তি দেখিয়ে বিস্ময়-কৌতূহল জাগাতে চেষ্টা করেন। সাধনার সবক্ষেত্রেই হঠযোগী আছে। যেমন গায়করা যখন ভাবের অভিব্যক্তির কথা ভুলে 'গলার কাজ' দেখাতে মরিয়া হয়ে উঠেন— তিনগ্রামে স্বরের আরোহ-অবরোহ দক্ষতা দেখাতে এবং তাললয়ের

সঙ্গে গলার চলাকে নিখুঁত করতে লেগে যান তখন নিঃসন্দেহে 'ওস্তাদি' বা 'সুরের পালোয়ানি' প্রকাশ পায়—শিল্পীর শক্তির পরিচয়ও পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁদের গানের যোগী না বলে হঠযোগী বলাই ভাল। তেমনি যে নৃত্যশিল্পী দেহের যন্ত্রে ভাবের সংগীত বাজাতে যেয়ে, ভাবকে উপেক্ষা করেন এবং দেহভঙ্গ, গ্রীবাভঙ্গ, করমুদ্রা, পদসঞ্চালনকে অর্থাৎ গাত্রবিক্ষেপকে তাললয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়ার শক্তি দেখাতে মরিয়া হয়ে উঠেন, তিনি সুদক্ষ নৃত্তশিল্পী হতে পারেন, কিন্তু নৃত্যশিল্পী নন। তবু নৃত্ত শিল্পই বটে, কারণ শিল্পমাত্রেই 'যোগ' বা কর্মকৌশল (এই অর্থেই 'চৌষট্টি কলা' কল্পিত), কিন্তু বস্তুতঃ উপশিল্প—যেহেতু নৃত্যেরই অন্যতম উপকরণ 'তাললয়' তার উপস্থাপ্য বিষয় বা লক্ষ্য। সে যাই হোক আমরা দেখলাম—নৃত্যের উপস্থাপ্য হচ্ছে—'চরিত্র, আবেগ ও ক্রিয়া' এবং মাধ্যম বা উপাদান হচ্ছে—'গাত্র-বিক্ষেপ'।

সাহিত্য

এককথায় বলতে, সাহিত্য ভাষাশিল্প—ভাষার অর্থাৎ শব্দার্থের উপাদান দিয়ে গঠিত রস-রূপ। এই রসরূপ বা রসনীয় শব্দার্থময় রচনা, নিছক শব্দালংকার বা অর্থালংকারেরই বিশেষ রূপ কি না অথবা ভাব-রূপ অর্থের সঙ্গে শব্দের সাহিত্য কি না অথবা বস্তু-ভাব-অলংকারাদি সবরকম প্রকাশ্য বস্তুরই ব্যঞ্জক কি না—এ সব প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হয়ে, আমি পাঠকদের মনে করিয়ে দিতে চাই—শিল্পের সংজ্ঞা যিনি যেমনটি গ্রহণ করেন, তিনি তেমন দৃষ্টি নিয়েই রসরূপের স্বরূপ ব্যাখ্যা করবেন। শিল্পকে যাঁরা প্রকাশশক্তির বা নির্মাণক্ষমতার খেলা বা প্রদর্শন বলে মনে করবেন তাঁরা বলবেন সাহিত্য হচ্ছে শব্দার্থের প্রয়োগকৌশল। এদেরই কারো কাছে সাহিত্যের প্রাণ হবে 'অলংকার', কারো কাছে

'রীতি', কারো কাছে 'বক্রোক্তি', কারো কাছে 'অদোষ ও সগুণ শব্দার্থ'। এঁদের মোটকথা—শব্দার্থ প্রয়োগের কেরামতিতেই সাহিত্যশিল্পীর দক্ষতা প্রকাশ পায়।' আবার যাঁরা বলবেন—শিল্পের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাবাত্মকতা—ভাব ব্যক্ত করাই শিল্পের উদ্দেশ্য, তাঁদের কাছে সাহিত্য হবে "রসাত্মক বাক্য"—ভাবব্যঞ্জক শব্দার্থ। আবার যাঁরা মনে করবেন—শিল্প হচ্ছে যে-কোনরূপ বিশেষেরই (particular) প্রকাশ, তাঁদেরই কাছে সাহিত্য হবে—"রম্যার্থপ্রতিপাদকা শব্দাঃ' বা 'ধ্বনি' (বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি এবং রসধ্বনি ধ্বনির প্রকারভেদ)। মোটকথা, শিল্পতত্ত্ববিদরা যত সম্প্রদায়ে বিভক্ত তত মত পাওয়া যাবে।

মুনিদের ভিন্ন ভিন্ন মত সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে; এখানে শুধু এইটুকু জানলেই হবে যে সাহিত্য হচ্ছে অন্যতম চারুশিল্প এবং তার বৈশেষিক লক্ষণ—ভাষাময়ত্ব। সাহিত্য ভাষাশিল্প—এই সংজ্ঞা দিলেই মোটামুটি কাজ চলতে পারে। একদিকে ভাষাময়ত্ব যেমন অন্যান্য শিল্প থেকে সাহিত্যকে পৃথক করেছে, অন্যদিকে 'শিল্পত্ব' সাহিত্যকে শাস্ত্রাদি রচনা থেকে পৃথক করেছে। ভাষাময় রচনা হলেই যে সাহিত্য হয় না—তার প্রমাণ দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাসাদি তত্ত্ববিষয়ক ও তথ্যপ্রচারক রচনাগুলি। এই সকল রচনায় ভাষাকে চিন্তা ও যুক্তির—এক কথায় মননের ও বিবরণের বাহন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ভাষা কোন বিশেষকে বা অর্থকে ব্যক্ত করে না ব্যক্ত করে "সামান্যকে"—নির্বিশেষকে। ইতিহাসে ভাষা বিবরণের বাহন—ঘটনার বিবরণে বা তথ্য-জ্ঞাপনে নিযুক্ত। একে বলে ভাষার referential use। সাহিত্যে ভাষা "অর্থ" দ্যোতনায় নিযুক্ত—শব্দ অর্থের রূপে বিপরিণত—অর্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাগর্থ সম্পৃক্তি বা শব্দার্থের সাহিত্য বলতে একদিক থেকে যেমন শব্দ দ্বারা অর্থকে সংকেতিত করা বুঝায়, অন্যদিকে থেকে দেখলে—অর্থের শব্দমূর্তি নির্মাণ করা—শব্দকে অর্থে রূপান্তরিত করা বুঝায়।

এক কথায় সাহিত্যে ভাষা 'expressive', 'emotive' বা 'evocative' প্রকাশক, ভাবোদ্দীপক বা রূপোদ্বোধক। ভাষাশিল্পী—জাঁ পল সাঁর্তের ভাষায় বলা যাক—"Considers words as things and not as signs"। স্থপতি ও ভাস্করের কাছে যেমন পাথর-কাঠ-ধাতু, চিত্রকরের কাছে যেমন রং ও রেখা, গীতিকারের কাছে যেমন সপ্তস্বর, সাহিত্যিকের কাছে তেমনি ভাষা—উপাদানমাত্র।

যদি উপাদান প্রয়োগের সার্থকতা, উপাদেয় বস্তুটির নির্মাণে এবং উৎকর্ষবিধানে তথা রমণীয়তাবর্ধনে উপাদানের বিশেষ দানটুকুর উপরেই নির্ভর করে, তা হলে এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে সাহিত্যের ভাষার সার্থকতা নির্ভর করবে সাহিত্যের যা উপাদেয়—সেই 'বাগর্থ-সম্পৃক্তি'—অর্থের সঙ্গে শব্দের 'সাহিত্য' সৃষ্টির উপরে—শাদা কথায় প্রকাশ্য বিষয়বস্তুর রূপটিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যক্ত করার উপরে।

প্রশ্ন—কী সেই প্রকাশ্য বস্তু? আমরা দেখেছি, প্রকাশ্য বিষয় অনুসারে উপাদান নির্বাচন করতে শিল্পী বাধ্য, আবার প্রকাশের মাধ্যম বা উপাদানের প্রকৃতি প্রকাশ্যের প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। প্রত্যেক উপাদানেরই সামর্থ্য সীমাবদ্ধ। সেই সীমার বাইরে সে যেতে পারে না। স্থপতি, ভাস্কর, চিত্রকর, গীতকার প্রত্যেকেই নিজের উপাদান-সামর্থ্যের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। ভাস্কর এবং চিত্রকর কিভাবে কাল-মান (ফোর্থ ডাইমেনশান) সৃষ্টিতে অক্ষম—কালের এক বিশেষ বিন্দু ছাড়া কালপরম্পরা উপস্থাপিত করতে পারেন না, তা আগেই দেখানো হয়েছে। ভাষাশিল্পীও তাঁর উপাদানের সামর্থ্যের গণ্ডীতে আবদ্ধ। নিঃসন্দেহ, ভাষা এক মহাশক্তিসম্পন্ন উপাদান। মনুষ্যত্বের প্রথম অধিকারস্বরূপ মানুষ যেদিন বাগ্‌ভাষার অধিকার পেয়েছিল সেইদিনই সে পেয়েছিল এক মহাশক্তিকে—'শব্দাহ্বয়ং জ্যোতি'কে—দেশ-কাল-বস্তুর উপরে এক মহাসম্ভাবনাময় অধিকারকে। এই জ্যোতির আলোকেই জগৎ হয়ে উঠেছিল তার কাছে জাতি-দ্রব্য-গুণ-ক্রিয়াময়—হয়েছিল সংকেতময়—নামময়—শব্দময়। এর প্রভাবেই দৃষ্টি হয়েছিল আলোকময়,

বাসনা হয়েছিল কল্পনাময়—বুদ্ধি হয়েছিল তত্ত্বময়। বস্তুময় জগৎ মানুষের কাছে সংকেতরাজিতে পরিণত হল।

অন্তরের অনুভূতির ও মননের জগৎ এবং বাইরের বস্তু ও ব্যক্তিজগৎ কোন-কিছুই অসংকেতিত থাকল না—সবই হল নির্বচনীয়—সংকেতিত। এর প্রভাবেই মানুষ দেশ-কাল-বস্তুকে ইচ্ছামত প্রকাশ করার অপূর্ব একটি শক্তি লাভ করল। লাভ করল—এক দেশ থেকে দেশান্তরে, এক কাল থেকে কালান্তরে, এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করবার অবাধ অধিকার—দেশ-কাল-বস্তুকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার নতুন একটি উপায়। কিন্তু এত ক্ষমতা সত্ত্বেও ভাষা এক বিষয়ে বড় দীন। সে বহু স্থানকে, বহু কালকে এবং বহু বিষয়কে একত্র করতে পারে সত্য, কিন্তু সেই পারা শুধু ঐ বস্তুগুলির 'সংকেত' সমাবেশেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভাষাশিল্পী শব্দপরম্পরা শোনাতে বা লিখিত অক্ষরে দেখাতেই শুধু পারেন—ভাষা দিয়ে ভাস্করের মত কোন বস্তু গডতে পারেন না বা চিত্রকরের মত বস্তুর ছবিও চোখের সামনে তুলে ধরতে পারেন না। ভাষাশিল্পী প্রথমতঃ যা সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে কতকগুলি শ্রব্য বা দৃশ্য (লিখিত) শব্দ সংকেত—এমন সংকেত যার শ্রুত ধ্বনি তৎক্ষণাৎ অর্থকে উদ্‌ভাসিত করে ভাব ও বস্তুরূপ ফুটিয়ে তোলে—যার লিখিত বা পঠিত অক্ষর-পদ-বাক্য-রূপ দেখতে দেখতে মনের চোখে ছবি হয়ে ফুটে উঠে—ভাববন্ধে আলোডন সৃষ্টি করে। ভাষাশিল্প বাহ্যত দেখতে বা শুনতে পংক্তিবদ্ধ কতকগুলি 'সংকেত' বা পদ—কতকগুলি শব্দ এবং অর্থতাৎপর্যে 'রস-রূপ'—রূপের বা 'ভাবের কথা'। এ যেন কতকগুলি শব্দতরঙ্গের অর্থালোকতরঙ্গে—তথা রূপপরম্পরায় ও ভাবতরঙ্গে পরিণত হওয়া। সে যাই হোক, সংকেতস্বরূপ ভাষার এই সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও—ভাষা এক মহাশক্তিসম্পন্ন উপাদান।

তত্ত্বচিন্তায়, যুক্তিবিচারে এবং বিবরণের কাজে বাকশক্তিকে প্রয়োগ করে মানুষ একদিকে সৃষ্টি করে চলেছে দর্শনবিজ্ঞানাদি শাস্ত্রকে ; অন্যদিকে অর্থপ্রকাশনে অর্থাৎ ভাব ও রূপ ব্যক্ত করার

কাজে প্রয়োগ করে, সৃষ্টি করছে সাহিত্যকে। 'অর্থ' বা প্রকাশ্য বস্তু হয়েছে যেখানে আপন অন্তরের ভাবাবেগ—সৃষ্টি হয়েছে সেখানে কত গীতিকবিতা, কত প্রশস্তিকবিতা, কত শোককবিতা, কত আত্মগত অনুভূতির মননাত্মক রূপ। তারপর অর্থ যেখানে বাইরের অভিজ্ঞতা, সেখানে একদিকে সৃষ্টি হয়েছে বর্ণনারীতিক পদ্য বা গদ্য রচনা—কত গাথা, খণ্ডকাব্য মহাকাব্য; কত কথা-আখ্যায়িকা—রোমান্স-উপন্যাস, ছোটগল্প প্রভৃতি রচনা; অন্যদিকে দৃশ্যরীতিক পদ্য-গদ্য রচনা—কত একাঙ্কিকা, কত নাটিকা, কত নাটক। প্রথম দুই শ্রেণীর কবিতাকে বলা হয়েছে—'শ্রব্য', শেষোক্তকে বলা হয়েছে 'দৃশ্য'। এরিস্টটলও সাহিত্য-শিল্পকে রীতির (mode or manner) ভিত্তিতে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—বলেছেন—

> The poet may imitate by narration in which case he can either take another personality as Homer does, or speak in his own person unchanged—or he may present all his characters as living and moving before us.

যাই হোক, গীতিকবিতার মত আত্মগত ভাবের অভিব্যক্তিকে বর্ণনাত্মক রচনা বলতে হলে এই কথাই পরোক্ষে স্বীকার করতে হবে—"literature imitates that which it describes" (ওসবোর্ণ) এই কথাই মানতে হবে—গীতিকবিতায় ভাষা ভাবকে বর্ণনা করতে যেয়ে ভাবের গতিভঙ্গে ও উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়।

বিশুদ্ধ গীতিকবিতার সঙ্গে মননাত্মক আত্মবিষয়ক কবিতার মৌলিক পার্থক্য এখানেই। গীতিকবিতায় সব-কিছু উপাদান মিলে মিশে আবেগের এক সরল উচ্ছ্বাসে ও মূর্ছনায় পরিণত হয়, অন্যক্ষেত্রে তা হয় না। গীতি কবিতায় আবেগ নিজেই যেন কথা বলে উঠে—গীতিকবি যেন শুধু তার মুখপাত্র। আবেগের এই সরল উচ্ছ্বাস বা প্রত্যক্ষতা মননাত্মক আত্মনিষ্ঠ কবিতায় পাওয়া যায় না। সেখানে ভাবাবেগ বিচিত্র রূপকল্পনা ও ভাবনার আবর্তে ঘুরপাক খেয়ে প্রশমিত বেগে ও নিরুচ্ছ্বাস গতিতে আত্মপ্রকাশ করে। গীতাঞ্জলির একটি গান এবং বলাকার সাজাহান, চঞ্চলা, ছবি প্রভৃতি কবিতা

এবং আধুনিক মনন প্রধান কবিতা পাশাপাশি রেখে দেখলেই উভয়ের পার্থক্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। অবশ্য "তুমি কি কেবলই ছবি"-তে সুর যোজনা করা হলেও এবং 'সাজাহান' বা 'চঞ্চলা' বা 'শিবাজী' কবিতাকে জোর করে গানে পরিণত করার চেষ্টা করা গেলেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে ঐ সব কবিতা গান করার জন্য লেখা হয়নি। যার ছন্দকে সহজে সুরযোজনা করা যায় না—যাকে তাললয়ের অধীন করতে সুরের চচ্চড়ি পাকাতে হয়, তাকে গীতি-কবিতা না বলাই বাঞ্ছনীয়। যথার্থ গীতিকবিতা বা গীতধর্মী কবিতা সেইগুলিই যাদের সহজেই বিশেষ সুরের ঠাটে এবং তাল-লয়ের বিশেষ ধাঁচে মিলিয়ে নেওয়া যায়। গীতধর্মী গাথা সাহিত্য (Lyrical Ballads), গীতিকবিতার মতো অতখানি প্রত্যক্ষ আবেগধর্মী না হলেও এই বিশেষ বিশেষ ধর্মের জন্যই গীতিধর্মী আখ্যা পেয়ে থাকে।

এই দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে—বিশুদ্ধ গীতি কবিতার পর্যায়ে আবেগকে প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়া হয়, তারপর বর্ণনায় ক্রমে এই প্রত্যক্ষতার মাত্রা কমতে থাকে—এবং বর্ণনারীতি যত প্রাধান্য পায় তত পরোক্ষতার মাত্রা বাড়তে থাকে। আবার নাটকের পর্যায়ে পরোক্ষতা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় এবং বিশেষ একটি রীতিতে লোকবৃত্তকে প্রত্যক্ষবৎ করার চেষ্টা করা হয়। ভাষার স্বভাব-সংকেতধর্মিতা তথা স্বভাব-বর্ণনাধর্মিতা সুবিদিত। তার অর্থের সঙ্গে একাকার বা তন্ময় হওয়ার সামর্থ্য নেই। অর্থাৎ পাথর বা ধাতু মূর্তির মধ্যে যে ভাবে বিলীন হতে পারে, রং-রেখা যেভাবে চিত্রসাৎ হতে পারে, ভাষা সেইভাবে অর্থের সঙ্গে একাকার হতে পারে না। ভাষা ও সংকেতিত অর্থের মধ্যে 'অবয়ব-অবয়বী' সম্বন্ধ থাকে না। থাকে না বলেই অর্থ পরোক্ষ। গীতিকাব্যে এবং দৃশ্যকাব্যে এই পরোক্ষতার ব্যবধান দূরীভূত করবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। গীতিকাব্যে আত্মগত ভাবাবেগকে এবং দৃশ্যকাব্যে—লোকবৃত্তের অভিজ্ঞতাকে যথাসাধ্য প্রত্যক্ষীভূত করবার চেষ্টা করা

হয়। ভাবাবেগকে ভাষায় প্রত্যক্ষীভূত করতে গেলেই ভাষাকে ভাবাবেগের স্পন্দন ও উচ্ছ্বাসের বাহনে পরিণত করতে হয় এবং লোকবৃত্তকে প্রত্যক্ষীভূত করতে গেলে—লোকের সম্পর্ক ও আচরণকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আকারে উপস্থাপিত করতে 'হয়। 'প্রত্যক্ষবৎ'-করণ ব্যাপারটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার স্বরূপ এবং নাট্যকাব্যের স্বরূপ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে গেলে, ভাবকে প্রত্যক্ষবৎ করা এবং ঘটনাকে প্রত্যক্ষবৎ করা বলতে ঠিক কি বুঝায় তা' অবশ্যই জানতে হবে। কারণ ভাবাবেগের প্রকাশ যত প্রত্যক্ষবৎ হয় ততই তাতে গীতিধর্মিতা ব্যক্ত হয় এবং ঘটনার উপস্থাপনা যত প্রত্যক্ষবৎ হয়ে উঠে ততই তা' দৃশ্যধর্মী হয়। বর্ণনাধর্মী উপন্যাসের সঙ্গে দৃশ্যধর্মী নাটকের পার্থক্য এখানেই—উপন্যাসে ঘটনার পরোক্ষ উপস্থাপনা, নাটকে প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা। এই কারণেই যত প্রত্যক্ষতা তত নাটকের নাটকীয়তা। আদর্শ গীতিকবিতা যেমন বিশেষ একটি ভাবাবেগেরই ভাষাময় পরিস্ফুরণ, আদর্শ নাটক তেমনি—লোকবৃত্তের বা ঘটনার সমুচিত ও যথার্থ উপস্থাপনা—স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্র। আশা করি গীতধর্মী, বর্ণনাধর্মী এবং দৃশ্যধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করা হল তাতে তাদের বৈশেষিক লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সুতরাং এখানেই সাহিত্য-পরিচয়ের উপসংহার করা যাক।

সমালোচনা

সমালোচনা মুখ্যতঃ শিল্পকর্মের মূল্যের বিচার—এ সিদ্ধান্ত পর্যন্ত কারো সঙ্গে কারো তেমন মতভেদ নেই বটে কিন্তু প্রচুর মতভেদ রয়েছে—রয়েছে বললে অল্পই বলা হয়—প্রাদুর্ভাব বলাই ভাল—মূল্যের স্বরূপ সম্বন্ধে। এই কারণেই সমালোচনার ক্ষেত্রে মত ও পথের অন্ত নেই। বলা বাহুল্য, মূল্যবোধ যুগিয়ে থাকে শিল্পতত্ত্বের শাস্ত্রগুলি সুতরাং, শিল্পের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্বন্ধে শিল্পতত্ত্বশাস্ত্রে যত মত, সমালোচনাতেও তত পথ দেখা দিয়েছে। মত সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করেছি এবং সেখানেই পথের পরিচয় মোটামুটি দেওয়া হয়ে গেছে। আসল কথা যত মত তত পথ। যদি প্রধান মত ধরা হয় পাঁচটি, যথা—(১) যথাস্থিতবাদ বা যথার্থবাদ (রিয়েলিস্ট থিওরি) (২) ভাবাবেগবাদ (ইমোশানাল থিওরি) (৩) প্রকাশবাদ বা প্রতিভানবাদ (এক্স্প্রেশানিস্ট থিওরি) (৪) অতিপ্রাকৃত বা দিব্যার্থবাদ (ট্র্যানসেনডেণ্টাল-থিওরি) এবং (৫) অপূর্ববস্তুনির্মাণবাদ (কনফিগারেশান-বাদ)—তাহলে সমালোচনাকেও আমরা প্রধানতঃ ঐ ঐ নামে অভিহিত করতে পারি। কারণ যার যেমন মন তিনি তেমনি ধনই খুঁজবেন। বলা বাহুল্য, যথার্থবাদীরা নির্দিষ্ট প্রকাশ্য বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে প্রকাশের মূল্য যাচাই করবার চেষ্টা করেন বলে, বিচারের বাস্তব মানদণ্ড একটা কিছু থাকেই। দ্বিতীয়তঃ ভাববাদীর বিচার—শেষ পর্যন্ত হৃদয়নির্ভর অনুভব-সাপেক্ষ ব্যাপারে পরিণত হতে বাধ্য। তৃতীয়তঃ, প্রতিভান-বাদীরা ভাববাদীর 'আবেগৈকপ্রমাণতা'র তথা আত্মসাপেক্ষকতার ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু সফল হতে পারেন নি। শিল্পী তাঁর ধ্যানকে যথাযথভাবে শিল্পরসিকদের মনে জাগাতে পেরেছেন কি না, সামাজিকের মনে অনুরূপ ধ্যান জাগে কিনা এই বিচার করাই প্রতিভানবাদী সমালোচকের উদ্দেশ্য।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে 'ধ্যান' যখন প্রকাশ্য বস্তু তখন প্রকাশের বাস্তব ভিত্তি আছে বই কি। কিন্তু 'ধ্যান'টি যেহেতু শিল্পীর একান্তই মন-গড়া এবং শিল্পে ছাড়া আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই, উভয়ের তুলনা করার কোন উপায় নেই। মোট কথা, প্রতিভানবাদী সমালোচনা ভাববাদীর মতোই একান্ত ব্যক্তিগত। চতুর্থতঃ, দিব্যার্থবাদীরা দিব্য আনন্দ, দিব্য সৌন্দর্য প্রভৃতি দিব্য আবেগের সন্ধানে নিযুক্ত। এর জন্য দিব্য চক্ষু, দিব্য অনুভূতি অত্যাবশ্যক এবং তা একান্তই ব্যক্তিগত সৌভাগ্য। 'যমেব এষো বৃণুতে'—তিনি ছাড়া দিব্যের স্বরূপ কে বুঝবেন? পঞ্চমতঃ, অপূর্ববস্তুবাদী সমালোচনা—শিল্প মূল্য খোঁজেন শিল্পের গঠনগত অন্বয়—'জৈবিক একান্বয়ের' (অর্গানিক ইউনিটি) মধ্যে। যদিও এই মূল্যের বোধ আবেগনির্ভর নয় বলে মোটামুটি বস্তুনির্ভর, তবু সম্পূর্ণ বস্তুনির্ভর নয়। প্রথমতঃ 'অর্গানিক ইউনিটি'র মাত্রা নির্বিকল্পক জ্ঞানসাপেক্ষ—সবিকল্পক জ্ঞানের গোচর নয়। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ আকৃতিগত সৌন্দর্যের ধরাবাঁধা কোন সূত্র নেই এবং তৃতীয়তঃ সমান অন্বয়-সুন্দর দু'টি অপূর্ববস্তু'র মধ্যে বিষয়গুণজনিত যে পার্থক্য বা তারতম্য ঘটে, সেই পার্থক্য বা তারতম্য বিচারের কোন নির্দেশ তাতে পাওয়া যায় না।

এ সব ছাড়াও, আরো নানা প্রবৃত্তি সমালোচনা ক্ষেত্রে দেখা যায়। অবশ্য এই প্রবৃত্তিগুলি যে উল্লিখিত মতগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক বা বিরুদ্ধ, তা নয়। একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে—তারা বিশেষ বিশেষ মতেরই সম্ভাব্য বা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যেমন ধরা যাক, যারা তত্ত্বে—যথাস্থিতবাদী বা বিষয়বাদী তারা বিচার কাযে শিল্পের বাস্তবতার মাত্রা যাচাই করতে আগ্রহী হবেনই। তারপর যাঁরা সুন্দরের বা আনন্দের সত্য-শিব নিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করবেন না, তাদের সমালোচনায় শিল্পের গঠন সৌন্দর্য বিচারের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর ধ্যানের গৌরবের—সত্যদর্শিতার ও শিবসাধকতার মাত্রা বিচার থাকবেই—যদিও নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবাদীরা বলবেন—

"Any critic who writes about the excellence or defects of a poet's ideas about his contained morality or wisdom is not writing literary criticism but something else." (Osborne)

অর্থাৎ যে সমালোচক কবির উপস্থাপ্য ভাবের গুণ ও দোষ নিয়ে এবং তার অন্তর্নিহিত নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন তিনি আর যাই করুন সাহিত্য সমালোচনা করেন না। কারণ এরা মনে করেন—বিষয়ের মহত্ত্ব না থাকলে মহান শিল্প সৃষ্টি করা সম্ভব নয়—এ কথা সত্য হলে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য যে মহত্ত্ববোধ সত্যবোধ এবং শিববোধ সাপেক্ষ। সত্য-মূল্যে শিব-মূল্যে মূল্যবান না হয়ে কোন কিছুই মহত্ত্ব দাবী করতে পারে না। সমালোচনায় ঐতিহাসিক পদ্ধতি (হিস্‌টরিকাল ক্রিটিসিজম্‌) নামে যে পদ্ধতি প্রচলিত তাতে শিল্পী ও শিল্পকর্মকে—শিল্পীর সত্যবোধের, শিববোধের রূপটিকে ইতিহাসসাপেক্ষ করে, অর্থাৎ সমাজবিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে বিচার করার প্রবণতা অতি সংলক্ষ্য। এই প্রবণতা ভিকো থেকে সূচিত হয়ে হার্ডার, তেইন প্রভৃতির ভিতর দিয়ে মার্কস-এঙ্গেলস্‌ এবং তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্য পর্যন্ত চলে এসেছে। কবিমানসের গঠন সৃষ্টির উপাদান, সৃষ্টির প্রেরণা, সৃষ্টির লক্ষ্য বা উপযোগিতা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় এদের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বললে বলতে হবে—ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে শিল্পী-মানস ও সৃষ্টির প্রেরণাকে—"race, milieu and moment"-এর পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। এই যেমন ঐতিহাসিক বা সমাজনৈতিক সমালোচনার প্রবণতা, তেমনি তার পাশেই 'মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা'র প্রবণতাও রয়েছে। সৃষ্টির প্রেরণা' 'সৃষ্টিপ্রক্রিয়া' এবং 'সৃষ্টির আবেদন' বিশ্লেষণ করার দিকে এই সম্প্রদায়ের ঝোঁক খুব বেশী। এঁদের কারো কারো কাছে—শিল্প "substitute—gratification"—পরোক্ষভাবে বাসনাপরিপূরণ, কারো কারো কাছে—'compensation' বা 'ক্ষতিপূরণ', কারো



কারো কাছে—"cathartic"—আবেগমোক্ষণ। এঁরা যখন শিল্প সমালোচনা করেন—নিজেদের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা নিয়েই করেন এবং মনস্তত্ত্বের সূত্র মিলিয়ে মিলিয়ে রূপ-রসের প্রকৃতি বিচার করেন। শিল্পতত্ত্ববিদদের মধ্যে যাঁরা অলঙ্কারবাদী বা রীতিবাদী তারা আঙ্গিক বা উপাদান বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য—সাহিত্যের ক্ষেত্রে টীকা-ভাষ্য তথা বৈয়াকরণিক ও আলংকারিক বিশেষত্ব দেখানোর দিকে ঝোঁক দিয়ে থাকেন। এই জাতীয় সমালোচনা—স্কোলাস্টিক বা এক্‌সিজেটিকাল ক্রিটিসিজম নামে পরিচিত।

আর এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা সমালোচনা করার নামে নিজের উপলব্ধি বা প্রতিক্রিয়াকেই ব্যক্ত করে থাকেন—শিল্পকর্মের দোষ-গুণের চেয়ে শিল্পসম্ভোগজনিত বিশেগ অনুভূতিকে দর্শের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চান। এদের বলা হয় "ইম্‌প্রেশানিষ্টিক ক্রিটিক"। এই জাতীয় সমালোচক নিজে যদি বড় শিল্পী হন তবেই উল্লেখযোগ্য সমালোচনা করতে পারেন। তা' না হলে সমালোচনার গদ্যকবিতায় পরিণত হওয়ার আশংকা থাকে। "Whether this form of criticism is properly classed as criticism at all"—এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন।

সে যাই হোক আসল কথা এই—মতের পার্থক্য যতদিন থাকবে পথের পার্থক্য কেউ দূর করতে পারবেন না। আর পথের পার্থক্য দেখে কেউ যদি পথ চলতে না চান তবে কোনদিনও পথ চলা তাঁর ভাগ্যে ঘটবে না।